হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

৭

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

১৯

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূচিপত্র

কলকাতায় ভিনিসের একরাত্রি

জয়ন্ত ও মানিক সেদিন ডিনার খেতে গিয়েছিল—পার্ক স্ট্রিটে এক হালফ্যাশনি বন্ধুর বাড়িতে।

জয়ন্ত ও মানিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্ক স্ট্রিটবাসী এই বন্ধুটি ছিলেন সেই জাতীয় মনুষ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হগসাহেবের বাজারের উত্তরে আর আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। অতএব হগসাহেবের বাজারের দক্ষিণ দিকে আস্তানা গেড়ে এঁরা কোঁচানো কাপড় পরেন না, শিঙাড়া কচুরি খেতে ভালোবাসেন না, অ-আ ক-খ ব্যবহার করেন না, ঘড়ি ধরে দাঁড়ি কামান, হাঁচেন—কাশেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়ন্ত ও মানিক যে এই শ্রেণির বন্ধুর খুব অনুরাগী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়বার পর এঁর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা হয়েছে কালে-ভদ্রে কদাচ।

শখের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশ্চর্যরূপে সফল হয়ে জয়ন্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু কিছু অংশ মানিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিমন্ত্রণ করে এখন বাড়িতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য বলে মনে করে।

হয়তো সেইজন্যেই পার্ক স্ট্রিট আজ বাগবাজারকে করেছে 'ডিনার' খাবার নিমন্ত্রণ!

বাগবাজারকে চমকে দেবার জন্যে পার্ক স্ট্রিট কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি করেনি।

সেসব দেখে জয়ন্ত ও মানিক কোনও রকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না বলে গৃহকর্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

কিন্তু খানা খাবার টেবিলের উপরে 'মেনু'তে খাদ্যের ফরাসি নামগুলো তাদের কাছে বড়ো বাড়াবাড়ি বলে মনে হল।

জয়ন্ত বললে, 'ওহে, এই ফরাসি নামগুলোর ভেতরে গোরু আর শুয়োরের মাংস লুকিয়ে নেই তো?'

গৃহকর্তা এতক্ষণে জো পেয়ে অট্টহাস্য করে বললেন, 'কেন হে, গোরু আর শুয়োর সম্বন্ধে এখনও তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কার আছে নাকি?'

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, 'তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সামনে বসে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কথা, ও-দুটি খাবার আমরা পছন্দ করি না।'

খানা শেষ হলে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে-ঘরটি একেবারে একেলে কায়দায় সাজানো। দেওয়ালে 'কিউবিস্ট' চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও 'কিউবিস্ট' কারিগরদের দ্বারা গড়া, এমনকি ঘরের মেঝের 'মোজেকে'র উপরেও 'কিউবিজমে'র প্রভাব।

গৃহকর্তা বললেন, 'জয়ন্ত, এ ঘরটির ডেকোরেশান তোমার কেমন লাগছে?'

—'বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যখন ঘরবাড়ি সাজায় তখন সে যদি ভারতের প্রাচীন আদর্শের দিকে লক্ষ রাখে, তাহলে আমি বেশি খুশি হই।'

—'কিন্তু আমি চাই 'আপ টু ডেট' হতে। 'কিউবিজম' হচ্ছে হালফ্যাশনের ঢেউ।'

—'না, 'কিউবিজমে'র বয়েস হল ত্রিশ-পঁইত্রিশ বৎসর! এখনকার আর্টে হালফ্যাশন এনেছেন 'হাইপার রিয়ালিস্ট' শিল্পীরা। তাদের নাম তুমি শুনেছ?'

—'না।'

—'তাহলে পার্ক স্ট্রিটে বাস করেও তুমি 'আপ টু ডেট' হতে পারোনি. তুমি জানো, যিনি 'কিউবিজম' আবিষ্কার করেছেন, তিনি এখন 'কিউবিজম' ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন?'

—'না।'

—'তাহলে হে বন্ধু, তুমি পার্ক স্ট্রিটের কালো কলঙ্ক!'

বন্ধু মনে মনে রেগে ঠোঁট কামড়ালেন। অধিকাংশ আধুনিক বাঙালি সাহেবের মতন তিনিও লোক দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুঁটিনাটির খবর রাখবার উৎসাহ তাঁর নেই।

ডিনারের পর কফির পালা।

কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নামল যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। হু হু করে ঝোড়ো হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই 'কিউবিস্ট'দের আঁকা ছবিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

তখনই তাড়াতাড়ি দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা গেল, তখনও ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়ন্তর চোর-ডাকাত ধরার কাহিনি শুনে গৃহকর্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে। তাঁর গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফুরোতেই চায় না।

কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর অপেক্ষা করা চলে না। পার্ক স্ট্রিট থেকে বাগবাজার—[illegible] দৌড়! ওঠো মানিক!'

গৃহকর্তা বললেন, 'কিন্তু এখনও বৃষ্টি পড়ছে যে!'

—'পড়ুক। চলো মানিক!'

গাড়ি-বারান্দার তলাতেই তাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গি তখন একটা প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে।

সেই জলরাজ্যে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক স্তম্ভগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে দীপ্তনেত্রে যেন সেই নির্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে মোটর যখন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে প্রবেশ করল, পথের জলও তখন বেড়ে উঠল।

যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, শহরের বুকের ভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

মানিক বললে, 'বর্ষায় কলকাতায় বাস করলে ভিনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভিনিসের জলপথের কোনও তফাতই থাকে না।'

জয়ন্ত বললে, 'কেবল 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' আর 'গন্ডোলা' নৌকোর অভাব।'

—'গন্ডোলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বর্ষাকালের জন্যে কলকাতার মাঝে মাঝে খেয়াঘাট বসিয়ে নৌকো রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। আর 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু'র কথা বলছ? বর্ষার সময়ে সারা কলকাতা যত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতু তৈরি করা যায় না?'

কিন্তু জয়ন্ত কোনও জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার বললে, 'হুজুর, গাড়ি আর চলবে না!'

জয়ন্ত বললে, 'গাড়ি তো আর নৌকো নয়, এতক্ষণ সে যে নৌকোর কর্তব্যপালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চর্য! এসো মানিক, এখন জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই!'

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখনও অনেক দূরে।

দুজনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল,—পথের জলপ্রবাহ ঠিক নদীর মতোই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচা ইঁদুর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

মানিক ঘৃণায় নাক টিপে ধরে বললে 'বাড়িতে গিয়ে জলে 'পার্মাঙ্গেনেট অফ পটাস' গুলে গা না ধুলে আর রক্ষা নেই! জয়,' পার্ক স্ট্রিটের ডিনার বুঝি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! থুঃ থুঃ।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি বলি, জয় কর্পোরেশনের! আধুনিক কলকাতার ট্যাকসো যত বাড়ছে, তার রাস্তার জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিব্যি বেড়ে উঠছে! অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করবার অজুহাতে কত লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে!'

দুজনে বিরক্ত মনে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল, তখন তাদের দুর্দশা দেখবার জন্য পথে একটা জ্যান্ত কুকুর পর্যন্ত হাজির ছিল না। লাল পাগড়ি পর্যন্ত অদৃশ্য!

বৃষ্টি তখনও থামেনি এবং ঝোড়ো বাতাস তখনও বন্ধ জানলায় জানলায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে ঢুকতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল, 'হুঁ, এই তো চোরের শুভমুহূর্ত! মানিক, তুমি কি একটা মানুষ-টিকটিকি দেখতে চাও?'

মানিক বিস্মিত নেত্রে জয়ন্তর মুখের পানে তাকালে।

জয়ন্ত আঙুল তুলে বললে, 'আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না,—ওই বাড়িখানার তিনতলার দিকে তাকাও!'

পাশেই একখানা ত্রিতল বাড়ি। একটা মনুষ্য-মূর্তি দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে!

মানিক বললে, 'চোর! কিন্তু কেমন করে লোকটা উপরে উঠছে?'

'ট্যাঙ্কের জলের পাইপ ধরে।'

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেলিং ধরলে, তারপর ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'এসো, দেখা যাক চোরটাকে ধরতে পারা যায় কি না?'

জয়ন্ত বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুস্থানি গলায় কে শুধোলে, 'কোন হ্যায় রে?'

—'বাইরে এসে দ্যাখো না বাবা, চ্যাঁচাও কেন? বাড়িতে চোর ঢুকেছে!'

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণ শিস দিলে!

জয়ন্ত চারিদিকে চেয়ে কারুকেই দেখতে পেলে না। বললে, 'মানিক, এ চোর একলা আসেনি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শিস দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান করে দিলে।'

দরজা খুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জয়ন্ত বললে, 'দরোয়ানজি, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধরে তিনতলার বারান্দায় গিয়ে উঠল! তাকে ধরতে চাও তো শিগগির আমাদের নিয়ে ওপরে চলো!'

দারোয়ান তখনই কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিনবার মাটিতে ঠুকে যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহলে মিথ্যাই তার নাম হাতি সিং!

তার সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

—একেবারে তিনতলার বারান্দায়! তিনতলায় দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দরোয়ান ডাকলে, 'হুজুর, হুজুর!'

কেউ সাড়া দিলে না।

কিন্তু জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কান শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে!

সে দরজায় পিঠের বাম দিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি উঁচু দেহ আসুরিক শক্তির জন্যে বিখ্যাত, আর এ তো তুচ্ছ একটা কাঠের কবাট! তার দেহের এক ধাক্কায় ভিতরের খিল ভেঙে গেল—দরজার কবাট সশব্দে খুলে গেল!

ঘরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার!

প্রথমেই দেখা গেল রাস্তার বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে!

হাতি সিং ছুটে গিয়ে বাঘের মতো তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

প্রথমেই একটা শব্দ হল,—কার হাত থেকে কী একটা জিনিস যেন মাটির উপরে পড়ে ভেঙে গেল! তারপরেই চোখের পলক না পড়তেই বিপুলবপু হাতি সিং কুপোকাত!

জয়ন্তও একলাফে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তখন সেখানে নেই!

বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্ত দেখলে, জলের পাইপ ধরে আশ্চর্য বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে বললে, 'হাতি সিং, তুমি উঠেছ?'

হিন্দি ভাষায় সাড়া এল, 'উঠেছি বাবুজি! বড়োই জোয়ান চোর, ধরে রাখতে পারলুম না!'

—'সে তোমার দোষ নয়। আলোর 'সুইচ' কোথায়?'

হাতি সিং আলো জ্বালল।

ঘরের একদিকে একখানা খাট। ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে পড়ে একটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক অত্যন্ত হাঁপাচ্ছেন।

জয়ন্ত ও মানিক তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

প্রথমেই জয়ন্তের চোখ পড়ল ভদ্রলোকের গলার উপরে—সেখানে মানুষের আঙুলের রাঙা ছাপ! চোর তাঁর গলা টিপে ধরেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতি সিং জল এনে তাঁর গলায় ও মুখে ঝাপটা দিতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক কতকটা সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাঁচতুম না। গেল হপ্তায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেনবাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চলে যাচ্ছিলুম!'

মানিক বললে, 'আমি খবরের কাগজে পড়েছি, গেল হপ্তায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমলচন্দ্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্রনাথ বসুকে কে হত্যা করে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেনবাবুর কথা বলছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তাহলে আপনিই হচ্ছেন প্রত্নতাত্ত্বিক—'

—'অমলচন্দ্র সেন।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে অমলবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অমলবাবুর বিখ্যাত নাম সে-ও শুনেছে বটে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন?

পুরানো পোকায় কাটা পুথিপত্র, অচল সেকেলে মুদ্রা আর ভাঙা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁদেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর একজনকেও—

তার চিন্তায় বাধা পড়ল।

অমলবাবু হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ও কী, ওই বুদ্ধমূর্তিটা ওখানে পড়ে কেন? ওটা ভাঙলই বা কী করে?'

জয়ন্ত চেয়ে দেখলে, বারান্দার দিকে দরজার সামনে মাটির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি পড়ে রয়েছে, তার মুণ্ড ভেঙে আর-একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললে, 'এখন বোঝা যাচ্ছে, হাতি সিং যখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ওই মূর্তিটাই চোরের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল! শব্দটা আমি তখনই শুনেছিলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারিনি।'

অমলবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এত জিনিস থাকতে চোর ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল? চোর ওই—বুদ্ধমূর্তি—নিয়ে—'

বলতে বলতে তিনি হঠাৎ আবার থেমে গেলেন!

জয়ন্ত নীরবে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল।

সে বেশ বুঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হদিস খুঁজে পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পরে অমলবাবু বললেন, 'আপনারা আমার প্রাণ রক্ষা করলেন, কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হল না তো?'

জয়ন্ত বললে, 'জানবার মতো পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়ন্ত আর আমার বন্ধুর নাম মানিকলাল। আমাদের শখ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।'

—'আপনাদের কথা আমিও বোধ হয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক-অপরাধী ভবতোষ মজুমদারকে আপনারাই কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন?'

—'অনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিশ বলবে ভবতোষকে ধরেছিলেন ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু।'

—'পুলিশ যা বলে বলুক, কিন্তু আসল বাহাদুরি কার লোকে তা জানে। আপনারা এখানে এলেন কেমন করে?'

জয়ন্ত সব খুলে বললে।

অমলবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'অনেকটা সেই রকমই মনে হয় বটে! নইলে হঠাৎ এই দুর্যোগ, জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিদ্রোহ, যথা সময়ে আপনার বাড়ির সামনে আমাদের আবির্ভাব—এ-সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে।'

অমলবাবু বললেন, 'দেখুন, ওই বুদ্ধমূর্তিটি এতদিন আমার সহকারী সুরেনবাবুর বাড়িতে ছিল। ওই মূর্তিটি আমরা চার মাস আগে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।'

—'কাম্বোডিয়ায়? যেখানে জঙ্গলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুমন্দির 'ওঙ্কারধাম' আছে?'

—'হ্যাঁ। সেই পিরামিডের চেয়েও আশ্চর্য মন্দির থেকে আরও তফাতে, জঙ্গলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরও অনেক কীর্তি লুকানো আছে। সেই খোঁজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমূর্তিটি পাই। এই মূর্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।'

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তিটি এতদিন সুরেনবাবু কাছে ছিল,—তারপর?'

অমলবাবু বললেন, 'গেল হপ্তায় একদিন ওই মূর্তিটি আমার পরীক্ষা করবার দরকার হয়। আমি মূর্তিটি সুরেনবাবুর কাছ থেকে আনিয়ে নি। ঠিক সেই রাত্রেই কে সুরেনবাবুকে গলা টিপে হত্যা করে। কেবল তাই নয়। সুরেনবাবুর ঘরে আরও অনেক মূর্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোনও জিনিস বা মূর্তি নিয়ে যায়নি। পুলিশ এই হত্যার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও খুঁজে পায়নি। জয়ন্তবাবু, হত্যাকারী কীসের খোঁজে সুরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন?'

—'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

—'আছে। আমার কোনও শত্রু নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে—আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে মূর্তি এতদিন সুরেনবাবুর ঘরে ছিল!'

মানিক বললে, 'আমার তো মনে হয়, সুরেনবাবুকে খুন করে সেখানে ওই বুদ্ধমূর্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।'

জয়ন্ত কিছু বললে না। দরজার কাছে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির দেহ ও মাথা মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নিল।

মূর্তিটি চুনপাথরে গড়া ধ্যানী বুদ্ধের, উচ্চতায় একহাতের বেশি হবে না।

সোনার চাকতির নকশা

জয়ন্ত বুদ্ধমূর্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোনও রকম বিশেষত্বই আবিষ্কার করতে পারলে না। এ ধরনের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধমূর্তি এশিয়ার সর্বত্রই পাওয়া যায়।

মূর্তির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে আলতো ভাবে লাগিয়ে জয়ন্ত বুদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃদুকণ্ঠে বললে, 'হত্যাকারী এই মূর্তিই চুরি করতে এসেছিল? কিন্তু হিংসার সঙ্গে এই মূর্তিমান অহিংসার সম্পর্ক কী?'

মানিক বললে, 'হয়তো বিশেষ কোনও কারণে ওই মূর্তিকে কেউ এমন পবিত্র মনে করে যে, ওকে হস্তগত করবার জন্যে সে নরহত্যা করতেও সঙ্কুচিত নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'এর উত্তরে দুটি কথা বলা যায়। প্রথমত, বুদ্ধের প্রতি একটা অতি-ভক্তি থাকা সম্ভব কেবল গোঁড়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভীষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কাম্বোডিয়ার অজানা জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্তি, তার জন্যে কলকাতার কোনও বৌদ্ধের এতটা নাড়ির টান

হবে কেন? এর চেয়ে ঢের মূল্যবান আর অসাধারণ পুরোনো বুদ্ধমূর্তি কত লোকের ঘরে ঘরে রয়েছে, তাদের জন্য তো কোনও বৌদ্ধের মাথা ব্যথা হয় না। না মানিক, এ ব্যাপারের মধ্যে অন্য রহস্য আছে।'

মানিক বললে, 'দেশে লক্ষ লক্ষ কালীর প্রতিমা আছে, তাদের জন্যে ভক্তরা তেমন পাগল হয় না। কিন্তু শুনতে পাই, কোনও কোনও কালীর মূর্তি নাকি জাগ্রত, তাদের জন্যে অনেক ভক্ত প্রাণ নিতে বা দিতে প্রস্তুত। কে বলতে পারে, এই বুদ্ধমূর্তিরও তেমন কোনও খ্যাতি আছে কি না?'

জয়ন্ত বললে, 'থাকতে পারে। কিন্তু সে খ্যাতির কথা কাম্বোডিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর থেকে কলকাতায় আসবে কেমন করে?'

এতক্ষণ অমলবাবু চুপ করে খুব মন দিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মূর্তিটি কেমন করে আমরা পেয়েছিলুম, সে গল্পটাও আপনাদের কাছে বলা উচিত। হয়তো তাহলেই আপনাদের কোনও কোনও প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে।'

জয়ন্ত একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললে, 'বলুন। আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি।'

অমলবাবু আর কোনও রকম ভূমিকা না করেই বলতে লাগলেন—

'বহুদিন থেকেই আমি কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের (ইংরেজিতে Angkor Thom) কথা শুনে আসছি। তাই মাস কয়েক আগে আমি যখন সুরেনবাবুর কাছে প্রাচীন হিন্দুদের এই বিরাট কীর্তিমন্দির দেখতে যাবার প্রস্তাব করলুম, তখন তিনিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আমরা তো সাধারণ ভ্রমণকারী নই, আমরা হচ্ছি প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদের অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। শুনেছি, ওঙ্করধামের চারিদিককার গভীর অরণ্যের মধ্যে এমন আরও অনেক হিন্দুকীর্তি আছে, যা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সন্ধান নেওয়া।

যথা সময়ে যাত্রা করলুম।

তারপর সাগর, নগর ও অরণ্য পার হয়ে কী করে ওঙ্কারধামের আকাশছোঁয়া ও দৃষ্টিসীমা ছাড়ানো ধ্বংসস্তূপের পরিত্যক্ত বিজন বিরাটতার ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, সেসব কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

গৌরবময় অতীতের এই মূর্তিমান মৃত্যুনিসাড় দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একদিন আমি আর সুরেনবাবু সবিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম পাশের ভাঙা মন্দিরের ভিতরে কে কাতর আর্তনাদ করছে।

মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, একদিকে একজন বর্মি ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছটফট ও আর্তনাদ করছেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সুরেনবাবু চিকিৎসাশাস্ত্র জানতেন, তাঁর সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল।

চিকিৎসার গুণে দু-দিন পরে সন্ন্যাসীর অসুখ কিছু কমল। তাঁর মুখে শুনলুম, তিনি ওঙ্কারধামে বেড়াতে এসে এই বিপদে পড়েছেন।

কেবল ওঙ্কারধাম নয়, ইতিমধ্যে এখানকার গহন বনের ভিতরে অদৃশ্য, অনেক অজানা বিস্ময়ও তিনি দেখে এসেছেন।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে বুঝে আমরা প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা ও সেবা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, হপ্তাখানেক পরে তাঁর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়ল।

সুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আর কোনও আশা নেই। আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।'

গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মতো বললেন, 'সুরেনবাবু, আমার কাছে সরে এসো।'

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন 'আদেশ করুন।'

সন্ন্যাসী খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, 'সুরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে যেতে চাই।'

সুরেনবাবু বললেন, 'পুরস্কারের লোভে আমরা আপনার সেবা করিনি।'

—'সে কথা আমি জানি। সেই জন্যেই তোমাদের পুরস্কার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ঋণ নিয়ে আমি মরব কেন? কিন্তু যে পুরস্কার তোমাদের দেব তা বড়ো সাধারণ পুরস্কার নয়, এর জন্যে পৃথিবীর যে কোনও সম্রাটও লালায়িত হতে পারে। তবে এ পুরস্কার লাভ করবার আগে তোমাদের এক কাজ করতে হবে।'

সুরেনবাবু বললেন, 'কী কাজ?'

—'তোমাদের সঙ্গে দেখছি ইন আর চ্যান রয়েছে। ওদের কালকেই বিদায় করে দিয়ো।'

সুরেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেন?'

—'ওরা ভালো লোক নয়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।'

আমাদের দলে জন-বারো কুলি ছিল। চ্যান হচ্ছে তাদের সর্দার। ইন হচ্ছে আমাদের পথ-প্রদর্শক। এরা যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইবে, তার কোনও হদিস খুঁজে পেলুম না।

সন্ন্যাসীর কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতির মূর্তি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ করে নেবে—কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিক ছাড়া আর কোনও দিকে যেয়ো না। দু-দিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর—'

এই পর্যন্ত বলবার পরেই সন্ন্যাসীর গলা থেকে ক্রমাগত হেঁচকি উঠতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে থেমে সন্ন্যাসী বললেন, 'তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারদিকে পাথরে বাঁধানো একটি পুষ্করিণী। তার এক কোণ থেকে পশ্চিম মুখো একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের চার কোণে আর চারটি ছোটো ভাঙা মন্দিরও আছে!'

সন্ন্যাসীর হাঁপ ও হেঁচকি আরও বেড়ে উঠল।

কিন্তু আমাদের আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে, বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, 'তারপর—তারপর?'

কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে তিনি বললেন, 'বড়ো মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদি আছে। তার উপরে আছে ছোটো একটি বুদ্ধমূর্তি। তোমরা সেই মূর্তিকে তুলে নিয়ে—'

সন্ন্যাসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ মুদে এল।

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'তারপর আমরা কী করব?'

কিন্তু সেকথা সন্ন্যাসী শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। যেন নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, 'পদ্মরাগ বুদ্ধ, পদ্মরাগ বুদ্ধ'—

তারপরেই তাঁর মৃত্যু হল।

এর পরের কথা আমি খুব সংক্ষেপেই সারব।

আমরা সন্ন্যাসীর কথার আসল অর্থ বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলুম।

চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বললুম—আমরা ওঙ্কারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না। এখানেই হপ্তাদুয়েক থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের সঙ্গে কেবল চারজন কুলি রেখে বাকি লোক নিয়ে তারা চলে যেতে পারে।

আমাদের হঠাৎ মত পরিবর্তনে তারা বিস্মিত হল বটে, কিন্তু কোনও রকম সন্দেহ করতে পেরেছে বলে মনে হল না।

সেই দিনই তারা বিদায় গ্রহণ করলে।

সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কী দেখব আর কী লাভ হবে, তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু কী একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতূহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে পরদিনই উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলুম।

সেই প্রান্তর, পুষ্করিণী আর চারটি ছোটো মন্দিরের মাঝখানে প্রধান একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—সমস্তই পাওয়া গেল।

বড়ো মন্দিরের ভিতরে পাথরের বেদির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি বেদির সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমরা গাঁথুনি থেকে মূর্তিটিকে খুলে নিলুম।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোনও পুরস্কারই সেখানে ছিল না—যদিও আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিসই সেখানে দেখতে পেলুম। বিশেষ, হাজার বছরের পুরানো যে শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় সুরেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'সন্ন্যাসী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, কীসের লোভে আমরা এদেশে এসেছি! যে শিলালিপি আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অমূল্য সম্পদ আর কী থাকতে পারে?'

জয়ন্তবাবু, চোর আজ যে বুদ্ধমূর্তিটি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, ওইটিকেই আমরা সেই বড়ো মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও-মূর্তি নিয়ে চোরের কী লাভ হত, এ কথাটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'অমলবাবু, আপনি বলছেন যে সন্ন্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে 'পদ্মরাগ বুদ্ধ'? কিন্তু 'পদ্মরাগ বুদ্ধ' নামে কোনও বুদ্ধমূর্তির কথা তো আমি কখনও শুনিনি।'

অমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমিও শুনিনি।'

মানিক বললে, কিন্তু পদ্মরাগ মণি বলে মহামূল্যবান মণি আছে!'

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'সন্ন্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর

যে-কোনও সম্রাট লালায়িত হতে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চুনপাথরের গড়া এক বুদ্ধমূর্তি, আর একখানা শিলালিপি,—রাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ! অথচ এই সামান্য বুদ্ধমূর্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না! আশ্চর্য রহস্য!'

সে বুদ্ধমূর্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে দেহটা আবার তুলে নিলে। তারপর তাকে উলটে ধরে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'দ্যাখো মানিক, এর তলার দিকটা!'

মানিক দেখলে, মূর্তির তলায় খানিকটা জায়গায় গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ মাখানো হয়েছে! সে বললে, 'এখানে একটা ছ্যাঁদা ছিল। এখন ভরাট করে দেওয়া হয়েছে!'.

জয়ন্ত হঠাৎ মূর্তিটা উঁচুতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অমলবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন, 'কী করলেন, কী করলেন! ওর পিছনে যে ব্রাহ্মি লিপি ছিল।'

জয়ন্ত সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুকরোর ভিতর থেকে একটা জিনিস নিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিসটা তামার একটা কৌটোর মতো—অনেকটা বিলাতি 'সেভিংস্টিকে'র কৌটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল, কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, প্রায় এক বিঘৎ হবে!

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তির ভিতরটা খুদে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছ্যাঁদা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।'

অমলবাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে থেকে বললেন, 'ও কৌটোর ভিতরে কী আছে?'

—'সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতরে যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছিল!'

সে কৌটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোনার চাকতি!

অমলবাবু বললেন, 'ও আবার কী?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চাকতিটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'এতে কী-একটা নকশা খোদা রয়েছে।'

—'নকশা?'

'হ্যাঁ'—বলেই সে টেবিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বসল। তারপর পকেট থেকে কাগজ, পেনসিল ও 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' বার করলে। বাঁ হাতে চাকতির উপরে 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' ও ডান হাতে কাগজের উপরে পেনসিল ধরে সে তখনই তাড়াতাড়ি আর-একখানা বড়ো নকশা তৈরি করে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁকা নকশাখানা অমলবাবুর হাতে সমর্পণ করলে।

অমলবাবু কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ যে প্রান্তরের সেই মন্দিরের নকশা! এই মন্দিরেই আমরা ওই বুদ্ধমূর্তি পেয়েছি।'

জয়ন্ত খুব খুশি মুখে পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার করে দুবার নস্য নিয়ে বললে, 'তাহলে আসুন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বসুন! ভালো করে আপনি একবার নকশাখানা দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, সন্ন্যাসী যা বলে যেতে পারেননি, আমরা এইবারে সেই গুপ্ত কথাটা জানতে পারব! পদ্মরাগ বুদ্ধ! পদ্মরাগ বুদ্ধ। রহস্যময় নাম।'

অমলবাবু নকশার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর
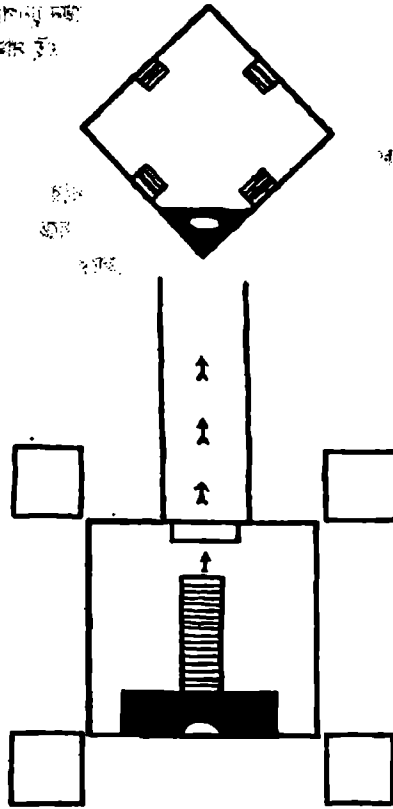
সোনার চাকতির নকশা

বললেন, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, এ খানা যে সেই মন্দিরের নকশা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চারঘাটওয়ালা পুকুর, তার কোনাকুনি রাস্তা, চারিদিকে চারটি ছোটো আর মাঝখানে প্রধান মন্দির, এমনকি কালো পাথরের লম্বাটে বেদিটি পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে, কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় অমিলও রয়েছে।'

জয়ন্ত নকশার উপরে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কী কী মিলছে না, আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।'

—'মন্দিরের ভিতরে, বেদির সামনে সিঁড়ির মতন ওটা কী আঁকা রয়েছে? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ওরকম কিছুই আমাদের চোখে পড়েনি।'

—'তারপর?'

—'পুকুরের পশ্চিম কোণে তিন কোনা ওই কালো অংশটাই বা কী? মন্দিরের বেদির মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে—ওইখানেই আমরা বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুকুরের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা চিহ্ন আছে, বুঝতে পারছি না। পুকুরের ওখানে আমরা জল ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।'

—'আর কোনও অমিল দেখতে পাচ্ছেন?'

—'না। তবে মন্দির থেকে পুকুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তির চিহ্ন রয়েছে কেন?'

জয়ন্ত নকশার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে! কিন্তু সেগুলো এখন প্রকাশ করে লাভ নেই, কারণ সেসব সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অমিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ বুদ্ধের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।'

অমলবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওঙ্কারধামে যাবার আগে আমরা শ্যামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ও-অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি আছে, তা নাকি দুর্লভ মণিমাণিক্য কেটে একসঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ বলেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!'

মানিক বললে, 'ভেবে দ্যাখো জয়ন্ত, পদ্মরাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বুদ্ধমূর্তি গড়া হয়, তবে তার পদ্মরাগ বুদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!

জয়ন্ত বললে, 'সন্ন্যাসীও এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে-কোনও সম্রাট লালায়িত হতে পারেন!'

—'পদ্মরাগ বুদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে সে মূর্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে!'

—'পদ্মরাগ বুদ্ধ! সে মূর্তি কত বড়ো? কতগুলো পদ্মরাগ মণি দিয়ে সে মূর্তি গড়া হয়েছে? মানিক, এই অসম্ভব সম্পদের কথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!'

অমলবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!'

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবু লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি!'

—'কিন্তু জয়ন্তবাবু, এটাও ভুলে যাবেন না যে, সারা মন্দির তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা চুনপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইনি!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এই চুনপাথরে গড়া মূর্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নকশা আঁকা চাকতি! বুদ্ধমূর্তির মধ্যে এমন দুটো জিনিস লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অত্যন্ত অসামান্য নয়? সেই কারণটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা কল্পনাতীত কোনও সুদুর্লভ বস্তু লাভ করতে পারি? এই জন্যেই এমন একটি সাধারণ মূর্তির লোভে কেউ নরহত্যা করেছে, হয়তো আজ আপনাকেও খুন করত! কীসের এই চাবি? চাবিটা যেরকম বড়ো, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড়ো কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আমার মতে, এই চাকতির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নকশা আছে। কিন্তু নকশার ওই সিঁড়ির রহস্যটাই বা কী? ওরকম কোনও সিঁড়ি আপনি দেখতে পাননি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও-সিঁড়ি কাল্পনিক নয়—নকশার সবটাই যখন মিলছে তখন ও-সিঁড়ি কাল্পনিক হতে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই।'

অমলবাবু দৃঢ় স্বরে বললে, 'না, ওর অস্তিত্ব নেই!'

জয়ন্তও দৃঢ় স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যদি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?'

—'কেমন করে?'

—'ওঙ্কারধামে গিয়ে।'

—'ওঙ্কারধামে গিয়ে? সে যে হবে মরীচিকার পিছনে ছোটার মতো। ওই অদৃশ্য সিঁড়ি, আর পুকুরের কোণে আর-এক অদৃশ্য রহস্য, এরা কোন যাদুমন্ত্রে আবার দৃশ্যমান হবে?'

—'বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে!'

অমলবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, 'অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি বলে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাধা বলে মনে করেন?'

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, 'না, না অমলবাবু, আপনাকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধরুন প্রত্নতত্ত্বের কথা। ও-বিভাগে আপনার তুলনায় আমার বুদ্ধি একেবারেই অকেজো। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশি সুবিধা করে উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোনার চাকতির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বুদ্ধদেবের মূর্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধরে রয়েছে, তবু এমন দুটো অদ্ভুত জিনিস আপনারা আবিষ্কার করতে পারেননি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদা মাখা পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাইনি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক। আসুন অমলবাবু, এসো মানিক!'

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে, তার অনেকগুলোই বেশ স্পষ্ট।

জয়ন্ত বললে, 'এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কী মনে হয়?'

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'কী আবার মনে হবে? ওগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ!'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে পড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'আর কিছু মনে হয় না?'

অমলবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়ো!...কিন্তু জয়ন্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামাবার কী আছে? আসামি যখন পলাতক, তখন ওই দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না!'

কিন্তু সেকথা বোধ হয় জয়ন্তের কানে ঢুকল না। পকেট থেকে নস্যদানি বার করে সে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল, নীরবে!

তারপর সে বললে, 'পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিন থেকেই যেসব প্রমাণের জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান!'

একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, 'অমলবাবু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি? মাথায় সে খুব ঢ্যাঙা, মাপলে সাত ফুটও হতে পারে। তার দেহ রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট। তার গায়ে অসুরে মতন জোর। সে ডান পাশে একটু বেশি হেলে পড়ে হাঁটে। আর—আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই!'

প্রথমে অমলবাবু হতভম্বের মতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে-চোখে

গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আপনি চ্যানকে চিনলেন কেমন করে!'

জয়ন্ত দুই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, 'চ্যান?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ চ্যান। ওঙ্কারধামে সে আমাদের কুলির সর্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইনকে আমরা বিদায় করে দিয়েছিলুম। আপনার মুখে এখনই অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলুম, আর তাকে আপনি চেনেন না!'

জয়ন্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে খুশিমুখে বললে, 'না চ্যানকে আমি চিনি না! তাহলে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় ঢ্যাঙা, জোয়ান আর মোটাসোটা?'

—'হ্যাঁ! আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই!'

—'উত্তম! মানিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে ফোন করে সব কথা জানিয়ো। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেন্ট বার করা হয়। কারণ খুব সম্ভব সুরেনবাবুকে সেই-ই খুন করেছে। আর আজকে চ্যানই যে অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, তার প্রমাণ ওই পদচিহ্ন!'

অমলবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান কি কলকাতায় আছে?'

—'পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে!'

—'পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?'

'থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পারে কেবল বিশেষ বুদ্ধি। পায়ের দাগগুলো আর একবার ভালো করে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশি সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়ো! সাধারণত ছোটো চেহারার পায়ের দাগ এত বড়ো হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ করে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির দীর্ঘতা আন্দাজ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে ঢ্যাঙা লোকেরা বেশি তফাতে পা ফেলে হাঁটে। দাগগুলো কীরকম স্পষ্ট দেখেছেন? হালকা দেহ বহন করে যেসব পা, তাদের ছাপ আরও কম স্পষ্ট হত। ডান পায়ের প্রত্যেক ছাপের ডান পাশটা বেশি চেপে মাটির উপরে পড়েছে; কারণ এগুলো যার পায়ের দাগ, সে ডান পাশে বেশি হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল যে নেই, এ সত্য তো ছাপ দেখে বালকরাও ধরতে পারবে! আর তার গায়ের জোর তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চোখের পলকে আপনার অতবড়ো পালোয়ান দারোয়ানকে কুপোকাত করে সরে পড়েছে! দেখছেন তো অমলবাবু, আমাকে বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বুদ্ধির যথা-ব্যবহার করেছি, সাধারণ লোকে যা করতে পারে না।'

অমলবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, 'কিন্তু চ্যান এসেছিল আমাকে খুন করতে! কোথায় কাম্বোডিয়া, আর কোথায় কলকাতা! কী আশ্চর্য।'

—'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই! ওঙ্কারধামের সন্ন্যাসী তো চ্যান আর ইন সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে চ্যান আর ইন পদ্মরাগ বুদ্ধের সন্ধানে আছে। পদ্মরাগ বুদ্ধকে লাভ করতে হলে যে চুনপাথরে গড়া বুদ্ধমূর্তিটিকে দরকার চ্যান কোনও গতিকে সেটাও টের পেয়েছে। ওই মূর্তি এখন আপনার দখলে তাই শত্রুর দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল!'

অমলবাবু সভয়ে বললেন, 'আমি তো পদ্মরাগ বুদ্ধ চাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এত টানাটানি কেন?'

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কে বলে আপনি পদ্মরাগ বুদ্ধ চান না? এক হপ্তার ভিতরেই আপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ বুদ্ধকে আনবার জন্যে ওঙ্কারধামে যাত্রা করব!'

'—বলেন কী মশাই? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দৌড়ে অপঘাতে মারা পড়ব? পদ্মরাগ বুদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ-কোটি টাকাও হয়, তাহলেও ওর মধ্যে আমি নেই। আপাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদানে ওই চাবি আর চাকতি আপনাদের হাতে আমি সমর্পণ করলুম। পদ্মরাগ বুদ্ধ পেলে সে মূর্তি নিয়ে আপনারা যা-খুশি-তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একটুও লোভ নেই।'

মানিক বললে, 'আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে অখন। কিন্তু আপাতত এইটেই আমি বুঝতে পারছি না যে, বিদেশি লোক হয়েও চ্যান কী করে অমলবাবুর বাড়ির অন্ধি-সন্ধির সব খবর রেখেছে? সে কেমন করে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমূর্তি আছে, আর গৃহকর্তা নিদ্রিত? বুঝে দ্যাখো জয়, চ্যান অন্ধকারেই ঘরে ঢুকে মূর্তিটিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মানিকের পিঠ চাপড়ে খুশি কণ্ঠে বললে, 'শাবাশ মানিক, শাবাশ! তুমি খুব বড়ো প্রশ্ন তুলেছ, একথা তো আমার মাথাতে ঢোকেনি? চ্যান এত হাঁড়ির খবর রাখলে কী করে?'

অমলবাবু বললেন, 'আপনার কথা শুনে আর একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই পাড়ায় চার-পাঁচজন বর্মি লোক প্রায় আনাগোনা করে! দেখলে মনে হয় যেন তারা এই পাড়ারই বাসিন্দা!'

জয়ন্ত বললে, 'তাই নাকি? তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়ির উপরে পাহারা দেয়! কিন্তু তারা ঘরের ভিতরকার খোঁজ রাখলে কেমন করে? আচ্ছা অমলবাবু, পথের ওপাশে ওই মস্ত বাড়িখানায় কে থাকে বলতে পারেন?'

—'ওটা মেসবাড়ির মতো। ওখানে দেশবিদেশের লোক থাকে, কিন্তু তারা কেউ বাঙালি নয়।'

—'তাহলে ও-বাড়ির তিনতলার ঘর থেকে আপনার এই ঘরের ভিতরে নজর রাখা খুবই সহজ দেখছি! কে বলতে পারে এই মুহূর্তেই ওখানে বসে কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে কি না?'

অমলবাবু চমকে উঠলেন, ম্লান মুখে বললেন, 'বলেন কী? আমি কি তবে শিয়রে শমন নিয়ে বাস করছি?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক। আমরা দুজনে আপনাকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আপনিও প্রতিনমস্কার করে ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। যদি কোথাও শত্রু জেগে থাকে, সে মনে করবে আমরা বিদায় হয়েছি, আর আপনি আবার শুয়ে পড়েছেন। এই পরীক্ষার ফল কী হয়, দেখা যাক।'

কথামতো কাজ হল। জয়ন্ত ও মানিক ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরের আলো নিবে গেল এবং তার পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ।

জয়ন্ত বললে, 'যা ভেবেছি তাই। আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে! কেউ বোধ করি বাঁশির সঙ্কেতে কাদের জানিয়ে দিলে যে, 'সবাই হুঁশিয়ার হও, শত্রুরা এখুনি রাস্তায় বেরুবে!' ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায়? ওরা কি ও-বাড়ি থেকে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি আমার পকেটে ঢুকেছে? আচ্ছা, এসো! আর-একবার অন্ধকারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক।'

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়াল।

তখন বৃষ্টির প্রবল ঝোঁকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তখনও ঝিমঝিম করে ঝরছিল, রাস্তা

দিয়ে তখনও হাঁটু-ভোর জলের ধারা কলকল করে ছুটছিল এবং শেষ রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দা ছিঁড়ে তখনও থেকে থেকে বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝকমক করে জ্বলে উঠছিল।

সেই মুহূর্তেই আবার বিদ্যুৎ ফুটল এবং জয়ন্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে একটা মূর্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো করে দেখা গেল না—কিন্তু কে সে? চ্যান, না আর কেউ?

একটি মাত্র ঢিল ও দুইটি পাখি

অমলবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'কী ভয়ানক! দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন! সত্যিই তো, ও-বাড়ির বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন দুর্যোগে রাস্তার দিকে অত আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে ও-লোকটা কী দেখছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এতক্ষণ ও-লোকটা নিজের অন্ধকার ঘরে বসে আমাদের ঘরের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ করছিল। এখন ও বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কি না! আমরা পথে বেরুলেই বোধ হয় আমাদের উপরে আক্রমণ হবে!'

—'সর্বনাশ! তাহলে আপনারা কী করবেন?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমাদের শত্রুদের গায়ে কত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা খ্যাপা ষাঁড়কে ধরে মাটির উপর কাত করেছিলুম, মানিক সে সাক্ষ্য দিতে পারে! কুস্তি-বক্সিং আমরা দুজনেই জানি। সুতরাং পথে বেরুতে আমাদের কোনও ভয় নেই। কিন্তু অকারণে অশান্তি সৃষ্টি না করে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কাটাতে চাই। এতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

অমলবাবু বললেন, 'আপত্তি? বিলক্ষণ! আপনারা কাছে থাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যান আবার আসে?'

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কাল সকালে আমরাই ওই সামনের বাড়িটায় বেড়াতে যাব।'

—'বলেন কী. ওই বাঘের বাসায়?'

—'কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মেসবাড়ি। তা যদি হয়, তাহলে ওখানে আরও অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে? আমরা ওখানে ঘর ভাড়া করতে বা কোনও চেনা লোককে খুঁজতে যাব! দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গলায় ছুরি বসাতে সাহস করবে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কী লাভ হবে?'

—'প্রথম লাভ হবে এই যে চ্যান ওখানে আছে কি না সেটা জানতে পারব। অমলবাবু তার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যানকে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান ওখানে থাকলে কাল সকালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।'

—'কী অপরাধে, আর কী প্রমাণে?'

—'চ্যানই যে সুরেনবাবুকে খুন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোনও প্রমাণ নেই বটে। কিন্তু চ্যান যে এই বাড়িতে দেওয়াল বেয়ে উঠে চুরি করতে এসেছিল আর অমলবাবুকে খুন করবার

চেষ্টা করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দায় ওই পদচিহ্নগুলো। ওই প্রমাণের জোরেই তাকে এখন অনেক কালের জন্যে জেল খাটানো যেতে পারে। প্রধান শত্রুকে সরাতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে বনবাসী হতে পারব।'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু, আপনি ইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সন্ন্যাসীর কথা মানলে বলতে হয়, ইনও আমাদের মস্ত শত্রু। সে কোথায় আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'তারও চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার তো! অমলবাবু, অতঃপর আপনি ইনের রূপ বর্ণনা করুন!'

অমলবাবু বললেন, 'চ্যান যেমন অসাধারণ ঢ্যাঙা, ইন তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চার ফুটের বেশি তো হবেই না, বরং কম হওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে! দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি গোলাকার পদার্থ যাদুকরের মন্ত্রে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হলেও ইন অত্যন্ত চটপটে আর চুলবুলে। সে ছোটে ক্রিকেট-বলের মতো আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস-বলের মতো। চ্যানের লম্বা চওড়া চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইনকে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে যেতে হয়! আবার চ্যান ও ইনকে একসঙ্গে দেখলেই মনে হয়, ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি বৈচিত্রের কথা!'

জয়ন্ত বললে, 'চমৎকার! মানিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণনা শোনবার পর আর কি ইনকে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হবে?'

মানিক বললে 'নিশ্চয়ই নয়! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের দান করলেন!'

—'ফোটোগ্রাফ নয় মানিক, এ হচ্ছে 'এক্সপ্রেসানিস্ট' চিত্রকরের আঁকা ছবি; এ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকে এঁকে কিছু দেখালে না, কিন্তু মূল ভাবটি হুবহু প্রকাশ করলে। তুমি যদি ইনের সত্যিকার একখানা ফোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহলেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না! কিন্তু যাক সে কথা! ভোরের পাখি ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্বপ্নলোক দেখবার চেষ্টা করা দরকার!'

পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুম্ভ শূন্য হয়ে গেল—এখন আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। এবং সূর্যের তাপে মেঘগুলোও মোমের মতন গলে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লা জল কমেছে বটে, কিন্তু এখনও জুতো না ভিজিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্যদিনে এসময়ে বিচিত্র জনতার অনৈক্যতানে রাজপথের তন্দ্রা ছুটে যায়। আজ এখনও তার ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়নি। যার নিতান্ত দায়, সেই-ই পথে পা বাড়িয়েছে। অনেক দোকান এখনও বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আর্তনাদ প্রায় স্তব্ধ, মোটররা এখনও মানুষমৃগয়ার লোভে উৎসাহিত হয়নি।

জয়ন্ত ও মানিক যখন রাস্তার ওপাশের মস্ত বাড়িখানার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোনও কচকচিই জাগেনি।

একটা বুড়ো হিন্দুস্থানি দারোয়ান সদর দরজার চৌকাঠে বসে দাঁতনকাঠি চর্বণ করছিল। জয়ন্ত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'দরোয়ানজি, এ বাড়িতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?'

দারোয়ান একটু বিস্মিত ভাবে জানালে যে এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু 'বাংগালি বাবু'দের থাকবার সুবিধা হবে না।

জয়ন্ত বললে, 'সে কথা আমিও বুঝি দারোয়ানজি! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব

না, খান দুই-তিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিস করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার কিনা!'

দারোয়ান জানালে, তিনতলায় চারখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে পারেন।

'তিনতলায়? সেখানে আর ক-ঘর ভাড়াটে আছে?'

শোনা গেল, তিনতলায় রাস্তার দিকে দুখানা ঘর নিয়ে পাঁচ-ছয়জন বর্মি লোক আছে। ভিতরের দিকে আছে একঘর মাদ্রাজি। বর্মিদের ঘরের পাশেই দুখানা ঘর খালি আছে।

জয়ন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মানিকের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল।

কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ির—বিশেষত যেখানে অবাঙালির বাস—সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণাকর স্থান। তার ধাপে ধাপে চোখে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের মূত্র ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধ জঞ্জাল এবং তার দেওয়াল হয়, থুতু পানের পিক ও অন্যান্য নানা নক্কারজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রবিচিত্র। শ্বাস ও চক্ষু বন্ধ করে এবং যতটা সম্ভব জড়োসড়ো হয়ে সেখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়।

জয়ন্ত ও মানিক এই ভাবেই দোতলায় গিয়ে উঠল।

দোতলায় চারিদিকে বারান্দা ও তারপর সারি সারি ঘর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে ডাস্টবিনের চেয়েও নোংরা একতলার উঠান দেখা যায়।

অধিকাংশ ঘরের দরজা-জানলাই সারারাত্রব্যাপী বৃষ্টির জন্যে এখনও বন্ধ এবং তাদের ভিতর থেকে একাধিক নাসিকার তর্জন-গর্জন বাইরে বেগে ছুটে আসছে।

তারা তিনতলায় উঠতে শুনতে পেলে, তিন-চারজন লোকের দ্রুত পদধ্বনি!

কিন্তু তিনতলায় উঠে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলে না এবং সেখানেও বারান্দার ধারের প্রত্যেক ঘরের দরজা জানলা বন্ধ রয়েছে।

তারা চারিদিকের বারান্দা ঘুরে এল—তবু কারুর দেখা বা সাড়া নেই, এমনকি এখানে কারুর নাক পর্যন্ত ডাকছে না!

মানিক মৃদুস্বরে বললে, 'কিন্তু উপরে এখনই যাদের পায়ের শব্দ পেলুম তারা কে, আর গেলই বা কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'হয়তো তারাই হচ্ছে চ্যান ও ইন কোম্পানির লোক, আমাদের সাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে! মানিক এখন একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে!'

একটা ঘরের দরজায় বাহির থেকে তালা লাগানো রয়েছে।

দারোয়ানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাস্তার ধারের বারান্দা।

সেখানে গিয়ে সুমুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো মানিক, এখান থেকে অমলবাবুর ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!'

বারান্দার যেখান থেকে কাল রাত্রের সেই মূর্তিটা পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়ন্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে আস্তে আস্তে একটা জানলা বন্ধ করার আওয়াজ হল।

মানিক চুপি চুপি বললে, 'বারান্দার ধারের একটা ঘরের জানলা খোলা ছিল আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ করে দিলে!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করছে। হয়তো আমাদের মতলব ধরে ফেলেছে!'

যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানে গিয়ে তারা দেখলে, একটা জানলা ও একটা দরজা রয়েছে। দুই-ই বন্ধ।

দরজার কড়া ধরে জয়ন্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোনও সাড়া নেই।

জয়ন্ত বললে, 'এরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চলো, নীচে নেমে অন্য উপায় চিন্তা করি গে।'

দুজনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল।

আর-একবার এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—আগে মানিক, তারপর জয়ন্ত।

হঠাৎ হুড়মুড় করে বিষম একটা শব্দ হল—মানিক চমকে পিছনে তাকাতে না তাকাতে জয়ন্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহূর্তেই ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে মানিক সিঁড়ির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দৈবগতিকে মানিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু যন্ত্রণায় সে যেন অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়ন্তের দেহ গড়াতে গড়াতে দুমদুম শব্দে নীচে নেমে যাচ্ছে!

তারপরেই চারিদিকে ব্যস্ত পদধ্বনি, চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি! সে বুঝলে, জয়ন্ত হঠাৎ পা-হড়কে সিঁড়ির উপর পড়ে গেছে!

প্রায় দুই মিনিটকাল সেইখানে আচ্ছন্নের মতো বসে থেকে মানিক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দোতলায় নেমে সে দেখলে, সেখানে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি ও মাড়োয়ারির ভিড়!

জয়ন্ত বারান্দার রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্ধ-মূর্ছিতের মতন বসে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে এবং কেউ তার মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছে ও কেউ পাখা নেড়ে বাতাস করছে!

মানিক তার কাছে গিয়ে ডাকলে, 'জয়, জয়, তোমার কি বড্ড বেশি লেগেছে?'

অভিভূতের মতো জয়ন্ত খালি বললে, 'হুঁ।'

মিনিট পাঁচেক পরে জয়ন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হল, তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। সে মুখ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কাকে খুঁজতে লাগল।

মানিক বুঝলে, জয়ন্ত এ অবস্থাতেও চ্যান বা ইনকে ভোলেনি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মুল্লুকের কোনও নমুনাই দেখা গেল না।

মানিক বললে, 'জয়, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনব কি?'

জয়ন্ত কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

সকলকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ন্ত ও মানিক ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত নিজের জামার ভিতরকার পকেটে হাত দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুষ্ক স্বরে বললে, 'মানিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোনও বর্মি লোককে দ্যাখোনি?'

—'না। তবে তোমার কাছে যেতে আমার মিনিট দুয়েক দেরি হয়েছিল। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কি না জানি না।'

—'নিশ্চয় এসেছিল!'

—'কী করে জানলে?'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'মানিক, আমি পা পিছলে পড়ে যাইনি।'

—'তবে?'

—'আমাদের সুচতুর বন্ধু এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করেছে!'

—'জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত খুব শুকনো হাসি হেসে বললে, 'মানিক, তোমার পরে আমি নামছিলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধাক্কা মারলে যে, তোমাকে নিয়ে আমিও হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলুম।'

মানিক সচকিত কণ্ঠে বললে, 'বলো কী জয়! কে ধাক্কা মারলে? তাকে দেখেছ?'

—'না, দেখবার সময় পাইনি। তবে তার গায়ে যে ভীষণ জোর আছে, ধাক্কা খেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। তারপর আমি যখন দোতলার বারান্দায় পড়ে প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে সাহায্য করবার অছিলায় অজানা বন্ধু আমার পকেট থেকে সেই বড়ো চাবিটা আর নকশা আঁকা সোনার চাকতি নিয়ে দিব্যি সরে পড়েছে।'

—'সর্বনাশ! এখন উপায়?'

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবুর বাড়িতে ফোন আছে। তুমি এখনই গিয়ে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে একদল কনস্টেবল নিয়ে এখানে আসতে বলো। এই বাড়িখানা তল্লাশ করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দি।'

গোপীনাথের মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু যখন মানিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়ন্ত তখন অস্থির পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কণ্ঠে সে বললে, 'এত দেরি হল কেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু তাঁর মাথাজোড়া ঘর্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন, 'হুম! দেরি হবে না? শুনলুম বাড়ি খানাতল্লাশ করতে হবে, উপরওয়ালার কাছ থেকে হুকুমনামা আনতে হল যে! কিন্তু ব্যাপার কী জয়ন্ত? সত্যিই কি তুমি সুরেনবাবুর হত্যাকারীর খোঁজ পেয়েছ?'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস! অন্তত যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।'

—'হুম। মানিকের মুখে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহস্যসাগর আবিষ্কার করেছ! পদ্মরাগ বুদ্ধ, নকশা আঁকা সোনার চাকতি, একটা চাবি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন ওসব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। চলুন ওই বাড়ির ভিতর যাই।'

—'কিন্তু অপরাধী কি এখনও ওখানে আছে?'

—'বর্মিদের উপরেই আমার সন্দেহ! কিন্তু এবাড়ির ভেতর থেকে কোনও বর্মি-লোক বাইরে বেরোয়নি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে বেরুতে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।'

—'বেশ, তবে চলো।'

এত পাহারাওয়ালা দেখে দারোয়ানের দুই চক্ষু বিস্ময়ে ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু পুলিশসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'এই পাঁড়ে!'

দারোয়ান মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'আমি পাঁড়ে নয় হুজুর, আমি হনুমান চোবে!'

—'তুমি হনুমান চোবেই হও, আর জাম্বুবান পাঁড়েই হও, সেকথা আমি জানতে চাই না! আমাদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে চলো!'—তারপর পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরে সুন্দরবাবু হুকুম দিলেন, 'এই সেপাইরা! আমার সঙ্গে জন-ছয়েক লোক এসো, বাকি সবাই এইখানে পাহারা দাও,—কেউ যেন এই বাড়ির বাইরে যেতে না পারে!'

জয়ন্ত ও মানিক সবাইকে নিয়ে তেতলায় গিয়ে উঠল।

বর্মিদের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ছিল।

সুন্দরবাবু পাল্লার উপরে এক লাথি মারতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, চারজন বর্মি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে বললেন, 'এই মগের বাচ্ছারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কী করতে এসেছিস?'

একটা লোক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, 'আমরা এখানে ব্যাবসা করতে এসেছি।'

—'হুম! মানুষ মারবার ব্যাবসা? ওহে জয়ন্ত, এ ব্যাটাদের কোনটাকে তুমি চাও?'

বর্মিদের কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের আপাদমস্তক লক্ষ করে বললে, 'তোমরা ক-জন এখানে থাকো?'

তারা জবাব দেবার আগেই দারোয়ান হনুমান চোবে বললে, 'হুজুর! এখানে দুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্মি থাকে।

জয়ন্ত বললে, 'এরা তো মোটে চারজন দেখছি। আর দুজন কোথায়?'

একজন বর্মি বললে, 'আধঘণ্টা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।'

জয়ন্ত চুপিচুপি সুন্দরবাবুকে বললে, 'লোকটা মিছে কথা কইলে। আমি হলপ করে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোনও বর্মি বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।'

—'হুম, মিছে কথা না? তাহলে বেটাদের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! চলো, ভেতরের ঘরটা খুঁজে দেখি!'

কিন্তু অন্য ঘরে ঢুকেও বাকি দুজনের দেখা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ফিরে বললেন, 'এই জাম্বুমান পাঁড়ে!'

দারোয়ান হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, আমার নাম হনুমান চোবে!'

—'ও একই কথা। সকাল থেকে তুমি দেউড়িতে আছ?'

—'হাঁ হুজুর!'

—'দুজন বর্মিকে তুমি বাইরে যেতে দেখেছ?'

—'না হুজুর!'

—'তাহলে তারা কি হুস করে আকাশে উড়ে গেল?'

—'বড়োই তাজ্জবের কথা হুজুর! আরও দুজন লোক এ ঘরে থাকে—একজন [illegible] ঢ্যাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে!'

মানিক জয়ন্তের কানে কানে বললে, 'চ্যান আর ইন-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!'

জয়ন্ত কেবল বললে, 'হুঁ।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

জয়ন্ত বললে, 'সেই চাকতি আর চাবির খোঁজ। যদিও ও-দুটো জিনিস খুব সম্ভব সেই অদৃশ্য লোক দুটোর সঙ্গেই আছে, তবু একবার এই ঘরদুটো খুঁজে দেখা যাক।'

খানাতল্লাশ শুরু হল।

দুটো ঘরের সমস্ত ওলট-পালট করে এমনকি বিছানার বালিশ পর্যন্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা হল, কিন্তু চাবি আর চাকতি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে সুন্দরবাবু বললেন, 'সে মগদুটো তাহলে বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। এই জাম্বুমান—'

—'হুজুর, হনুমান—'

—'না আমি তোমাকে জাম্বুমান বলেই ডাকব! বারান্দার ওপাশের ওই ঘরে কে থাকে?'

—'একজন মাদ্রাজি সদাগর।'

—'আচ্ছা, আগে ওই ঘরখানাই দেখা যাক। এসো জয়ন্ত! এই সেপাই, হুঁশিয়ার! মগের বাচ্ছাগুলো যেন সরে না পড়ে!'

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সুন্দরবাবুর ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়ন্ত শুধোলে, 'হনুমান চোবে, এ ঘরে যে মাদ্রাজি থাকে তার নাম জানো?'

—'জানি হুজুর! গোপীনাথ নায়ডু।'

সুন্দরবাবু হাঁকলেন, 'গোপীনাথ! গোপীনাথ!'

কোনও সাড়া নেই।

দারোয়ান একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'গোপীনাথবাবু তো খুব ভোরে ওঠেন, তবে এখনও দরজা বন্ধ কেন।'

সুন্দরবাবু আবার পদযুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচ বার লাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়াম করে দরজার পাল্লাদুটো খুলে গেল!

হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকেই সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে 'হুম' বলে চিৎকার করে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।

মানিক বললে, 'কী হল সুন্দরবাবু, কী হল?'

সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'হুম!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ!

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিত হয়ে চারিদিকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লম্বা-চওড়া মাদ্রাজি,—তার বুকের উপরে আমূলবিদ্ধ একখানা মস্ত ছোরা! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে!

দারোয়ান বিহ্বল স্বরে ডাকলে, 'গোপীনাথবাবু!—গোপীনাথবাবু!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'গোপীনাথবাবু এ জীবনে আর কথা কইবে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'গোপীনাথকে এখনই কেউ খুন করেছে! সাবধান, খুনি ঘরের ভিতরেই আছে, কারণ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!'

জয়ন্ত ঘরের চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'জানলার দিকে চেয়ে দেখুন। খুনি পালিয়েছে!'

একটা খোলা জানলার দুটো লোহার গরাদ দুমড়ে ফাঁক হয়ে রয়েছে!

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপ! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদ তারের মতন দুমড়ে ফাঁক করে পালানো যায়?'

মানিক বললে, 'এ চ্যান ছাড়া আর কেউ নয়! কিন্তু চ্যান এই গোপীনাথ বেচারাকে খুন করলে কেন?'

সুন্দরবাবু এদিকে ওদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'দ্যাখো মানিক, ঘরের সমস্ত জিনিস লন্ডভন্ড! যেন কেউ এখানে মালপত্তর উলটেপালটে কিছু খুঁজেছিল!'

ঘরের সর্বত্রই রাশি রাশি চটিজুতা, কাঠের পুতুল, 'ল্যাকারে'র কৌটো প্রভৃতি ছড়ানো রয়েছে!

মানিক বললে, 'দেখছি, সমস্ত জিনিসই বর্মায় তৈরি! গোপীনাথ কি বর্মা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যাবসা করত?'

দারোয়ান বললে, 'হাঁ বাবুজি!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আবার দেখছি একটা নতুন মামলা ঘাড়ে চাপল। যাই, উপরঅলাদের কাছে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি গে!'

সুন্দরবাবু বাইরে গেলেন। মানিক বললে, 'জয়, তুমি বোবা হয়ে কী ভাবছ বলো দেখি?'

জয়ন্ত দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিল। মুখ তুলে বললে, 'মানিক, আমি মনে মনে আঁক কষছিলুম। দুই আর দুই যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হয়।'

—'অর্থাৎ?'

—'মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্যি হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোনও অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি এইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এঁর ব্যাবসা ছিল ব্রহ্মদেশ থেকে মাল আমদানি করা। অতএব ধরে নেওয়া যাক, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্মায় গিয়েছে আর বর্মি ভাষাও তার অজানা নয়। গোপীনাথ হঠাৎ একদিন এই ঘরে বসে দেখলে যে একদল বর্মি লোক সামনের ওই ঘর দুখানা ভাড়া নিলে। কলকাতার এই পাড়ায় এটা খুব স্বাভাবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্মিদের হাবভাব রহস্যময়। তারা কোনও কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাবুর বাড়ির দিকে নজর রাখে, আর বর্মি ভাষায় কী পরামর্শ করে। গোপীনাথও তখন কৌতূহলী হয়ে তাদের উপরে আড়ি পাতলে, তাদের গুপ্তকথা জেনে ফেললে! তখন সে-ও তাদের উপরে—আর অমলবাবুর বাড়ির উপরে পাহারা দিতে লাগল। কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাকতি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান আর ইন কোম্পানি আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি বটে, কিন্তু গোপীনাথ তাদের চেয়েও সাহসী, এমন সুযোগ সে ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে ধাক্কা, আমি পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম, সেই ফাঁকে গোপীনাথ আমার চাকতি আর চাবির অধিকারী হল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে উপরের বারান্দা

থেকে চ্যান আর ইন কোম্পানির কেউ সেই দৃশ্যটা দেখে ফেললে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে! মানিক, আমি কি অঙ্ক কষতে ভুল করেছি বলে মনে করো?'

ইতিমধ্যে কখন সুন্দরবাবু আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন এবং জয়ন্তের কথা কিছু কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, 'না, জয়ন্ত! তুমি তো অঙ্ক কষছ না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! হুম, ওই তো হচ্ছে শখের গোয়েন্দাদের বদ স্বভাব! তারা যখন কবিত্ব করে, আসল অপরাধী তখন কেল্লা ফতে করে সরে পড়ে!'

সে-কথায় কান না দিয়ে মানিক বললে, 'তাহলে তোমার মত হচ্ছে, গোপীনাথকে খুন করে চ্যান আর ইন এই ঘর খানাতল্লাশ করে চাবি আর চাকতি নিয়ে ওই জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে?'

জয়ন্ত কিছু বললে না, সামনের দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ করে মানিক দেখলে, সামনের দেওয়ালের গায়ে একখানা বড়ো 'ব্রমাইড এনলার্জমেন্ট' ছবি টাঙানো রয়েছে! ছবিখানা মৃত গোপীনাথের, কিন্তু উলটো করে টাঙানো রয়েছে।

মানিক বললে, 'চ্যান আর ইন দেখছি ছবিখানা নিয়েও টানাটানি করেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি উলটো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'তারা যদি ওই ছবিখানা নামাত তাহলে আবার ওখানা টাঙিয়ে রেখে যাবার মাথাব্যথা তাদের হত না বোধ হয়! দ্যাখো না, ঘরের যেসব জিনিস তারা ঘেঁটেছে, কোনওটাই গুছিয়ে রেখে যায়নি।'

—'তবে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখন উলটো আর সোজা ছবি নিয়ে গোলমাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!'

জয়ন্ত বললে, 'এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হল কি উলটো হল সেটা দেখবার সময় আর পায়নি।'

—'কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কী?'

—'ছবিখানা আর একবার নামালেই হয়তো কারণ বোঝা যাবে!'—এই বলে জয়ন্ত উঠে গিয়ে ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেখানা উলটে দেখলে, ছবির পিছনে পিজবোর্ডের এক জায়গা উঁচু হয়ে আছে এবং দুটো কাঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে!

জয়ন্ত পিজবোর্ড ফাঁক করে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাকতি!

মানিক ও সুন্দরবাবুর দৃষ্টি একেবারে চমৎকৃত!

জয়ন্ত খুশিকণ্ঠে বললে, 'চাবি আর চাকতি চুরি করে গোপীনাথ ঘরে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি জিনিস দুটো ছবির পিছনে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। এমন সময়ে চ্যান আর ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনিরা খানাতল্লাশিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জানলাপথে চ্যান আর ইনের পলায়ন। সুন্দরবাবু দেখছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না? আলেকজান্দার একেবারেই পৃথিবী জয় করেননি, প্রথমে তিনি কল্পনাতেই পৃথিবী জয়ের উপায় স্থির করেছিলেন! যার কল্পনাশক্তি নেই, দুনিয়ায় তার পরাজয় পদে পদে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দৈবগতিকে যখন জিতে গেছ, তখন দুকথা শুনিয়ে দাও ভায়া, শুনিয়ে দাও। এই জাম্বুমান পাঁড়ে—'

—'হুজুর, হনুমান চোবে—'

—'ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধ হয় বড়োসাহেব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চলে যাও।'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি, আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই! কিন্তু সুন্দরবাবু, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা বলে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাসখানেক ছুটি নিন।'

—'কেন?'

—'আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য শুরু হবে একেবারে কাম্বোডিয়ার জঙ্গলে, ওঙ্কারধামের ধ্বংসস্তূপে। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম।'

ওঙ্কারধামের যাত্রী

ধান-খেতের পর ধান-খেত, তারপর আবার ধান-খেত! সবুজের পর সবুজ আর সবুজ!

যতদূর চোখ চলে খালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেলগাছ, কলাগাছ আর বাঁশবনের ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে একটি সুদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়ে না!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী! কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়াঘাটে নৌকায় চড়ে পার হতে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোটো ছোটো গ্রাম।

সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে বসে আনামি স্ত্রীলোকেরা চিংড়িমাছ, কমলালেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রি করছে।

ধুলোর স্তূপে খেলা করছে নগ্ন বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিধে রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর।

একখানা গাড়িতে আছে জয়ন্ত ও মানিক, পরের গাড়িতে অমলবাবু ও সুন্দরবাবু, তার পরের গাড়িতে দরকারি জিনিসপত্র এবং চাকরবাকর।

সুন্দরবাবু বলছিলেন, 'এ যে দেখছি অন্নপূর্ণার স্বদেশ! পাশাপাশি একটানা এত বেশি ধানের খেত কেউ কি কখনও চোখে দেখেছে? হুম!'

অমলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এদেশ এমনি উর্বর বলেই একদল ভারতবাসী সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে নতুন এক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, নতুন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।'

—'হুম, ওসব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না।'

—'না সুন্দরবাবু, সেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ চিহ্ন যখন স্বচক্ষে দেখবেন, তখন আর অবিশ্বাসের কথাই তুলতে পারবেন না...

সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই আপনাকে শুনিয়ে রাখছি।

এ দেশটা আসলে শ্যামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসিদের অধিকারে এসেছে।

আজ ফরাসিরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে নিবিড় বন কেটে সাফ করেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত

এটা ছিল বাঘ আর হাতির নিজস্ব মুল্লুক, এখানকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি সাহসী মানুষও পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সত্তর বছর আগেও পৃথিবী ওঙ্কারধামের নাম শোনেনি।

সতেরো শতাব্দীতে পর্তুগিজ মিশনারিরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপে ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে সেই বিস্ময়কর কাহিনি প্রচার করেন।

মিশরের পিরামিডের মতন বড়ো আশ্চর্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ! সবাই গল্প শুনলে বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে না।

পরে সে গল্পও লোকে ভুলে গেল...

বড়ো বড়ো বটগাছ, বাঁশবন, নারিকেলগাছ ও নানা জাতীয় লতাগুল্ম এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ চিহ্নগুলিকে এমন ভাবে ঢেকে রইল যে, বাইরের কোনও কৌতূহলী চক্ষু আর তাদের কোনও খোঁজই পেলে না...

দিনের পর দিন যায়—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ!

ফরাসিরা প্রথমে ব্যাবসা সূত্রে ইন্দো-চিনে পদার্পণ করলে।

লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল, অরণ্যের অন্ধকারে যেখানে সূর্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞাতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অদ্ভুত রাজধানী, মাইলের পর মাইল ব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব মন্দির, বিচিত্র প্রাসাদ! কোনও কোনও পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও সেইসব প্রবাদ শুনলেন।

অনেকেই বললেন, এই প্রবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে, ওখানে আগে কোনও বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিস্ময়কর সভ্যতার পিছনে কোনও চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বনবাসে লুকিয়ে থাকতে পারে কেবল অসভ্যতাই।

কিন্তু চিনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুথিপত্রেও কাম্বোজের এক আশ্চর্য সভ্যতার কাহিনি পাওয়া যায়!

Mouhot একজন ফরাসি ভদ্রলোকের নাম। তাঁর কৌতূহল জাগল। পলাতক এই সভ্যতাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে গোয়েন্দার মতন তিনি বাঘ আর হাতির মুল্লুকে প্রবেশ করলেন।

বাঘেরা জঙ্গলের ছায়ায় বসে, হাতিরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগরেরা গাছের ডালে ডালে ঝুলে পড়ে সবিস্ময়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষের মুখ।

ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্রবেশ পথের উপরে জেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়-দেবতা শিবের চারিটি বিপুল মুখমণ্ডল, তাদের পাষাণ নেত্রের সামনে বহুযুগ পরে আবার ক্ষুদ্র মানুষের আবির্ভাব হল!

বোবা পাথরের উপরে বিস্ময়ের শব্দ-রেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিনি বহন করে Mouhot আবার আধুনিক সভ্যজগতে ফিরে এলেন, দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে...

সেকালের পৃথিবীতে এক জাতি যখন আর এক জাতিকে আক্রমণ করত, পরাজিত জাতিকে তখন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হত। তারা আবার নতুন দেশে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের তাড়িয়ে বা বশ করে নতুন রাজ্য স্থাপন করত।

এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোনও কোনও রাজ্য এখনও টিকে আছে।

সম্ভবত এই ভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সাগর পেরিয়ে শ্যামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাব্দী আগে এখনও সেটা স্থির হয়নি।

তবে তেরো কি চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের হাতে গড়া নতুন সভ্যতার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয়নি, এমন কথা বলা যায়।

এই সভ্যতার আশ্রয়ে যে এক সময়ে তিন কোটি মানুষ নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মতো প্রমাণেরও অভাব নেই।

ওঙ্কারধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড়ো নগর এবং তার ধ্বংসাবশেষ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশ লক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

কিন্তু তাদের মেঘছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস করে আজও বেঁচে আছে—যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশরিদের পিরামিড!

ওঙ্কারধামের এই অদ্ভুত মন্দির শিল্পের দিক দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়ো, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্য!

মানুষের হাত পৃথিবীর আর কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দিগ্বিজয়ী হিন্দু—আমাদেরই পূর্বপুরুষ!

সুন্দরবাবু, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্তি স্বচক্ষে দেখলে আপনাকে স্তম্ভিত হতে হবে! মানুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে একথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,—মনে করবেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মর্তে অবতীর্ণ দেবতা!'

সুন্দরবাবু উত্তরে মনের মতো কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, 'হুম!'

প্রথম গাড়িতে তখন মানিক বলছিল, 'জয়, কলকাতার অলিগলিতে চ্যান আর ইন হয়তো এখনও আমাদের খুঁজে মরছে!'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, 'শত্রুদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ঠকে মরে তারাই! খুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারিনি।'

—'কিন্তু জয়, যে-জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান আর ইন ছিল না, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরোহীদের দলে তারা ছিল না।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, 'হতে পারে। না হতেও পারে।'

ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ!

জয়ন্ত সচমকে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা—অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

জয়ন্তদের তিনখানা গাড়ি ঠিক পরে পরেই ছুটেছে।

কিন্তু আরও খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরও দুখানা নূতন মোটরগাড়ি! রাস্তার উপরে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করে গাড়ি দুখানা ছুটে আসছে যেন বিদ্যুৎবেগে!

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এত বেগে ওরা কারা গাড়ি চালায়! ক্রমাগত হর্নের পর হর্ন দিয়ে ওরা আমাদের পথ ছেড়ে সরে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়িই বা কীসের?'

পিছনের গাড়ি থেকে ব্যস্ত-স্বরে চেঁচিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো! নইলে এখনই অ্যাকসিডেন্ট হবে!'

জয়ন্ত নিজেদের ড্রাইভারকে বললে, 'গাড়ি নিয়ে একপাশে সরে যাও। গাড়ি একেবারে থামিয়ে ফ্যালো।'

ড্রাইভার তার কথামতো কাজ করলে। তাদের অন্য গাড়ি দুখানাও পথের একপাশে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে জয়ন্ত পথের উপর নেমে পড়ল। তারপর নিজের কোমরবন্ধে সংলগ্ন রিভলভারের উপর হাত রেখে পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধুলোর মেঘে ঢাকা দুখানা গাড়ি তার অজ্ঞাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খুব কাছে এসে পড়েছে!

মহাকালের অভিশাপ

জয়ন্তের পাশে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, 'জয়, তুমি কি মনে করো, ও গাড়ি দুখানার মধ্যে আমাদের শত্রু আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'শত্রু মিত্র জানি না, আমি কেবল সতর্ক হয়ে থাকতে চাই।'

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ করে ক্রমাগত হর্ন বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্র গতিতে সাঁৎ করে তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় গাড়িখানা! গাড়ি তো নয়, যেন দু-দুটো অগ্নিহীন উল্কা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোনও মানুষের মুখই আবিষ্কার করা গেল না!

সুন্দরবাবু বললেন, 'মেল-ট্রেনের স্পিডও এদের কাছে বোধ হয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে?'

পথের ধুলোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'যেখানেই যাক, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। আমরা ওদের নাগাল ধরবই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নাগাল ধরবে মানে? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশি জোরে গাড়ি ছোটাতে হয়! হুম, আমি তাতে মোটেই রাজি নই! গাড়ি যদি একবার হোঁচট খায়, তাহলে ওঙ্কারধাম দেখবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাজির হতে হবে!'

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, 'ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প পড়েননি? কচ্ছপ দৌড়ে খরগোশকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ির স্পিড না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধুলোর ওপরে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও হো হো হো, বুঝেছি! ওই দাগ ধরে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো?'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কী?'

জয়ন্ত বললে, 'দরকার একটু আছে বই কি! এমন মারাত্মক স্পিড নিয়ে যারা আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন!'

অমলবাবু ভীত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, ওই গাড়ি দুখানার মধ্যে চ্যান আর ইন আছে?'

—'চ্যানকেও চিনি না, ইনকেও চিনি না, এখন উঠুন গাড়িতে!' —এই বলে জয়ন্ত নিজের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ি তিনখানা আবার অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত প্রথম গাড়ির ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল, পূর্ববর্তী গাড়িগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আচ্ছা জয়, যারা গেল তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না করে এগিয়ে গেল কেন? আর শত্রুরা সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলই বা কী করে? আমাদের জাহাজে তারা তো ছিল না!'

জয়ন্ত বললে, 'চ্যান আর ইন হয়তো এখনও এখানে এসে পৌঁছোতে পারেনি, কিন্তু মানিক, তুমি ভুলে যেয়ো না যে এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমাদের আগেই কালাপানি পার হয়েছে!'

—'জয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোনও টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকেরা আমাদের পিছু নিয়েছে?'

—'হতেও পারে, না হতেও পারে! হয়তো ওরা হুকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে! ওঙ্কারধামে যাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটিই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগলে থাকবার জন্যে।'

গাড়ি ছুটছে! দু-ধারে সেই সবুজ খেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।

মানিক বললে, 'দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।'

ড্রাইভার বললে, 'হ্যাঁ, ওর নাম সিয়েম রিপ। আর মাইল খানেক পরেই আমরা ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছোব।'

সিয়েম রিপ গ্রাম থেকে উত্তর দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সামনে জেগে উঠল, বিরাট ওঙ্কারধামের বিপুল দেবালয়!

চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও সুদীর্ঘ বনস্পতিরা ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়ার অনেক নীচে পড়ে রয়েছে।

দূর থেকে ওঙ্কারধামকে দেখে মনে হল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন রূপে সাজাহান বাদশার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়। এই অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

এ যেন আলাদিনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে গড়া কোনও অসম্ভব মায়ামন্দির, যে-কোনও মুহূর্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

ওঙ্কারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্তী সেই গাড়ি দুখানার চাকার দাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু সর্বপ্রথমেই ডাকবাংলোয় ঢুকে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!'

জয়ন্ত বললে, 'আপাতত আমাকে ও-দুটি সুখ থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!'

মানিক বললে, 'কিন্তু এখানে তদারক করবার কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে না। চারিদিক শান্তিময়, শত্রুদের কোনও চিহ্নই নেই।'

'হ্যাঁ, ঝড়ের আগে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে বটে—' মৃদুস্বরে এই কথা বলেই জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, 'এই ওঙ্কারধাম আমার পুরোনো বন্ধুর মতো। মানিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ করে আসতে চাই।'

মানিক বললে, 'এই অদ্ভুত মন্দির আমারও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

অগ্রসর হতে হতে অমলবাবু অর্ধনিমীলিত নেত্রে যেন সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়েই যে কাহিনি বর্ণনা করলেন তা হচ্ছে এই—

অস্তলোক থেকে পুর্ব আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীলপাহাড়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী—যেন তাদের আর শেষ নেই!

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হস্তীদলের পৃষ্ঠে! চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চড়ে! চলেছেন বীরবৃন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে বসে! চলেছে সভাসদ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্মচারী, সওদাগর ও ধনী দীন প্রজার দল যথাযোগ্য যানবাহনে বা পদব্রজে! চলেছে রুগ্ন ও ভিখারির দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অনুর্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়ে বা সন্ন্যাসীর গায়ে মাখানো শুকনো ভস্মের মতো সাদা ধুলোয় ভরা উঁচু নিচু পথ মাড়িয়ে;—তাদের কোনও সম্পদ নেই, তবু তারাও পিছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়, কারণ তাদের মনে মনে জ্বলছে উজ্জ্বল আশার অম্লান বাতি! হাজারের পর হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে!

কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফোসকা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে জাগছে পাগলিনদীর ক্রুদ্ধ ঢেউ, দুরারোহ শৈলের দর্পিত শিখর, দুর্গম বনের জ্বালাময় কণ্টকপ্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে—মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-ঋষিদের রচিত পবিত্র মন্ত্রসঙ্গীত! কত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনন্ত পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আত্মা এগিয়ে চলল সেই বিপুর বাহিনীর পিছনে পিছনে!...

কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নির্জন নিস্তব্ধ নির্দয় পথ জুড়ে পড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল,—জীবনের যাত্রাপথে যেসব অভাগা এগিয়ে যেতে পারলে না, তাদেরই শেষ চিহ্ন!

যারা এগিয়ে গেল আর যারা এগিয়ে যেতে পারলে না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারত সন্তান!

হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্নিগ্ধ স্পর্শ ভুলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ করে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী, মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে—আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদচারণ করছি! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনও কোনও বিধর্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয়নি। খুব সম্ভব তারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাদ্রাজ বলে জানি।

ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষায় লিপি খুদে গেছে, তাই দেখেই এই সত্য জানা যায়। ওঙ্কারধামের অসংখ্য মূর্তিও তাদের মৌন ভাষায় আর এক নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করবে—যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ।

এইখানে গহন বন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিরাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অটুট হয়েই আছে! ভারতের গান্ধার, সারনাথ বা কোণারকের মতো এখানে আমরা কোনও প্রাচীন শিল্পকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওঙ্কারধামের শত শত শিলাচিত্র, হাজার হাজার দেবতা দানব মানব ও পশুর মূর্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে।

এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারেনি!

...মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগেই যেন জীবন্তদের কলকোলাহলে ছিল চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে—দেবদাসীরা পায়ের নূপুর খুলে যেন এই সবে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে পুজো সেরে এই সবে যেন চোখের অন্তরালবর্তী হয়েছেন, ধূপধুনো অগুরুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত!

ঐতিহাসিকরা বলেন, এক সময়ে ওঙ্কারধামের মতন বড়ো শহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না।

নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারতশিল্পী যখন এই শহরকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন, তখন ইউরোপের যে-কোনও নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হত!

এথেন্স, রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিখ্যাত ও অমর নগর তাদের উন্নতির দিনেও যে ওঙ্কারধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মতো প্রমাণ নেই!

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিংস্র পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর রাজধানীকে নিক্ষেপ করে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল? কোথায় গেল সেই সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা?

আজকের বোবা ওঙ্কারধাম সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগে যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে যে-কোনও মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনরধিকার করতে পারে!

অবাক হয়ে অতীত ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মানিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে—পশ্চিম আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনও দুলছে হালকা মেঘে।

ওঙ্কারধামের পদ্ম ফোটা খালের ঝিলমিলে জলে, বট আর নারিকেল কুঞ্জের ভিড়ে ক্রমেই বেশি করে জমে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া!

বিভিন্ন দল বেঁধে ছোটো ছোটো মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কানে আসছে দূরের মন্দিরগর্ভ ভেদ করে আধুনিক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গম্ভীর মন্ত্রছন্দ! শুনলে আত্মা শিউরে উঠে,—এ কি বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠরব, না বহুযুগের ওপারে বসে ওঙ্কারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত স্বরে স্তবপাঠ করত, তারই সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে?

মানিক হঠাৎ মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলে, তার সুমুখেই জেগে উঠেছে আশ্চর্য ও বিচিত্র এক নগর তোরণ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র সে ইংরেজি কেতাবে

এর আগেই দেখেছে! কিন্তু এর আসল ভাবের কোনও আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারেনি।

খুব উঁচু সেই নগর তোরণ, তার দ্বারপথ দিয়ে অনায়াসে বড়ো বড়ো হাতি আনাগোনা করতে পারে এবং তার উপরে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিরাট শিবের মুখ! এমন বৃহৎ শিবের মুখ মানিক জীবনে কোনও দিন দেখেনি!

ওঙ্কারধামের একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগরকে 'প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করে গেছেন। এখানকার হিন্দুরা জীবনধারণ করত তরবারির সাহায্যেই। তাদের স্থাপত্যেও প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচণ্ড ভাবই! কারণ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতে গেলেই শিবের যে প্রকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,—সে যেন আগন্তুককে বলতে চায়, সাবধান! পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মুখদুখানি যেন অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা। এবং তোরণের ভিতর দিক থেকে যে মুখখানি নগরের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ভিতর থেকে যেন আশীর্বাদ ও বরাভয়ের ভাব আবিষ্কার করা যায়!

প্রলয়কর্তা শিবকে নগররক্ষী রূপে নির্বাচন করে ওঙ্কারধামবাসী ভারতীয়রা উচিত কার্যই করেছে। কারণ, বারে বারে তারা যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করত পৃথিবীর বুক ভেসে যেত তখন শোণিত প্রবাহে!

প্রলয়-দেবতার প্রীতির জন্যে লক্ষ লক্ষ শত্রুর প্রাণবলি দিয়ে অবশেষে তারা নিজেরাও পাষাণ দেবতার পায়ে আত্মদান করে চির বিদায় নিয়ে গিয়েছে। তাদের স্মৃতির শ্মশানে শেষ পর্যন্ত আজ জেগে আছেন কালজয়ী এবং চির-একাকী প্রলয়-দেবতাই!

অমলবাবু তোরণের উপর দিকে শিবের ভয়াল মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে নমস্কার করে বললেন, 'হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কর্তা নও, সৃষ্টি করাও তোমার কাজ! অবোধ প্রাণী আমরা, লোভে অন্ধ হয়ে তোমার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি বলে আমাদের অপরাধ নিয়ো না প্রভু, আমাদের তুমি রক্ষা কোরো!'

মানিক হেসে বললে, 'এই পাথরে গড়া জড়দেবতার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহলে ওঙ্কারধাম আজ শ্মশান হয়ে যেত না!'

অমলবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মানিকবাবু, তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনই সর্বনাশ হবে।'

মানিক বললে, 'সর্বনাশ যদি হয়, তাহলে ওই পাথরের দেবতার জন্যে নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের নিজেদের বুদ্ধির ভুলেই হবে!'

মানিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন সন্ধ্যার কালিমাখা স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে আচম্বিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকের শব্দ ও তীব্র আর্তনাদ! তারপরেই আবার বন্দুকের শব্দ!

অমলবাবু ও মানিকের সচকিত দৃষ্টি পরস্পরের মুখের দিকে ফিরল!

মানিক ত্রস্ত স্বরে বললে, 'শব্দগুলো এল বাংলোর দিক থেকে!' বলেই সে বেগে ডাকবাংলোর দিকে ছুটে চলল—তার পিছনে অমলবাবু!

বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেই দেখা গেল, সুন্দরবাবু খুব ব্যস্ত ভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

মানিক তাড়াতাড়ি শুধোলে, 'এখানে বন্দুক ছুড়লে কে? আর্তনাদ করলে কে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমিও তোমাদের ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই?'

—'জয়ন্ত কোথায়?'

—'সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল!'

মানিক চিৎকার করে ডাকলে, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি ওইদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাবু আপনি ওইদিকে যান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেখছি!'

তিনজনে তিন দিকে ছুটল। সন্ধ্যা তখনও মানুষের চোখ অন্ধ করবার মতো অন্ধকার সৃষ্টি করেনি—শেষ পাখির দল তখনও বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছে না, নীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল তরুপল্লবের দীর্ঘশ্বাস!

হঠাৎ সুন্দরবাবুর ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'মানিক! অমলবাবু! এইদিকে এইদিকে!'

মানিক সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপি!

'কী সুন্দরবাবু, ডাকলেন কেন?'

'হুম, এ কী কাণ্ড। জয়ন্তের টুপি এখানে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?'

ততক্ষণে অমলবাবুও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে এত রক্ত কেন?'

মানিক উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল। আড়ষ্ট চোখে দেখলে, সেখানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, 'এ কার রক্ত?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?'

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললেন, 'মহাকালের অভিশাপ! মানিক তোমার নাস্তিকতার ফল দ্যাখো!'

পাথরের সিনেমা*

আরও অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়ন্তের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবাবুর দারোয়ান হাতি সিং ও দলের অন্যান্য চাকর-বাকররাও এসে পড়েছে।

সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অন্ধকার সেখানে গাঢ় হতে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্রলের লণ্ঠনের প্রখর আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল ঠেঙিয়েও শত্রু বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'হায় হায়, মগের মুল্লুকে এসে জয়ন্ত শেষটা প্রাণ হারাল!'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, 'আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়ন্ত হয়তো এখনই ফিরে আসবে!'

*ওঙ্কারধাম সম্বন্ধে এ উপন্যাসে যা বলা হয়েছে তা লেখকের কপোলকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। ইতি লেখক।

অমলবাবু বললেন, 'আমার তা মনে হয় না। দু-দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল কেন? ওখানে রক্তে মাটি ভিজে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আর ওখানে জয়ন্তের টুপিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন?'

মানিক বললে, 'দেখা যাক, জয়ন্তের পদ্ধতিতেই কোনও রহস্য আবিষ্কার করা যায় কি না!'

যেখানে টুপিটা পড়ে ছিল সেইখানে গিয়ে সে আগে টুপিটা তুলে নিলে।

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপির দুদিকে দুটো ফুটো—বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপির ভিতরেও রক্তের দাগ! সেখানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মানিক নিরাশ কণ্ঠে বললে, 'আর কিছু পরীক্ষা করা মিছে! জয়ন্তের মাথায় লেগেছে শত্রুর গুলি।'

অমলবাবু বললেন, 'তাহলে গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু কি পালিয়ে গিয়েছেন?'

—'জয়ন্তের মতন সাহসী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে বলে মনে হয় না।'

অমলবাবু বললেন, 'দশজন সশস্ত্র লোক একজনকে যখন হঠাৎ আক্রমণ করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না বলে নির্বোধ আর গোঁয়ার বলাই উচিত। জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই এ-শ্রেণির লোক নন।'

—'সে কথা সত্যি। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে সে ফিরে আসত।'

—'এখানে জয়ন্তবাবুও নেই, শত্রুরাও নেই। যদি তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে?'

—'অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়ন্তকে ধরেও শত্রুরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না। কারণ সেই সোনার চাকতিখানা তার কাছে আছে বটে, কিন্তু চাবিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়ন্তের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে দুটো জিনিস চুরি যাবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখানে রয়েছে জয়ন্তের রক্তমাখা টুপি, মাটির উপরেও রক্তের দাগ! কিন্তু ওখানে অত দূরেও মাটির উপরে রক্তের ঢেউ বইছে! আমার কী ভয় হচ্ছে জানো মানিক?'

—'কী ভয় হচ্ছে?'

—'আমরা দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি। ধরো, জয়ন্ত জানতে পারবার আগেই শত্রুর প্রথম গুলিতে আহত হয়ে এইখানে পড়ে যায় আর তার টুপিটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু আহত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ওইদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম। সে যখন ওইখানে গিয়ে পৌঁছেছে তখন শত্রুদের দ্বিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়—ভগবান না করুন—মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত বেশি রক্ত বেরুলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুলিশে কাজ করে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! মানিক, খুব সম্ভব আমাদের বন্ধু আর বেঁচে নেই!'

গভীর দুঃখে সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখ দুটি ছলছল করতে লাগল!

অমলবাবু আকুলকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবুর দেহ কোথায় গেল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লুকোবার জন্যে শত্রুরা জয়ন্তের দেহ সরিয়ে ফেলেছে।'

ওঙ্কারধামের মন্দির-চূড়াকে তখন রহস্যময় আকাশের বিরাট পটে কালি দিয়ে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে এবং জঙ্গলের বোবা অন্ধকারের মুখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈশ জীবদের নানারকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস।

মানিক খানিকক্ষণ স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে থেকে হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠল, 'প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আমারও ওই কথা! এখন আর পদ্মরাগ বুদ্ধের খোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়ন্তের হত্যাকারীদের!'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু কোথায় তারা?'

মানিক বললে, 'অমলবাবু, যে ভাঙা মন্দিরের ভিতর থেকে আপনি বুদ্ধমূর্তিটা এনেছিলেন, সেখানে যাবার পথ আপনার মনে আছে তো?'

—'নিশ্চয়ই আছে!'

—তাহলে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে এখনই চলুন সেইদিকে!'

—'তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হবে না?'

—'অমলবাবু, হত্যাকারীরা যদিও চাবিটা পায়নি, কিন্তু চাকতির নকশা তো পেয়েছে! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ওইদিকে গেলেই তাদের খোঁজ পাব।'

—'কিন্তু আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলুম তখন চ্যান আর ইনকে তো সঙ্গে নিয়ে যাইনি, মন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।'

—'এটা আপনার ভুল বিশ্বাস। পদ্মরাগ বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তো তারা আপনার আগে থাকতেই জানত—জানত না কেবল পদ্মরাগ বুদ্ধের ঠিকানা। নকশা পেয়ে তারা এখন সদলবলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিকের কথাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। চলো, চলো,—আর দেরি করা নয়, যত দেরি করব শত্রুরা ততই এগিয়ে যাবে! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-দুঃখের কথা! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভস্ম কিছু পুরে আমাদের এখনই যাত্রা করতে হবে!'

সবাই যখন শত্রুদের সন্ধানে যাত্রা শুরু করলে, আকাশে তখন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে!

ডাকবাংলোর ছাদে একটা প্যাঁচা বসেছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে শূন্যে ঝটপট ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম—পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই প্যাঁচার ডাক! দুর্গা, দুর্গা!'

মানিক দুঃখিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তকে যখন হারিয়েছি, তুচ্ছ প্যাঁচার ডাকে আমাদের আর কী অনিষ্ট হবে সুন্দরবাবু?'

—'যা বলেছ মানিক! জয়ন্ত যে আমাদের কতখানি ছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাবিকহীন জাহাজের মতো! কপালে এও ছিল—হুম!'

এবারে আর ঝাপসা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছটা পিছনে রেখে ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়া অন্ধকারে গড়া পঞ্চস্তম্ভের মতো মহাশূন্যের বুক বিদীর্ণ করছে! এখন তাকে কী অবাস্তবই দেখাচ্ছে!

অতীতের একটা বিলুপ্ত জাতির সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওঙ্কারধাম। তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে—তারই উপর দিয়ে লণ্ঠনের আলোতে চলন্ত ও সুদীর্ঘ কৃষ্ণছায়ার সৃষ্টি করে হেঁটে যাচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হেঁটে বা রথে বা গজপৃষ্ঠে বা অশ্বারোহণে বীরদর্পে ধনুক-বর্শা-তরবারি হাতে করে দলে দলে হাজার হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতের

ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগোত্র এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ বলেই মনে হয়!

দূর-গ্রামে কাদের সব দামামা বাজছে এবং তাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওঙ্কারধামের গগনস্পর্শ শিখরে প্রতিহত হয়ে।

সকলে তখন একটি পাথরে গড়া প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল!

অমলবাবু যেন আপন মনেই বললেন, 'রাজা ইন্দ্রবর্মণের পুত্র যশোবর্মণ ছিলেন একজন মহামানুষ! তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীর্যও ছিল অসাধারণ! তিনি নাকি নিরস্ত্র হয়েও খালি হাতে হস্তী ও ব্যাঘ্র সংহার করেছিলেন!

তাঁর কীর্তিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র এগারো বৎসরের ভিতরেই এখানকার বিরাট নগর গড়ে সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব বলেই মনে হয়!

আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্মণ যে বীরত্ব আর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অমানুষিক বললেও চলে।

ওঙ্কারধামের বয়স তখন পুরো এক বৎসরও হয়নি। ভারত রাহু সম্বুদ্ধি নামে এক রাজা বিদ্রোহী হয়ে হঠাৎ একরাত্রে সসৈন্যে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন।

প্রসাদের বাহিরে যেসব প্রহরী ছিল তারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীরা সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল পঙ্গপালের মতো দলে দলে। ভিতরের প্রহরীরা প্রাণভয়ে কে কোথায় সরে পড়ল তার কোনও সন্ধানই মিলল না!

বিদ্রোহীদের জয়ধ্বনিতে মহারাজ যশোবর্মণের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে রইল দুইজন মাত্র সাহসী যোদ্ধা।

বিদ্রোহীরা দলে খুব ভারী ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই-তিনজনের বেশি লোকের পক্ষে সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না।

মহারাজ যশোবর্মণ বিপুল বপু নিয়ে সেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে উন্মত্তের মতো অসিচালনা করতে লাগলেন—বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলাগাছের মতো মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ছে।

যশোবর্মণের দুই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহারাজের সতর্ক তরবারি এড়িয়ে তবু কেউ ভিতরে ঢুকতে পারলে না।

বিদ্রোহীদের নেতা ভারত রাহু তখন মহাবিক্রমে যশোবর্মণকে আক্রমণ করলেন—দুই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার পরস্পরের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে লাগল।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, বিদ্রোহী ভারত রাহুর মৃতদেহের উপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে, শূন্যে রক্তাক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে মহারাজ যশোবর্মণ সিংহনাদ করছেন! বাকি বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!'

হাতি সিং ও আর চারজন অনুচর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে; এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে দূরে সরে সরে যাচ্ছে ছায়াময় অন্ধকার।

সে আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট সব দানবের প্রস্তরমূর্তি বহুমুণ্ড সর্পদের ধরে পাশাপাশি বসে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোনও কোনও দানব শতাব্দী ধরে প্রকাণ্ড শিলাসর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন শ্রান্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে পড়ে গেছে!

অমলবাবু বললেন, 'আগে এমনি পাঁচশো চল্লিশটি দানব এখানকার পাঁচটি সিংহদ্বারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। এখানে কোথাও ক্ষুদ্রতা কি অপ্রাচুর্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওঙ্কারধামের প্রধান মন্দির-চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের চেয়ে তা দুগুণ বেশি উঁচু! আর তার অন্য চারটি শিখরও বড়ো কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়শো ফুট করে! আর চারিদিক ঘিরে ওই যে খাল চলে গেছে, তাও চওড়ায় দুশো ত্রিশ ফুট!'

সর্পমূর্তি চোখে পড়ে চতুর্দিকেই।

এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওঙ্কারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওঙ্কারধামের প্রথম রাজা কুম্ভ বিবাহ করেছিলেন নাগরাজের কন্যাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজ্যেরই অংশবিশেষ।

যেখানেই ভারত-শিল্পীর বাটালি পড়েছে সেখানেই জন্মলাভ করেছে অসংখ্য হাতির মূর্তি।

এখানেও তাই। সর্বত্রই এত হাতি যে দেখলে অবাক হতে হয় এবং অধিকাংশ মূর্তিই জীবন্ত হাতির মতোই মস্ত বড়ো! এমন বৃহৎ সব মূর্তি এত অজস্র পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়!

কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জানত না—তাদের ধৈর্যের পরমায়ু ছিল অক্ষয়!

যেন তারা জন্মজন্মান্তর ধরে মূর্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না! এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলেমাটির মতো! তাদের হাতের মায়া-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-নুঁয়ে-দুমড়ে অতি সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামতো যে-কোনও আকার ধারণ করতে বাধ্য হত! এ বিষয়ে ভারত-শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই ম্লান হয়ে যাবে!

দেয়ালের গায়ে গায়ে পাথরের খোদা ছবিই বা কত!

সেই ছবির পর ছবির সারি মাপলে নিশ্চয়ই এক মাইলের কম হবে না! কোথাও মত্ত হস্তীরা ধেয়ে চলেছে, কোথাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামায়ণের দৃশ্যের পর দৃশ্য, কোথাও গভীর অরণ্যে বন্য জন্তুরা বিচরণ করছে, কোথাও সাগরে সামুদ্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রন্ধনশালায় রান্না হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিসের বিকিকিনি চলছে, বাজিকররা হরেক রকম খেল দেখাচ্ছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘোড়ায় চড়ে পোলোর মতন কী এক খেলায় নিযুক্ত হয়ে আছেন!

রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, সুয়োরানি-দুয়োরানি, সখীর দল, বাঁদি ও তীর্থযাত্রী—কিছুরই অভাব নেই! দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচকাওয়াজ শোভাযাত্রা, উৎসব, পূজা, নাচ, ঘর-সংসার,—শিল্পীর বাটালি কোনও কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি!

মহাকালের অদৃশ্য হস্ত কত শতাব্দীর রহস্যময় যবনিকা হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এসে বিংশ শতাব্দী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত সুখ-দুঃখমাখা বিচিত্র জীবনযাত্রার চিত্র।

প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয়, এই মুহূর্ত-পূর্বেও এরা সবাই জীবন্ত গতির লীলায় চঞ্চল হয়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরাভিনয় করছিল, বর্তমানের ক্ষুদ্র মানুষদের পদশব্দ পেয়ে এখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে আচম্বিতে!

আসলে কিন্তু সমস্তই অতীত!

যোদ্ধাদের ধনুকগুলো নুয়ে আছে, কিন্তু তির আর ছুটবে না! মায়ের কোলে শুয়ে পাথুরে শিশুরা স্তন্যপান করছে, কিন্তু তারা আর বালক বা যুবক হতে পারবে না! শিলাহস্তীর দল তাদের যেসব পা শূন্যে তুলেছে, সেগুলো আর কখনও মাটিতে পড়বে না! সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, সেই বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে তাদের আর কোনও দিন দেখা হবে না, রাজসভার মধ্যে সিংহাসনের উপরে ছত্রের তলায় মহারাজ বসেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়ষ্ট, সবাই চির-বোবা!

আরও কত যুগ আসবে, আবার চলে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির লুপ্ত সভ্যতার এই কালজয়ী স্মৃতি তখনও এমনি স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়েই এখানে বিরাজ করবে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গল্পের ছবিই এখানে রয়েছে!'

অমলবাবু বললেন,—'সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়তে জানত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্ত বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসের ছবি খুদে রাখতেন। নিরক্ষর লোকরাও সেগুলো দেখে শিক্ষালাভ করত।'

মানিকও এই শিলাময় নূতন জগতে এসে বিস্মিত হয়েছিল, কারণ ভারত-শিল্পীর এই নূতন স্বদেশে এসে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারে কে? কিন্তু সে বিস্ময় তাকে বেশিক্ষণ অভিভূত করে রাখতে পারেনি। তার মাথায় ঘুরছে কেবল জয়ন্তের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা হা করে উঠছে!

অমলবাবুর কোনও উক্তিই ভালো করে তার কানে ঢুকছিল না, শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকের শিল্পকাজের দিকে তাকাতে তাকাতে সে হনহন করে এগিয়ে চলল,—লণ্ঠনের আলোক-রেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে পড়ে রইল, সে-খেয়ালও তার রইল না!

এক-জায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কেবল চাঁদের আধ-ফোটা আলোতে চারিদিক থমথম করছে।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মস্ত মস্ত পাথরের হাতির পর হাতি সার গেঁথে কোথায় কতদূরে নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নেই!

হঠাৎ তার হুঁশ হল, এর পরে কোন দিকে যেতে হবে তা সে জানে না এবং ভুল পথে গেলে সঙ্গীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মানিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তখন যেন তন্দ্রাময়। খানিক তফাতে অরণ্যের কালিমাময় বুকের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রিদানবীর ফিসফিস কানাকানি! জীবন্ত জগতের আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা আচম্বিতে, আর যেন চুপ করে থাকতে না পেরে, পাগল হয়ে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

চমকে উঠে মানিক ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো!

পিছনে অনেক লোকের গোলমাল!

আবার দুবার বন্দুকের শব্দ, তারপরেই দূর থেকে সুন্দরবাবুর চিৎকার শোনা গেল—'মানিক! মানিক!'

মানিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাৎ একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোনও কিছু বোঝবার আগেই বিষম এক ধাক্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল!

তারপরেই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং দুখানা বড়ো বড়ো চ্যাটালো হাতে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরল!

সেই অজ্ঞাত শত্রুকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মানিক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধের আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মানিক তা জানে না, কিন্তু চোখ মেলে দেখলে সুন্দরবাবু ও অমলবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের দুইপাশে বসে আছেন এবং হাতি সিং বসে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে।

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না।

কিন্তু সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অমলবাবু বলে উঠলেন, 'না, না, আপনি আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকুন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শত্রুদের তাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু?'

তখন মানিকের সব স্মরণ হল এবং তার কণ্ঠদেশ যে বেদনায় টনটন করছে এটাও অনুভব করতে পারলে।

সে বললে, 'সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারুকে দেখতে পাননি?'

—'হুম, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা টিকটিকির ল্যাজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। পেয়েছি কি অমলবাবু?'

—'না।'

মানিক বললে, 'আমার গলায় ভয়ানক ব্যথা! সুন্দরবাবু, এটাও কি স্বপ্ন দেখার ফল?'

—'কই দেখি! তাই তো হে মানিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলো আঙুলের লাল লাল দাগ রয়েছে! কে তোমার গলা টিপে ধরেছিল? কেন ধরেছিল? সে ব্যাটা গেল কোথায়?'

অমলবাবু বললেন, 'ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করারও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না।'

—'আপনাদের কে আক্রমণ করেছিল?'

—'অনেকগুলো লোক। আক্রমণ করেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে

আসেনি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার-পাঁচজন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হল! মিনিটখানেক পরে পথের আর একদিকে আবার চার-পাঁচজন লোকের আবির্ভাব, আবার আমাদের বন্দুক ছোড়া—আবার তাদের অন্তর্ধান!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মনে হল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না, কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়!'

মানিক ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতর দিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কী যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্বস্ত ভাবে বললে, 'নাঃ, ঠিক আছে!'

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'কী ঠিক আছে, মানিক?'

'সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা সেলাই করে দিয়েছি। শত্রুরা কোনও গতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জন্যেই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল।'

অমলবাবু বললেন, 'তার মানে?'

—'মানে খুব সহজ। আমি বোকার মতো এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে পড়েছিলুম। তখন একজন কি দুজন শত্রু অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অন্যমনস্ক রাখার জন্যে বাকি শত্রুরা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলছিল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে গলা টিপে অজ্ঞান করে ফেলেও তারা ওই চাবিটা নিয়ে গেল না কেন?'

—'এর একমাত্র কারণ হতে পারে, হয়তো চাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এসে পড়াতে তারা পালিয়ে যায়।'

—'খুব সম্ভব তাই।'

এমন সময়ে হাতি সিং জমির উপর থেকে কী একটা ছোটো চকচকে জিনিস তুলে নিয়ে মানিককে বললে, 'বাবুজি, আপনি উঠে বসতেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে পড়ে গেল!'

সেই জিনিসটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেল। সেটা আর কিছু নয়, সেই নকশা আঁকা সোনার চাকতি!

কী অদ্ভুত রহস্য।

চাকতি ছিল আগে হতভাগ্য জয়ন্তের কাছে, তারপর তাকে হত্যা করে শত্রুরা নিশ্চয়ই এই চাকতিখানাকে হস্তগত করেছিল, কিন্তু যে অমূল্যনিধির জন্যে এত খোঁজাখুঁজি, এত হানাহানি, এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিসটাই মানিকের বুকের উপরে অযাচিত ভাবে এসে পড়ল কেমন করে?

তাড়াতাড়ি চাকতিখানা নিয়ে লণ্ঠনের আলোতে ভালো করে পরীক্ষা করে মানিক হতবুদ্ধির মতো বললে, 'এ যে সেই চাকতি, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই! কিন্তু—কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি!'

খানিকক্ষণ সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'হয়তো মানিককে যে আক্রমণ করেছিল, ধস্তাধস্তির সময়ে চাকতিখানা তার অজান্তেই পড়ে গিয়েছে!'

মানিক বললে, 'আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড়ো আশ্চর্য?'

আচম্বিতে সুন্দরবাবু কী দেখে চমকে উঠলেন!

তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন তুলে ধরে জমির দিকে দৃষ্টিপাত করে বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম! এ আবার কী?'

মানিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেকখানি রক্ত পড়ে রয়েছে,—খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড়ো ছোরা বা ছোটো তরবারির মতো অস্ত্র এবং মানুষের হাতের সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন!

সুন্দরবাবু মানিকের দুই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'মানিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায়নি দেখছি! তবে এ বেওয়ারিস আঙুলের অর্থ কী?'

মানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ধরে আঙুলটা দেখে বললে, 'আঙুলটা কীরকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো! এ আঙুল যারই হোক, তাকে খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়!'

অমলবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'শত্রুদের দলে চ্যান আছে কি না জানি না, কিন্তু খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যানকেই আমার মনে পড়ে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ধরে নেওয়া যাক, চ্যান সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোনও রকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধরে নেওয়া যাক, চ্যানই গলা টিপে মানিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল বলি দিলে কে? মানিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি লড়াই করেছিলে?'

মানিক বললে, 'লড়াই করব কী, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাইনি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ওই ছোরাতেই আঙুলটার উচ্ছেদ হয়েছে! ওরকম দু-ধারে ধার দেওয়া ছোরা কখনও আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন? আমাকে বাঁচাবার জন্যেই সে যদি আমার শত্রুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে থাকে, তবে সে-ও পালিয়ে গেল কেন? তাকে তো আমরা বন্ধু বলে পরম সমাদর করতুম! আর এই অজানা মুল্লুকে বন্ধুই বা পাব কোত্থেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খসে পড়ে না!'

অমলবাবু বললেন, 'এক হতে পারে, পদ্মরাগ বুদ্ধের লোভে ওই সোনার চাকতিখানার জন্যে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করেছিল!'

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা! শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মানিককে বাঁচাবার জন্যে তাদের কারুরই মাথাব্যথা হতে পারে না! হুম, এসব হচ্ছে ডাহা ভূতুড়ে কাণ্ড। এ জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরোনো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মতো! এখানকার আনাচে কানাচে ভূতের আড্ডা আছে!'

মানিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, 'এ যদি ভূতুড়ে কাণ্ড হয় আমি তাহলে বলব, জয়ন্তের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে!'

সুন্দরবাবু তখনই টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অত্যন্ত ভালোবাসি কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাসার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না! ওঠো মানিক, উঠুন অমলবাবু!'

মানিক গাত্রোত্থান করে বললে, 'হ্যাঁ, এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। এই গভীর রহস্যের কিনারা না করেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'খালি ভূত নয়, এখানে চারিদিকে শত্রুরাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ করছে! তারা যে সাহস করে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার-চারটে বন্দুক। ...আরে গেল, এই হাতি সিং! তোমার নাম গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভুঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছ কেন? যদি ফস করে আওয়াজ হয়ে যায়? অমন করে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো!'

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল।

রাত পোয়াল, উষার সিঁথায় দিবস-বধূ সিঁদুর-লেখা লিখলে, মাঠ-বাটের উপর দিয়ে তপ্ত দুপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা করে গহন বনের ঠান্ডা বুকের ভিতরে গিয়ে নিসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্যচিতার রক্ত-শিখা জ্বলে উঠল, রাত্রি আবার তার অন্ধ কুঠুরির দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের পৃথিবী-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপরে চির-চলন্ত বৃহৎ জলসর্পের মতো নদী। তখন ওঠে নদী পার হবার সমস্যা।

মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিস্তার করে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। তখন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন বানরের দল গাছের নীচের ডাল থেকে মগডালে লাফ মেরে কিচিরমিচির ভাষায় কী বলে ওঠে এবং কৌতূহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধ করি আশ্চর্য হয়ে ভাবে—'এরা আবার কোন দেশি বানর? এদের ল্যাজ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে রাখে কী কতকগুলো সাদা সাদা জিনিস, দু-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন দেশি বানর?'

মাঝে মাঝে বাঁশবন দুলে দুলে ওঠে, মড়মড় করে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতির দল ওখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপ-ঝাপের উপর দিয়ে তীব্র একটা গতির রেখা সশব্দে চলে যায়—একটা চাপা গর্জনও শোন যায়, বনের মধ্যে অশান্তিকর অনাহুত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু দূরে সরে গেল!

মাঝে মাঝে মানুষের ঘৃণ্য পায়ের শব্দে লম্বা ঘাসের ভিতরে গোখরো সাপের ঘুম ভেঙে যায়, ফোঁস করে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে এবং পর মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়।...এবং সর্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যাদের দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাদের অশ্রান্ত অস্তিত্বের ধ্বনি!

কে যেন নিরালায় কানাকানি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিসফিস করে কথা বলছে; কে যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে পিছনে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে।

গভীর দূর বিস্তৃত নানা শব্দময় প্রত্যেক অরণ্যই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ!

কোনও অরণ্যই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বনবাসী কোনও জীবই মানুষকে বন্ধু বলে মনে করে না। কল্পনায় নির্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে।

পদে পদে বিপদের সম্ভাবনায় মানুষ চমকে ওঠে! বোধ হয়, প্রত্যেক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কণ্ঠ থেকে!

সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একটা প্রেতাত্মা বলে সন্দেহ হয়। সূর্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছদ্মবেশ পরাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে?—অরণ্যের মতো ভয়ঙ্কর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কানে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভীষিকাময় আনাগোনা! বিজন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকার সহনীয়!

আর-একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির পরে এল স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাত।

অমলবাবু বললেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সন্ধ্যার আগেই ভাঙা মন্দিরের কাছে পৌঁছোতে পারব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু শত্রুদের আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু তারা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, এটা সর্বদাই মনে রাখবেন। আমরা সশস্ত্র আর সাবধান বলেই তারা এখনও সামনে আসছে না।...কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি। কে যেন পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী আশ্চর্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ করে কেটে নিতুম!'

মানিক বললে, 'তার নাক নিয়ে আপনি কী করতেন, সুন্দরবাবু? যদিও আপনার নাকটি খ্যাঁদা, তবু তার নাক টিকলো হলেও আপনার অভাব তো দূর হত না?'

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'এরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! আমার নাক খ্যাঁদা? কে বললে তোমাকে? আমার নাক খ্যাঁদা নয়!'

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা মাইল খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল!

কেবল মাঠে নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট নদী এবং তার তীরে তীরে চরে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পাখি!

সুন্দরবাবু খুশি গলায় বলে উঠলেন, 'বনমুরগি! এসো মানিক, দেখা যাক ভগবান আজ আমাদের বনমুরগির মাংস খাওয়াতে পারেন কি না!'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, 'না সুন্দরবাবু! জয়ন্ত মুরগির মাংস খেতে ভালোবাসত! সে যখন নেই, আমার মুখে ওমাংস আজ আর রুচবে না!'

এদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে মুরগিগুলো তখনই উড়ে পালাল! সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে সেই উড়ন্ত, জ্যান্ত খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মানিক বললে, 'দেখুন সুন্দরবাবু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!'

—'হুম! সুবুদ্ধি, না কুবুদ্ধি?'

—'আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধি। ইচ্ছা করলে এখনই আমরা দেখতে পারি, শত্রুরা আমাদের পিছু পিছু আসছে কি না? সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি!'

—'কী করে শুনি?'

—'এই মাঠটা দেখছেন তো? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গভীর বন, ওপারেও গভীর বন! আমরা এখনই ওপারের বনে গিয়ে ঢুকব। তারপর না এগিয়ে ঝোপের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'খাসা মতলব এঁটেছ ভায়া! শত্রুরা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, তাহলে তাদেরও এই মাঠ পার হতে হবে। এখানে লুকোবার জায়গা নেই, তারা এলেই আমরা দেখতে পাব! তারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম গুড়ুম রবে গর্জন করে উঠবে,—কেমন, তাই নয় কি?'

—'ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!'

—'ওসব শত্রুকে হত্যা করলেও পাপ নেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরক্ষা করব না কেন? চলো, এখন তোমার কথা মতোই কাজ করা যাক!'

সকলে ওপারের বন লক্ষ্য করে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মানিক বললে, 'এখানে বেশির ভাগই বাঁশবন। গোটাকয়েক বটগাছও আছে। এদিকে বেতবন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আসুন, গা-ঢাকা দেওয়া যাক! একটু পরেই হয়তো চ্যান আর ইনের খবর পাওয়া যাবে!'

সকলে একে একে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হল।

সবজে মাঠ ধু ধু করছে।

ওদিককার বন-রেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্যলীলার দর্শক রূপে সূর্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর সোনা-হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে খেলতে লাগল।

গানের পাখিরাও নীরব হয়ে ছিল না।

হানা দেবালয়ের জীবন্ত পাথর

মানিকের অনুমানও ব্যর্থ হয়নি, তার ফন্দিও ব্যর্থ হল না!

মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হতে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোটো ছোটো!

সুন্দরবাবু দূরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে সোৎসাহে বললেন, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ! হুম, ব্যাটাদের দলে দশজন লোক আছে। ওরা হনহন করে এই দিকেই আসছে। হুঁহুঁ বাবা, ঘুঘুই দেখেছ ফাঁদ তো দ্যাখোনি! চলে আয়—চলে আয়, চই চই চই! ওরে বাপ রে। কী লম্বা! কী জোয়ান! যেন ঘটোৎকচের বাচ্ছা! ওর পাশে পাশে আসছে এক বেটা গুড়গুড়ে বেঁটেরাম সর্দার, পায়ে হেঁটে চলেছে, না ফুটবলের মতো মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে?'

—'কই, দেখি দেখি' বলে সাগ্রহে অমলবাবু দূরবিনটা সুন্দরবাবুর হাত থেকে প্রায় এক রকম কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোখে লাগিয়েই বলে উঠলেন, 'ওই তো চ্যান! ওই তো ইন! সাত ঘাটের জল ঘেঁটে এতদিন পরে স্বচক্ষে আবার প্রভুদের দেখা পেলুম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে ও পিশাচ! সুরেনবাবু আর জয়ন্তবাবু তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিস, আমাকেও বধ করতে এসেছিলি! অ্যাঁঃ! চ্যানের বাঁ হাতে যে ব্যান্ডেজ বাঁধা! তাহলে পরশু রাতে মানিকবাবুকেও ওরা মারতে এসেছিল! হাতি সিং, বন্দুক ছোড়ো! বন্দুক ছোড়ো! হতভাগাদের পাগলা কুকুরের মতো মেরে ফ্যালো!'

প্রভুর হুকুম পালন করবার জন্যে হাতি সিং তখনই বন্দুক তুললে, কিন্তু মানিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'বন্দুক নামাও হাতি সিং, আমি যখন বলব তখন ছুড়বে! অমলবাবু, আপনি বড়োই উত্তেজিত হয়েছেন, শান্ত হোন! ওদের আরও কাছে আসতে দিন!'

অমলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'উত্তেজিত হব না—বলেন কী? যমদূতদের দেখলে কি শান্ত হয়ে থাকা যায়?'

সুন্দরবাবু প্রমাদ গুণে বললেন, 'অমলবাবুই সব পণ্ড করবেন দেখছি। অত চ্যাঁচালে ওরা কি আর কাছে আসবে?'

তখন অমলবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মাপ করুন, আর আমি কথা কইব না!'

ততক্ষণে মাঠের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

তারা সবাই হয় বর্মি, নয় শ্যামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চ্যানের অসম্ভব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ! এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কাটা আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল!

মানিক বললে, 'আসুন, এইবারে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। পায়ের দিকে গুলি করে ওদের অকর্মণ্য করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, নরহত্যায় দরকার নেই—কী বলেন সুন্দরবাবু?'

—'বেশ, তাই সই।'

এইবারে শত্রুরা বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করেনি, এইবারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক!'

মানিক বললে, 'এইবারে আমাদের চারটে বন্দুক গর্জন করতে পারে,—ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি!'

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি-উদ্গার করলে,—সঙ্গে সঙ্গে মাঠের উপরে সর্বপ্রথমে ধরাশায়ী হল ইনের বাঁটকুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্তনাদ করে যে দিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌড়োতে আরম্ভ করলে!

এদিক থেকে দ্বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হল।

এবারে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মতো মাঠের নানাদিকে ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়েও আবার কোনও রকমে উঠে ভোঁ-দৌড় মারলে!

কিন্তু দৌড়োতে পারছিল না কেবল ইন, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কোনও রকমে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল!

তার দুর্দশা দেখে চ্যান আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকে সে ঠিক শিশুর দেহের মতোই নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়োতে আরম্ভ করলে!

অমলবাবু চ্যানকে টিপ করে বন্দুক ছুড়লেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরও দু-একবার গুলিবৃষ্টির পর মানিক বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে, টোটা নষ্ট করে লাভ নেই! ওরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে, আবার বনবাদাড় ভেঙে একসঙ্গে মিলতে ওদের অনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ আর ওরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে বলে মনে হয় না।'

সুন্দরবাবু মানিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাটারা যত বড়ো গুলিখোরই হোক, আবার গুলি খাবার জন্যে ওরা শীঘ্র ব্যস্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না—জয় মানিকের বুদ্ধির জয়!'

পথ চলতে চলতে মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা অমলবাবু, এই পদ্মরাগ বুদ্ধের কোনও ইতিহাস জানেন?'

অমলবাবু বললেন, 'ঠিক পদ্মরাগ বুদ্ধের ইতিহাস জানি না বটে, তবে ওঙ্কারধামের ইতিহাসে এরই মতো এক মরকত বুদ্ধের কথা শোনা যায়। ওঙ্কারধাম সাম্রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।*

মরকত বুদ্ধ নিয়ে তর্ক চলছে।

কেউ বলেন, এখন এই মূর্তি জাপানে আছে। কেউ বলেন, ফর্মোজা দ্বীপে আছে; কেউ বলেন, জাভায় আছে।

ওঙ্কারধামের পতন হয়, শ্যামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তাদের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরের মন্দিরে যে সবুজাভ পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্তি আছে, সেইটিই হচ্ছে প্রবাদপ্রসিদ্ধ মরকত বুদ্ধ।

কেবল মরকত বুদ্ধ নয়, ওঙ্কারধামে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল।

ওঙ্কারধামের বাসিন্দারা থেইস নামে একটি জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। এই থেইসরা বাস করত বর্তমান শ্যামদেশে। এখনও যারা ওখানে বাস করে তারা ওই থেইসদেরই বংশধর। বারংবার পরাজয়ের পর থেইসরা অবশেষে বিশেষ আয়োজন করে ওঙ্কারধামকে হঠাৎ আক্রমণ করে।

একটা বড়ো যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। জনৈক ভগ্নদূত সেই খবর নিয়ে ফিরে এল। ওঙ্কারধামের সেনাপতি বললেন, 'তোমার খবর মিথ্যা হলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আর তোমার খবর সত্য হলেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে। কারণ সবাই যখন বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছ!'

ভগ্নদূতের প্রাণদণ্ড হল, কিন্তু ওঙ্কারধাম রক্ষা পেল না। পুরোহিতেরা নগর রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত বুদ্ধ, স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ, অন্য অন্য মূল্যবান বিগ্রহ আর রাশি রাশি হিরে-মণি-মুক্তা তখনই সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন।

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, বিজয়ী থেইসরা সেসব গুপ্তধন খুঁজে পায়নি।

ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের এই পদ্মরাগ বুদ্ধ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কি না, কে তা বলতে পারে?'

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, সূর্যালোক তখন অরণ্যের মাথার উপরে গিয়ে উঠেছে।

দিনের আলোয় চতুর্দিক সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু এমন নির্জন ও নিস্তব্ধ যে, রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা চলে!

আরও মাইলখানেক পথ পেরিয়ে অমলবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওই সেই সপ্ত-তালগাছ!'

---

*'And in Yasodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but the faithful may look upon it.'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সপ্ত-তালগাছ আবার কী?'

—'ওই হচ্ছে আমাদের পথের শেষ নিশানা। পাশাপাশি ওই যে সাতটা তালগাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙা মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বর—অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!'

কিন্তু পথের শেষে এসে মানিকের মনে জয়ন্তের শোক আরও বেশি করে জেগে উঠল।

জয়ন্তের জন্যেই এদেশে আসা, পদ্মরাগ বুদ্ধের জন্যে তার আগ্রহ ছিল অফুরন্ত। জয়ন্ত নেই, তবু যে সে এখানে এসেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যে!

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে অমলবাবুর হাতে পদ্মরাগ বুদ্ধকে সমর্পণ করে সে সর্বাগ্রে চ্যান আর ইনকে গ্রেপ্তার করবে। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বদেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না!

তারা সপ্ত-তালের তলায় এসে দাঁড়াল।

তারপর একটা বাঁশবনের প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ।

সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে বাঁধানো একটি প্রকাণ্ড চত্বর! এবং চত্বরের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর এক কোণ দিয়ে যে রাস্তাটি পশ্চিম মুখে চলে গিয়েছে, তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরের মন্দিরের কতক অংশ! মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল, সুন্দরবাবু বললেন, 'এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হুম, বার করো তো মানিক, তোমার সেই সোনার চাকতিখানা!'

মানিক পকেট থেকে চাকতি বার করে সুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে বললে, 'আপনিই তাহলে নকশার পাঠোদ্ধার করে আমাদের বাহবা লাভ করুন!'

সুন্দরবাবু অবহেলা ভরে বললেন, 'পুলিশে চাকরি নিয়ে ঢের ঢের হেঁয়ালি জলের মতো পড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্য নকশা মাত্র! হুম! নকশায় এই তো রয়েছে পুকুরটা, চারিদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিন কোনা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুকুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখছি না!'

মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'ও কী সুন্দরবাবু, এরই মধ্যে মাথা চুলকোচ্ছেন কেন?'

—'মাথা চুলকোচ্ছি কি সাধে? এ নকশাখানা কেউ ঠাট্টা করে আঁকেনি তো?'

—'বোধ হয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাকতে থাকতে আগে মন্দিরের ভেতর চলুন! সেখানে গেলে হয়তো কোনও হদিস পাওয়া যাবে!'

—'ঠিক বলেছ। তাই চলো।'

দিনের আলো তখন নিবুনিবু হবার সময় হয়েছে।

পাখিরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে শুরু করেছে। সূর্যের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না—যদিও অন্ধকারের ঘুম এখনও ভাঙেনি।

মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে।

দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ মন্দিরটা অন্তত একশো ফুটের কম উঁচু ছিল না।

মন্দিরের আগাগোড়া কারুকার্যে আর ছোটো বড়ো মূর্তিতে ভরা।

কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দয়তায়। বড়ো মন্দিরের চারপাশে যে চারিটি ছোটো মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে

যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই ধ্বংসের লীলা স্তম্ভিত হয়ে আছে মৃত্যুস্তব্ধতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হাহা করে, চোখে বিষণ্ণতা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল।

মন্দিরের ভিতরে তখন আলো-আঁধারের খেলা আরম্ভ হয়েছে সহজে দূরের জিনিস স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙে পড়েছে বলে উপরপানে তাকিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমের আরক্ত রাগে রঞ্জিত নীলাকাশকে।

মন্দিরগর্ভ খুব প্রশস্ত, তার মধ্যে বড়ো বড়ো অনেকগুলো হলঘরের ঠাঁই হতে পারে।

ভিতরের চারিকোণে চারিটি মানুষের চেয়েও ডবল বড়ো 'অবলোকিতেশ্বর' বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি। একটি মূর্তি কতকটা অটুট আছে, বাকি মূর্তি তিনটির কারুর দেহের উপরিভাগ নেই, কারুর পদযুগল নেই, কারুর মুণ্ড নেই। দেওয়ালেও খোদিত ভাস্কর্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভালো করে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে সামনে প্রকাণ্ড একটি মূর্তিশূন্য বেদি রয়েছে কালো পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমলবাবু বললেন, 'ওরই উপরে আমরা সেই ছোট্ট বুদ্ধমূর্তিটি পেয়েছিলুম।'

মানিক একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'অতটুকু একটি মূর্তির জন্যে এত বড়ো একটা মন্দিরের এত বড়ো কালো পাথরের বেদি গড়া হয়েছিল! সে মূর্তি কখনও এমন মন্দিরের প্রধান দেবতা হতে পারে না!'

অমলবাবু বললেন, 'আমারও সেই সন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মূর্তিগুলিই যখন এমন প্রকাণ্ড! আমার বিশ্বাস, বেদির উপর থেকে প্রধান মূর্তিটিকে হয়তো কোনও কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে পূজার বেদিতে দেবতার অভাব কতকটা দূর করবার জন্যে কোনও ভক্ত এই মূর্তিটিকে স্থাপন করেছিল!'

—'খুব সম্ভব, তাই।'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ নির্বাক ও হতভম্বের মতো নকশার সঙ্গে বেদিটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

অমলবাবু তাঁর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, 'কী সুন্দরবাবু নকশা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো? আমিও পারিনি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এ হচ্ছে একখানা বাজে নকশা! কোনও ধাপ্পাবাজের আঁকা! আমরা সবাই হচ্ছি মহা হাঁদাগঙ্গারাম, একটুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্তায় ছুটে এসেছি! পদ্মরাগ বুদ্ধ! সোনার পাথরবাটি! যা নয় তাই!'

মানিক চাকতিখানা সুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগর্ভে অন্ধকার তখন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

সেই মহা নির্জনতার স্বদেশে, সেই মান্ধাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন স্তব্ধতা যেন ঘনায়মান ও হিংস্র অন্ধকারের মূর্তি ধরে সকলের প্রাণ-মনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল!

উপর দিকে হঠাৎ ঝটপট ঝটপট শব্দ হল—নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝখানে সেই শব্দগুলোকে শোনাল যেন বন্দুকের আওয়াজের মতো!

চমকে এবং দোদুল ভুঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে সুন্দরবাবু সভয়ে ঊর্ধ্বমুখে দেখলেন, ভাঙা

মন্দিরের ফাঁকে তখনও উজ্জ্বল আকাশপটে কালো কালো চলন্ত দাগ কেটে কী কতকগুলো উড়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, 'বাদুড়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না, অন্ধকারের কালো বাচ্ছা!'

মানিক নিজের মনেই বললে, 'নকশায় বেদির গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় সিঁড়ি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'প্রতিধ্বনিও বলবে—কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়িফিড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল, জয়ন্তবেচারা বেঘোরে প্রাণ দিলে, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই চলো মানিক।'

—'পালাব, কেন?'

—'এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বুক ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে! হুম, আমার বুক অকারণে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে না। এটা নিশ্চয়ই হানা মন্দির!'

মানিক হেসে উঠল—তার হাস্যধ্বনি মন্দিরের অন্ধকার ভরা কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনাল ঠিক অন্ধকারের হাসির মতো!

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি হেসো না মানিক। এমন অস্বাভাবিক স্তব্ধতা তুমি কখনও অনুভব করেছ? এক মাইল দূরে একটা আলপিন পড়লেও যেন শোনা যায়! এ স্তব্ধতা যেন নিরেট, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়! এ স্তব্ধতা যেন ওজনে ভারী—বুকে জাঁতাকলের মতো চেপে বসে! এ যেন স্তব্ধতার মহাসাগর,—আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তব্ধতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে!'

মানিক কোনও কথায় কান না পেতে মন্দিরের বেদির উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, 'অমলবাবু, এ বেদির গায়ে কখনও যে কোনও সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখছি না! অথচ নকশায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে! এর মানে কী?'

—'আমার বোধ হয় এ নকশাখানা অন্য কোনও জায়গার!'

—'অসম্ভব! নকশার সঙ্গে এখানকার বাকি সমস্তই হুবহু মিলে যাচ্ছে! এই সিঁড়ির হয়তো কোনও গুপ্ত অর্থ আছে।'

—'থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কেউ তা জানি না। সুতরাং আমাদের পক্ষে ও-গুপ্তঅর্থ থাকা না থাকা দুই-ই সমান।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, 'মানিক, মানিক! কে যেন এখানে চাপা হাসি হাসছে!'

মানিক বললে, 'কই?'

—'হাসি আবার থেমে গেল!'

—'ও আপনার মনের ভুল। আমি কোনও হাসি শুনিনি।'

—'অমলবাবু, আপনিও শোনেননি?'

—'না। কে আবার হাসবে, এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।'

—'হুম, শুনিনি বললেই হল? আমি স্পষ্ট শুনেছি! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পারলে না!'

—'তাহলে আপনার পিছনে ওই যে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয়! আপনার ভয় দেখে উনিই হেসে ফেলেছেন!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে এসে ফিরে তাকালেন।

আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া মেখে প্রকাণ্ড 'অবলোকিতেশ্বর' দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রস্তর-চক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি যেন সুন্দরবাবুর মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওষ্ঠাধর স্নিগ্ধহাস্যে বিকশিত!

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত আড়ষ্ট চোখে দেখলেন, আচম্বিতে বুদ্ধমূর্তি জ্যান্ত হয়ে টলমলিয়ে নড়ে উঠল!

'হুম, বাপ!' বলে সুন্দরবাবু সুদীর্ঘ এক লাফ মেরে একেবারে মানিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন!

অমলবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'বুদ্ধদেব নড়ে উঠেছেন মানিক! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!'

মানিক বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে দেখলে, মূর্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই রয়েছে! সে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, 'আপনারা দুজনেই পাগল হলেন নাকি?'

সুন্দরবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'পাগল এখনও হইনি মানিক, কিন্তু পাগল হতে আর বেশি বিলম্ব নেই! পাথরের মূর্তি হাসে, পাথরের মূর্তি নড়ে, এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে?'

মানিক এগিয়ে বুদ্ধমূর্তির গায়ে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন, আমি মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি! একেবারে জড় পাথর, এর মধ্যে কোনও প্রাণ নেই!'

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্তি একখানা জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে সবলে মানিকের হাত চেপে ধরলে!

আকস্মিক আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে মানিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'সুন্দরবাবু! অমলবাবু।'

নূতন বিপদ

যদিও দূর থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবু সাহসী মানিককে অমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠতে দেখে সুন্দরবাবু তখনই বুঝে নিলেন যে, ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে কোনও ঘটনা ঘটেছে! মানিককে সাহায্য করবেন কী, তিনি নিজেই প্রায় মূর্ছিত হয়ে সেইখানে বসে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্যন্ত রইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথৈবচ!

মানিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতখানা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না!

যে-হাতখানা এমন বজ্রমুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে, তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের হাত!

মানিক তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা টেনে বার করে ফেললে!

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপরিচিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল, 'মানিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতখানা কেটে ফেলতে চাও?'

বিষম বিস্ময়ে মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জয়ন্ত!'

—'হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ন্তই—আপাতত যমালয়ের ফেরতা মানুষ।'

বলতে বলতে বুদ্ধমূর্তির পিছন থেকে সশরীরে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্যমুখে জয়ন্ত!

অমলবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন। এ যে জয়ন্তের প্রেতাত্মা সে সম্বন্ধে সুন্দরবাবুর কোনওই

সন্দেহ রইল না! তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ মুখে দুই হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব!

মানিক বিস্ময়ে আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'জয়! জয়! তুমি! তুমি বেঁচে আছ!'

—'এক ভালো গণৎকার হাত দেখে বলেছিল, আমার পরমায়ু আশি বৎসর। অসময়ে মরিনি বলে বিস্মিত হচ্ছ কেন ভাই!'

—'কিন্তু তোমার সেই গুলিতে ছ্যাঁদা টুপি, জমির উপরে দু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অন্তর্ধান,—এসবের অর্থ কী!'

—'মানিক, এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি যে বাড়ল না, এ বড়ো দুর্ভাগ্যের কথা! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ছ্যাঁদা টুপি দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো! যেখানে আমার টুপিটা পড়ে ছিল, সেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে, তাহলে স্পষ্ট দেখতে যে আমি দু-পায়ে হেঁটে পাশের জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুকেছি! আর, যেখানে অনেকটা রক্ত ছিল, সেখানটা খুঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ সেখানে আমি একবারও যাইনি!'

—'তবে!'

—'আমি যখন বাংলোর দিকে ফিরছিলুম, তখন শত্রুরা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুড়ে আমি তাদের একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাদের বন্দুকের একটা গুলি আমার টুপি ভেদ করে মাথার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য মাটিতে আছড়ে পড়ে চির পুরাতন কৌশল অবলম্বন—অর্থাৎ মৃত্যুর ভান করলুম। তারপর দশ-এগারোজন লোক আমার কাছে ছুটে এল! আমার জামা হাতড়ে সেলাই করা পকেট কেটে সোনার চাকতিখানা বার করে নিলে। এমন সময় তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সঙ্গীকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমিও উঠে জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।'

—'কেন?'

—'আমি জানতুম, তোমরা এই মন্দিরের দিকে আসবেই, আর শত্রুরা তোমাদের পিছু নেবে—কারণ চাবি তারা পায়নি। স্থির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে পাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারে। তারা জানে আমি বেঁচে নেই। সুতরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার এ সুবিধা হত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবে কোন দিক থেকে!'

—'এতক্ষণে বুঝলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে!'

—'হ্যাঁ, ওঙ্কারধামে চ্যান যখন তোমার গলা টিপে ধরে, আমি ছুটে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তখন ছোরা বার করে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষতেই সে জমি আশ্রয় করলে—আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ হাতের একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোনার চাকতিখানা আমি আবার কেড়ে নি। চ্যান বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোনার চাকতি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখানা তোমার বুকের উপর রেখে আমিও অদৃশ্য হই! আমি জানতুম, তোমাদের দলের কেউ না কেউ সেখানা দেখতে পাবেই!'

—'কিন্তু জয়ন্ত, তমি কি অনাহারে আছ?'

—'মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়!......হ্যাঁ, ভালো কথা! এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শত্রুদের গতিরোধ করবার বুদ্ধি তোমাদের কার মাথায় প্রথমে আসে?'

—'প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন সুন্দরবাবু।'

—'বাহবা, চমৎকার! মানিক, তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও দ্রুতপদে এগিয়ে এই মন্দিরে এসে গা ঢাকা দিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'হুম, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?'

—'মোটেই ভয় দেখাইনি। আপনার ছেলেমানুষি ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে খেপে গেলেন!'

—'খামোকা খেপিনি। পাথরের বুদ্ধ জ্যান্ত হলে কে না—'

—'মূর্তিটাই নড়বড়ে। কতকালের পুরোনো ভাঙা মূর্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনি একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন না!'

—'না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই!'

—'সে কী, এখনই পালাবেন কোথায়? এখনও যে পদ্মরাগ বুদ্ধ লাভ হয়নি!'

—'হ্যাঃ! সে লাভের আশায় গয়া! সে নকশার কোনও মানে হয় না! এখন 'লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং' করেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে!'

—'সুন্দরবাবু, নকশার মানে আমি বুঝেছি বলেই কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি!'

অমলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'নকশার মানে বুঝেই আপনি এখানে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ অমলবাবু! কলকাতাতেই যখন আমি আপনার মুখে শুনলুম যে, নকশার সিঁড়ি আছে অথচ বেদির গা বয়ে কোনও সিঁড়ি আপনি দেখেননি, তখনই তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম! এখন দেখা যাক, আমার আন্দাজ ঠিক কি না!......(উচ্চস্বরে) ওহে হাতি সিং! তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এসো! বড়ো অন্ধকার, আগে আলোগুলো জ্বালো!'

হাতি সিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালা হল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কখনও উজ্জ্বল আলো দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেনি!

সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'আঃ, আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এল! এখন দেখছি বাইরেই অন্ধকার! হুম, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'বেদিটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মানিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহলে বেদিটা বুঝতে তোমার কোনওই কষ্ট হত না!...হাতি সিং! তোমার লোকজনদের কুড়ুল নিয়ে এই বেদিটা ভেঙে ফেলতে বলো!'

হাতি সিং-এর অনুচরেরা তখনই বেদি ধ্বংসে প্রবৃত্ত হল—অন্য সকলে বিপুল কৌতূহলে আগ্রহদীপ্ত চক্ষে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'পাথরের বেদি যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে!'

ঠং ঠঙা ঠং, ঠং ঠঙা ঠং—কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা, অতি নিস্তব্ধ মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গমগম করে উঠল!

শব্দের চোটে সেই নড়বড়ে বুদ্ধমূর্তি আবার কাঁপতে শুরু করেছে দেখে সুন্দরবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে!

বেদিটা গাঁথা ছিল কয়েকখানা বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে।

এক-একখানা পাথর সরানো হয় আর দেখা যায় বেদির তলা ফাঁকা, কিন্তু অন্ধকার ভরা গর্ভ ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠছে!

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, আর পাথর সরাতে হবে না! হাতি সিং, একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরো তো!'

হাতি সিং ভাঙা বেদির গর্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লণ্ঠন তুলে ধরলে!

উঁকি মেরে দেখা গেল, গর্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে!

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'এখন বুঝতে পারছ তো মানিক, যে রহস্য চোখে দেখা যায় না, সোনার চাকতির নকশা তাই এঁকে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। নকশা যদি বাজে হত, তাহলে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যত্ন করে বুদ্ধমূর্তির মধ্যে রক্ষা করা হত না! পদ্মরাগ বুদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চলো!'

অমলবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আশ্চর্য আপনার বুদ্ধি!'

জয়ন্ত বললে, 'বুদ্ধি হচ্ছে স্বাভাবিক, তা আশ্চর্য নয়। সব মানুষ যে তা ব্যবহার করতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য!'

সুন্দরবাবু খুঁত খুঁত করতে করতে বললেন, 'তাই তো, এ যে আবার নতুন বিপদ দেখছি! ওই পাতালের ভিতর ঢুকলে আবার বেরুতে পারব তো? ওখানে কোন ভয়ঙ্কর ওঁত পেতে আছে, তা কে জানে!'

মানিক বললে, 'তাহলে আমরা নীচে নামি, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'একলা? বাপরে, তাও কি হয়! 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!' আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব—যা থাকে কপালে! হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের সঙ্গে আটটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। সবগুলোই জ্বেলে ফ্যালো। পাতালের অন্ধকারে যত আলো তত ভালো।'

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লণ্ঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপানশ্রেণি দিয়ে নামতে লাগল।

পরে পরে কুড়িটি ধাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হল।

তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে।

গুহাপথের সেই যুগে যুগে সঞ্চিত নিবিড় তিমির সহসা আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চিৎকারে আর্তনাদ করে পায়ে পায়ে দূরে সরে যেতে লাগল, সভয়ে!

সেখানকার বহুকালব্যাপী নিদ্রিত স্তব্ধতাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার খট খট শব্দে যেন অত্যন্ত যাতনায় ধড়ফড় করতে করতে মরে গেল!

সুন্দরবাবু সঙ্কুচিত সন্দেহে গুহাপথের বদ্ধ হাওয়া সশব্দে শুঁকতে শুঁকতে বললেন, 'হুম! আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে গন্ধ পাই, এখানেও আমি যেন সেই রকম দুর্গন্ধই পাচ্ছি।'

অমলবাবু বললেন, 'এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তো আপনি বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধ পাচ্ছেন!'

—'উঁহু, এ বাষ্প-টাষ্পর গন্ধ নয়!'

মানিক বললে, 'তাহলে এটা বোধ হয় ভূতের পায়ের দুর্গন্ধ!'

সুন্দরবাবু চটে বললেন, 'ঠাট্টা কোরো না মানিক, ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! হুম! এখানে যে ভূত নেই তা কী করে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি মনোরম স্থান! আলো নেই, হাওয়া নেই, শব্দ নেই, এখানে থাকবে না তো ভূত কোথায় থাকবে?'

মানিক আবার টিপ্পনি কাটলে, 'কেন, আপনার মাথার ভিতরে! আপনার মাথাটি হচ্ছে ভূতের স্বদেশ! ওখানে নিত্য নতুন ভূতের জন্ম হয়!'

জয়ন্ত সর্বাগ্রে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'সাবধান! আর কেউ এগিয়ো না!'

প্রত্যেকেই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সুন্দরবাবু পায় পায় পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না!

মানিক বললে, 'কী ব্যাপার, জয়?'

—'কীরকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে!'

মানিক কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে! কেবল অদ্ভুত নয়, ভয়াবহ!

—'ও কীসের শব্দ, জয়?'

—'ঠিক বুঝতে পারছি না! পাথরের উপর দিয়ে কারা যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে!...না, যাচ্ছে নয়, টানতে টানতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

সুন্দরবাবু মাথার ঘাম মুছতে মুছতে কাতর ভাবে মনে মনে বললেন, 'হা ভগবান! এই ডানপিটে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কী ভুলই করেছি! আর কি দেশে ফিরতে পারব? হুম!'

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

এতকালের বন্ধ আলোহারা বায়ুহারা সুড়ঙ্গপথ, সমাধির চেয়েও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? যার মধ্যে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব অসম্ভব, সেখানে এ কী অভাবিত ব্যাপার?

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, 'মানিক, ব্যাপার বড়ো সুবিধের নয়, বন্দুক তৈরি রাখো!'

সড়ঙ্গপথের ভিতরে তার চুপিচুপি কথাই শোনাল চিৎকারের মতো!

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, বন্দুকই তৈরি রাখবে বটে! এই পাতালপুরে কোন কুম্ভকর্ণের ব্যাটা কত শত বৎসর ধরে ঘুমিয়ে ছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ করে দিলুম আমরা তার ঘুম ভাঙিয়ে! বন্দুক ছুড়ে করবে কী? বন্দুকের গুলিও তো হজমি গুলির মতো কপকপ করে গিলে ফেলবে!'

জয়ন্ত ও মানিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

বস্তা টানার মতো শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে! সেইসঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুমদুম করে খুব ভারী ভারী জিনিস আছড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে!

জয়ন্ত এসব শব্দের কোনও হদিস খুঁজে পেলে না! এ যেন কার আস্ফালনের শব্দ!

অমলবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, সেকালে গুপ্তধন রক্ষা করবার জন্যে যক রাখা হত বলে প্রবাদ শুনেছি! তা কি তবে সত্যি? যে আসছে সে কি যক?'

জয়ন্ত বললে, 'পদ্মরাগ বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোনও বৌদ্ধ পুরোহিত সে মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্যি কি না জানি না,—সত্যি না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্যি হলেও এখানে যক কেউ রাখেনি।'

—'তবে ও কে আসছে?'

—'ভগবান জানেন!'

এইবার ভীষণ একটা গর্জন শোনা গেল!

বদ্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এমন অদ্ভুত শোনাল যে, সেটা কীসের গর্জন কিছুই বোঝা গেল না।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হুম! ক্রমাগত চমকে চমকে আজ মারা পড়ব নাকি? আমার আর সহ্য হচ্ছে না—চললুম আমি উপরে! এর চেয়ে ওপরের অন্ধকারে বসে ভয় পাওয়া ভালো, বনের বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যাওয়া ভালো!'

তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন।

সুড়ঙ্গ-পথের অনেক দূরে, যেখানকার নিরেট অন্ধকারের গায়ে ঠেকে লণ্ঠনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎখণ্ডের মতো দুটো জ্বলন্ত চক্ষু!

সে বিচিত্র চোখ দুটো নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিবছে না!

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর গোঁয়ারতুমি করা নয়! মানিক, আজ আমাদের ফিরতেই হবে—এখনও সময় আছে! সকলে মিলে পরামর্শ করে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে! চলো, আমরা বাইরে যাই!'

—'কিন্তু ওসব কীসের শব্দ, ও কার গর্জন, ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না!'

—'বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয়! শিগগির উপরে চলো!'

সকলে দ্রুতপদে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙা বেদির গায়ে হেলান দিয়ে মড়ার মতো হলদে মুখে সুন্দরবাবু চুপ করে বসে আছেন।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ আপনারই জয়জয়কার। পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদের পথপ্রদর্শক।'

সুন্দরবাবুর তখন উত্তর দেবারও শক্তি ছিল না।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দপদপে চোখ নিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে! চলো, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই। আজকের রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে!'

অমলবাবু বললেন, 'তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাস্থানে রেখে গর্ত আবার বন্ধ করে দিলে কি হয় না?'

—'না। পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ! ওই আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হুড়মুড় করে ঠিকরে পড়বে!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, 'জয়ন্তের প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত। পথ খোলা পেলে ও-দানবটা হয়তো গর্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে!'

জয়ন্ত বললে, 'ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্যি হয়! ও-পাপ বিদেয় হলে তো সব লাঠা চুকে যায়!'

সুড়ঙ্গের গর্ভ ভেদ করে আবার একটা বুকের রক্ত ঠান্ডা করা গভীর গর্জন বাইরে ছুটে এল!

সে গর্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপুল ক্ষুধার ভাব! যেন আসন্ন মৃত্যুর গর্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্তম্ভিত হয়ে যায়!

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, 'সে আসছে, সে আসছে! তোলো সব তল্পিতল্পা, ছোটো বনের দিকে!'

রাত তখন বেশি নয়, কিন্তু এরই মধ্যে বনবাসিনী নিশীথিনীর নিদুটী মন্ত্রে চতুর্দিকের নির্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত। বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বয়ে আনছে দূর বনের আর্তধ্বনি।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোটো মাঠ। তারপর আবার অরণ্য।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সঙ্গে বিষাক্ত বাষ্পের বোমা এনেছিলুম!'

—'কেন বলো দেখি?'

—'কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছুড়ে দেখব কোনও ফল হয় কি না।'

—'যদি ফল না হয়? যদি ওটা কোনও জীব না হয়?'

—'মানে?'

—'ওটা কোনও ভৌতিক কাণ্ড হওয়া কি অসম্ভব?'

—'মানিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভিড়তে চাও?'

—'ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোনও জীব বাঁচতে পারে?'

—'না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোনও স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা। ভূতের কথা মনেও এনো না মানিক! ভূতের গল্প পড়তে ভালো, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে। কিন্তু ভূত নেই।'

বোধ হয় তখন শেষ রাত।

আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র। গাছের উপরে সকলে বসেছিল অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবুর নাসিকা রাত্রির স্তব্ধতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না। এমনকি মানিকের মত হচ্ছে, তাঁর নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে-গাছের সব পাখি ও বানর তো দূরের কথা, এমনকি ভূত-পেতনিরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে!

আচম্বিতে উপর-উপরি দু-দুবার বন্দুকের শব্দে সকলের তন্দ্রা গেল ছুটে!

সুন্দরবাবু বেজায় চমকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ করে ডাল থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হুঁশিয়ার ব্যক্তি বলে ধরাতলে অবতীর্ণ হবার আগেই খপ করে আর-একটা ডাল ধরে ফেলে শূন্যে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম ভেদ করে নানা কণ্ঠের চিৎকার ও আর্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল!

কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চিৎকার করছে এবং দারুণ যাতনায় কাঁদছে।

—'জয়! জয়!'

—'কী মানিক?'

—'শুনেছ?'

—'হুঁ!'

—'আমাদের এখন কী করা উচিত?'

—'চুপ করে এইখানে বসে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন মৃত্যুর রাজ্য। নীচে নামলেই মরব।'

—'কিন্তু ও কীসের গোলমাল?'

—'কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন আর কথা কোয়ো না। কথা কইলেও হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।'

নীচের ডাল থেকে করুণস্বর শোনা গেল, 'হুম! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে! গাছের ডাল ধরে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশিক্ষণ ঝুলতেও পারব না!'

অমলবাবুর সঙ্গে মানিক কোনও রকমে ডাল বয়ে সুন্দরবাবুর কাছে—অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হল!

মানিক বললে, 'বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেননি সুন্দরবাবু!'

ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার ঠাট্টা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়! নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে?'

উপর থেকে জয়ন্তের বিরক্ত ও গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'ফের কথা কয়!'

দূরের কোনও গোলমাল আর শোনা যায় না!

শব্দগুলো যেন স্তব্ধতাসাগরের মধ্যে কয়েকখণ্ড ইষ্টকের মতো পড়েই ডুবে কোথায় তলিয়ে গেল! এখন শুধু কালো রাত করছে থমথম, মুখর ঝিল্লি করছে ঝিমঝিম, বনের গাছ করছে মরমর! এবং ম্লান খণ্ডচাঁদ নিবুনিবু চোখে করছে উষার কোলে মৃত্যুর অপেক্ষা!......

গাছে গাছে পাখির দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রটিয়ে দিলে—জাগো লতা-পাতা, জাগো ফুল-ফল, জাগো অলি-প্রজাপতি! পূর্বের শোভাযাত্রায় দিবারানির সোনার মুকুট দেখা দিয়েছে! জাগো সবাই!

সকালের প্রথম আলো কী শান্তিময়! সকালের নতুন বাতাস কী মিষ্টি! এই পৃথিবীতে কখনও যে কালো কুৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না!

সকলে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আগে স্টোভে চড়িয়ে দাও চায়ের কেটলি! কী জানি বাবা, যে জায়গায় যাচ্ছি, জীবনে হয়তো আর চা খেতে হবে না! ওহে, 'এয়ার-টাইট' টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ এনেছিলে না? হুম, ক্ষমা-ঘৃণা করে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুড়ে মেরো!'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো ব্রেকফাস্ট মানুষের সাহস আর শক্তিকে দুগুণ করে তোলে! মানিক, নিয়ে এসো রসগোল্লা-সন্দেশের টিন!'

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্তভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশি ভাব! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মতো মনের মানুষ দুর্লভ!'

প্রাতরাশ শেষ করে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল, সুন্দরবাবু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক 'দুর্গা দুর্গা' বলে চেঁচিয়ে নিলেন!

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, শ্রীদুর্গার কানদুটি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না চ্যাঁচালেও তিনি শুনতে পাবেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই! ঠাট্টা শুরু হল তো? আচ্ছা মানিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগো কেন বলো দেখি?'

মানিক মুচকে হেসে বললে, 'আপনাকে বেশি ভালোবাসি কিনা!'

জয়ন্ত তার প্রিয় বাঁশের বাঁশিটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরও সুন্দর করে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সব আগে এগিয়ে চলেছে!

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘাসের ফুল—কেউ সাদা, কেউ হলদে।

আশেপাশে ঘুরে ফিরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব ছোটো জাতের একরকম প্রজাপতি। মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি নেবার মতলবে গঙ্গাফড়িং হাই-জাম্পের নানান কায়দা দেখাচ্ছে!

মাঠ পার হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে জয়ন্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল।

বাঁশিতে বাজছিল তখন কোনও গানের অন্তরা, কিন্তু হঠাৎ তার সুর বোবা হয়ে গেল একেবারে!

মানিক দূর থেকেই লক্ষ করলে, জয়ন্ত বাঁশিটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে, পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে! দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল!

সুন্দরবাবু বুঝলেন, আবার কোনও অঘটন ঘটেছে! একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও ছুটে এসো!'—বলেই তিনি দৌড়োতে লাগলেন!

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, 'হে ভগবান, আবার কী হল? আর যে পারি না!'

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তা ঠিক মতো বর্ণনা করা অসম্ভব!

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ! এত বড়ো অজগর দেখা যায় না বললেই হয়—লম্বায় সে হয়তো ত্রিশ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব রকম মোটা!

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে!

অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে বন্দি হয়ে রয়েছে দুটো মানুষের মৃতদেহ!......তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের উপরে হাত পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে—তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে পড়ে একটা ভাঙা বন্দুক!

অজগরটাও বেঁচে নেই—তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত!

কোথাও পড়ে আছে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা! রক্তের ফিনকি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে!

এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনও দেখেননি,—তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মতো তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন!

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'তাহলে কাল আমরা এই অভাগাদেরই আর্তনাদ শুনেছিলুম?'

মানিক বললে, 'তা ছাড়া আর কী!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু কে এরা?'

জয়ন্ত বললে, 'বুঝতে পারছেন না? এরা যে আমাদেরই বন্ধু! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটেনি, পদ্মরাগ বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কী করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে ঢুকেছিল!'

অমলবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি চ্যান আর ইনকে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশের লোকটা হচ্ছে ইন, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে চ্যান। অন্য লোকটাকে চিনি না।'

জয়ন্ত বললে, 'সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।...সাপ কখনও গর্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের খোঁড়া গর্তে সে আশ্রয় নেয়। কোনও জন্তু উপর থেকে গর্ত খুঁড়ে পদ্মরাগ বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর-মহাপ্রভু সেই গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখে সুড়ঙ্গেই বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোনও কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর কখন চ্যান আর ইন কোম্পানির রঙ্গালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায়নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে! চ্যান আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ করে দুবার বন্দুক ছুড়লে, সঙ্গে সঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন! ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল। ......অর্থাৎ আমাদের মানুষ-শত্রুর দল নিজেরাই আত্মবলি দিয়ে আমাদের অজগর-শত্রুকে বধ করে আমাদের পথ সাফ করে দিয়েছে! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যান্ড ইন কোম্পানিকেও ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ দি পদ্মরাগ বুদ্ধদেবকেও! তিনি সত্যিই যদি থাকেন, তবে আমাদের হস্তগত হলে তিনি বোধ করি খুশি হবেন!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে ভরসা করে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হুম! বেটা অজগর! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে!'

বলেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মৃতদেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কল্পনাতীত ব্যবহার আশা করেননি, তিনি ভয়ানক ভড়কে হঠাৎ পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়ামবীরের মতো আশ্চর্য এক ডিগবাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ষাঁড়ের মতো স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে বাবা রে, অজগরটা এখনও জ্যান্ত আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে সরে এল এবং তাঁকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে!

অজগরের দেহটা তখনও ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহাভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়ন্ত হাত ধরে তাঁকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন বলে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও জয়ন্ত আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হতে চাই না!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, শান্ত হোন!'

—'শান্ত হব? জ্যান্ত অজগরের সামনে শান্ত হব?'

—'ভয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নড়ে চড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনও ওই কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোনও জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কারুকে ধরতে পারে না!'

সুন্দরবাবু দুইচক্ষু বিস্ফারিত করে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বটে, বটে, বটে? তাহলে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগবাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি—উঃ!'

জয়ন্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা বেদির সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে, 'এখন দূরে যাক সমস্ত দুঃস্বপ্ন, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ বুদ্ধের প্রতিমা! হাতি সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো—কেননা পাতালে দিনও নেই, রাতও নেই, আছে শুধু রন্ধ্রহীন অন্ধকার!'

হাতি সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বালল, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সুর আর গন্ধের সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ!

সুড়ঙ্গের সুদূর অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কানে কানে মানিক বললে, 'আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহলে আপনি কী করবেন?'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাকে আর নতুন ভয় দেখিয়ো না মানিক!'

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কারুর আর দেখা হল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোথাও কোনও শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিক পরেই পথ গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিথর পাথরের দেওয়াল!

সকলে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অন্ত হল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম! হুম, পদ্মরাগ বুদ্ধ না অশ্বডিম্ব বুদ্ধ! ধাপ্পা বাবা, ধাপ্পা!'

মানিক বললে, 'তাহলে অকারণে এত কষ্ট করে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?'

অমলবাবু বললেন, 'এ হচ্ছে নাগরাজ্য, নাগ ছিল এখানকার প্রতীক! ওঙ্কারধামের ভাস্কর্যে সর্বত্রই তাই নাগমূর্তির ছড়াছড়ি! ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমির পোষা হয়, বাংলা দেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল!'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু! আপনার যুক্তি মনে লাগছে না! যে অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, ভক্তরা সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে তাকে কখনও কবর দিয়ে জ্যান্ত মারবার ব্যবস্থা করত না! ...আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে! হাতি সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বলো! ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল! দেখা যাক দেওয়ালের ওপাশে কী আছে?'

বলেই সে রুপোর শামুকের নস্যদানি বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মানিক জানত, জয়ন্ত খুশি হলে নস্য না নিয়ে পারে না!

কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশঙ্কার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, 'জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে আছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার নীচে। সুতরাং আমরা এখনও হয়তো সেই পুকুরের পাশে বা নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর হুড়হুড় করে জল ঢুকতে পারে! তখন আমাদের কী দশা হবে?'

জয়ন্ত বললে, 'সব দেওয়াল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল ঢুকলে পালাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।......ভাঙো দেওয়াল!'

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগল কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা! শক্ত দেওয়াল! সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হল।

কিন্তু জল-টল কিছুই ভিতরে ঢুকল না।

জয়ন্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অল্পক্ষণ কী অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'চালাও, কুড়ুল! সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়! সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয়নি!'

মানিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মতো কী হাতে ঠেকছে! বোধ হয় দরজা!'

সুন্দরবাবু বিপুল কৌতূহলে বললেন, 'অ্যাঁ? বলো কী! দরজা? আলিবাবার চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহা, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক!'

ঠকাং! ঠকাং! ঠকাং! চলল সমানে কুড়ুলের পর কুড়ুল! খসে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর! এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে নেচে ওঠে সকলের প্রাণ!......

দরজা বটে! খুব বড়ো দরজা নয়, ছোটো দরজা! তিন ফুটের বেশি উঁচু নয়, কিন্তু বিলক্ষণ মজবুত! আগাগোড়া লোহার কিল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটা পুরোনো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়ন্ত বললে, 'কুলুপের ভিতরে বেশ করে তেল ঢেলে দাও! বহুকাল ও-কুলুপে চাবি ঢোকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তেল তো ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?'

মানিক বললে, 'আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা এ কুলুপে লাগবে?'

জয়ন্ত বললে, 'কুলুপটা ভালো করে তেলে ভিজুক! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরি করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে একগাল হেসে বললেন, 'রাগ! আমার এ ভুঁড়ি পর্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে! এ ভুঁড়ি কখনও পরিপূর্ণ হয় না! বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরখ করে দেখতে পারো—হুম!'

মানিক স্বহস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, 'এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের পাওয়া যাবে!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, পদ্মরাগ মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কী, এইবারেই তা জানতে পারব! অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো পদ্মরাগ মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না! পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ মণি বেশি মূল্যবান!'

চায়ের পিয়ালা যখন খালি হল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরুল, তখন মানিক সগর্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি ঢুকল কুলুপের গর্ভে। এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল খুলে!

সমস্ত গুহা চিৎকার-শব্দে পরিপূর্ণ করে জয়ন্ত বললে, 'জয় পদ্মরাগ বুদ্ধের জয়!'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোটো একটি ঘর।

তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীব্র আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অন্ধকারের মৃত্যু হল, তার হিসাব কেউ জানে না!

ঘরে আর কোনও আসবার নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোনও ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক!

জয়ন্ত ঘরের চারিদিক তাকিয়ে বললে, 'মানিক, দ্যাখো! পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেঁতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?'

—'পারছি, জয়! এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।'

—'এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, মন্দিরগামী রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদির তলায় সিঁড়ির সার আছে, নকশা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত! সাধারণ লোকে নকশা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না—কিন্তু আমরা হচ্ছি অসাধারণেরও চেয়ে অসাধারণ! কারণ অসাধারণ লোক নকশার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হত, কিন্তু আমরা ফিরে যাইনি। অতএব অনায়াসেই গর্ব করতে পারি! এখন তোলো ওই সিন্দুকের ডালা!'

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল!

সিন্দুকের ভিতরে লণ্ঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীব্র রক্তজ্যোতির ঝটকা!

তারপরেই দেখা গেল টকটকে লাল ও জ্বলজ্বলে পাথরে তৈরি একটি অতিআশ্চর্য ও অতুলনীয় বুদ্ধমূর্তি সেখানে কারুকার্যে বিচিত্র সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে!

মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতের কম হবে না!

জয়ন্ত বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললে, 'মূর্তির সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল আলো ঠিকরে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা! এ মণিময় মূর্তি না হয়ে যায় না! না-জানি এর দাম কত কোটি টাকা! মানিক, মানিক! এ কি সত্যি, না অসম্ভব স্বপ্ন?'

মানিক আবেগে নিরুত্তর হয়ে মূর্তির মণিময়, দীপ্ত ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! পদ্মরাগ মণি কেটে এত বড়ো মূর্তি তৈরি করা হয়েছে? পদ্মরাগ মণি এত বড়ো হয়!'

মানিক বললে, 'না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পদ্মরাগ মণি একসঙ্গে জুড়ে শিল্পী এই মূর্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায়ই নেই!'

জয়ন্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্তিটিকে সযত্নে তুলে সিন্দুকের উপর বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মতো ঘোররক্তবর্ণ সেই মহামানবমূর্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল!

সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির সামনে দুই হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধর্মং শরণং গচ্ছামি! সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!'

প্রদীপ ও অন্ধকার

প্রথম

অথ পঞ্চমবাহিনী সন্দেশ

নর-নারায়ণের নাম শুনেছেন? পৌরাণিক নর-নারায়ণ নয়, বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক নর-নারায়ণ।

নরেন্দ্র মজুমদার ও নারায়ণ চৌধুরি, দুই বন্ধুর নাম। তাদের মতন একজোড়া বন্ধু সচরাচর দেখা যায় না। দুটিতে যেন মানিকজোড়! যেখানে তাদের একজনকে দেখা যাবে না, সেখানে দেখা যাবে না তাদের আর-একজনকেও। যেন যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন থাকবেই। যেখানে নরেন্দ্র আছে, ধরে নিতে হবে সেখানে আছে নারায়ণও। তাই লোকে তাদের নাম দিয়েছে নর-নারায়ণ।

নর-নারায়ণের নাম এমন সুপরিচিত হয়েছে কেন জানেন? অপরাধ-তত্ত্বে তাদের মতন বিশেষজ্ঞ বাংলা দেশে খুবই কম আছে। লোকে তাদের ডিটেকটিভ বলেই মনে করে। আমরাও তাদের ডিটেকটিভ বলেই মনে করতে পারি, কিন্তু আসলে তারা সাধারণ ডিটেকটিভ নয়। তারা পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা কাজ করে স্বাধীন ভাবেই। এ-শ্রেণির গোয়েন্দাদের সাধারণ পুলিশ কোনওদিনই সুনজরে দেখে না, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নর-নারায়ণের—বিশেষ করে নরেন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। কারণ, কোনও গোলমেলে মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়লে পুলিশের বড়ো বড়ো কর্তারাও নরেন্দ্রের কাছে এসে পরামর্শ করতে লজ্জিত হন না। যে-কোনও কঠিন সূত্রের অতি জটিল জোট খুলতে নরেন্দ্রের মতন ওস্তাদ আর নেই। যেখানে কারুর মাথা খেলে না সেখানেও পঙ্গু নয় নরেন্দ্রের মাথা। তার মূল্যবান সাহায্য লাভ করে পুলিশ অনেক বড়ো বড়ো মামলার কিনারা করে যথেষ্ট সুনাম কিনেছে, অথচ নরেন্দ্র জনসাধারণের কাছে কোনওদিনই নিজের নামকে বিজ্ঞাপিত করতে রাজি হয়নি। জনসাধারণ তাকে চেনে না বললেই চলে। তার বাহাদুরি জানে কেবল পুলিশ এবং অপরাধীরা।

কিন্তু যে-ব্যক্তি এমন অসাধারণ বাহাদুর, তাকে চোখে দেখলে আপনারা দস্তুরমতো অবাক হয়ে যাবেন। ভগবান তার দেহখানিকে গড়েছেন প্রায় বামন করেই। লম্বায় সে চার ফুট আড়াই ইঞ্চির বেশি হবে না, আর চওড়ায় তাকে দেখতে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ তালপাতার সেপাইয়ের মতন। কিন্তু দেহের হ্রস্বতা ও কৃশতার জন্যে তার যা-কিছু ক্ষতি হয়েছে, সেটা পূরণ করে নিয়েছে তার অদ্ভুত মাথাটা। কারণ, দেহের তুলনায় তার মাথাটি অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড। দেখলে ভয় হয় যে, তার অত বড়ো মাথাটার ভার ওইটুকু পলকা দেহ বেশিদিন বোধহয় সহ্য করতে পারবে না। দূর থেকে তাকে দেখায় যেন একটা হেঁড়ে-মাথা রোগা-লিকলিকে ছোট্ট ছেলের মতন। বাস্তবিক, চেহারার দিক দিয়ে সকলকেই সে রীতিমতো হতাশ করে দেয়।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রাণের বন্ধু নারায়ণের চেহারা হচ্ছে একেবারে অন্যরকম। তাকে দানব বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার মতন সুদীর্ঘ দেহ কলকাতায় আর কারুর আছে বলে মনে হয় না। তার মাথার উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে সাত ফুট। চওড়াতেও তার দেহ জাগায় মনের ভিতরে বিপুল বিস্ময়। তার বুকের ছাতির বেড় সহজ অবস্থায় আটচল্লিশ ইঞ্চি এবং স্ফীত হলে সেই আশ্চর্য ছাতির বেড় দাঁড়ায় গিয়ে পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন ইঞ্চিতে। বড়ো বড়ো পালোয়ান গুন্ডাও তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে ভয়ে কুঁচকে পড়ে। শিশুরা তাকে দেখলে কেঁদে-ককিয়ে ওঠে। সে এমন আশ্চর্য শক্তির অধিকারী যে, দুই-তিনজন আরোহীর সঙ্গে একখানা বড়ো মোটরগাড়িও দুই হাতে টেনে শূন্যে তুলতে পারে।

গায়ের রঙে এবং প্রকৃতিতেও নরেন্দ্রের সঙ্গে নারায়ণের আকাশ-পাতাল তফাত। নরেন্দ্রের গায়ের রং ধবধবে সাদা। আর নারায়ণ হচ্ছে একেবারে আবলুস কাঠের মতন কালো, এমন অসাধারণ কালো রংও বাঙালিদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রকৃতি হচ্ছে ধীর, স্থির, শান্ত। সে কথা কয় ওজন করে, আর যে-কোনও কথা বলবার আগে ভেবে-চিন্তে তবে উচ্চারণ করে। আর নারায়ণ? তার হো-হো হাসির ধাক্কায় ল্যাজ খসে পড়বার ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে না টিকটিকিরাও। সে মহা চঞ্চল, এক জায়গায় পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কথা কইতে কইতে সর্বদাই সে বসছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং মেঝে কাঁপানো পদযুগলকে চালনা করে ঘুরে আসছে এদিকে-ওদিকে—যেন মানুষ-চরকি! আর তার মুখের কথা? তার মুখ যেন কথার তুবড়ি! এবং তার মুখের কথার ভিতরে শিশুত্বও বড়ো কম থাকে না।

বিচিত্র এই মানুষ দুটি—কেউ কারুর মতন নয়, অথচ দুজনেই দুজনের মনের মতন!

লোকে বিস্ময়প্রকাশ করে বলে, তেলে আর জলে এমন মিল হল কেমন করে?

নারায়ণ হেসে বলে, 'আমরা কেউ তেলও নই আর জলও নই। ভগবান আমাদের একসঙ্গে গড়েছেন পরস্পরের অভাব পূরণ করবার জন্যে। নরেনের দেহ নেই বটে কিন্তু মস্তিষ্কের দিক দিয়ে ও হচ্ছে মস্ত! আমার মস্তিষ্কের বালাই নেই, কিন্তু আমার দেহখানি নয়ন ভরে দর্শন করছ তো? ব্যাপার কী জানো ভায়া? নরেন আমার হয়ে ভাবে, আর আমি নরেনের হয়ে হাতেনাতে কাজ করি।'

লোকে বলে, 'তাহলে তুমি নিজেকে যন্ত্র বলে মনে করো নাকি?'

নারায়ণ বলে, 'ঠিক তাই। আমি হচ্ছি যন্ত্র, আর নরেন হচ্ছে যন্ত্রচালক!'

এই হল নর-নারায়ণের পরিচয়। এইবারে দেখা যাক তারা এখন কী করছে।

বর্ষাকালের একটি ভিজে প্রভাত। ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঢালছে হুড় হুড় করে জলের ধারা। রাজপথ হয়েছে যেন একটি নদীর মতো। সকালবেলাতেও রাস্তায় মানুষের সাড়া এত কম যে, মনে হয় শহরের ঘুম যেন এখনও ভাঙেনি। ঘরে ঘরে কেরানিরা প্রায় রাত্রির মতন কালো আকাশ এবং জলতরঙ্গময় রাজপথের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবছে, আজ চাকরির মানরক্ষা করা যায় কেমন করে?

খাবার টেবিলের দুই ধারে সামনাসামনি বসে নরেন এবং নারায়ণ। নরেনের সুমুখে টেবিলের উপরে রয়েছে একখানি খবরের কাগজ, দুইখানি খুব পাতলা টোস্ট ও এক পেয়ালা চা।

আর নারায়ণের সুমুখে রয়েছে দস্তুরমতো সমারোহের ব্যাপার। খুব-বড়ো একটি চায়ের পেয়ালা, মস্ত একটা চায়ের কেটলি, থাকে থাকে সাজানো অনেকগুলো টোস্ট, গোটা-ছয়েক 'এগপোচ, গোটা-ছয়েক সিদ্ধ ডিম আর আস্ত একখানা প্লামপুডিং! সে একবার খাবারের থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছে, তারপর এক চুমুকে সব চা নিঃশেষ করে ঘন ঘন কেটলি তুলে নিয়ে শূন্য পেয়ালায় ঢালছে চায়ের ধারা।

নরেনের একটিমাত্র পেয়ালার আধখানাও যখন খালি হয়নি, নারায়ণের এক কেটলি চা এবং সমস্ত খাবার হল তার মুখের ভিতরে অদৃশ্য।

নারায়ণ চিৎকার করে উঠল, 'বেয়ারা! বেয়ারা!'

নরেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে মৃদু স্বরে বললে, 'আবার বেয়ারাকে কেন?'

—'পেট ভরল না, আরও খাবারের দরকার।'

—'নারায়ণ, তোমার এই বাড়াবাড়িটা আমি পছন্দ করি না। সকালবেলাতেই উঠে তুমি যা গলাধঃকরণ করলে, তাই খেয়ে আমার কেটে যেতে পারে পুরো দুটো দিন।'

নিজের প্রকাণ্ড কালো মুখে ধবধবে দাঁতের বিদ্যুৎ খেলিয়ে কড়িকাঠ-ফাটানো কণ্ঠে নারায়ণ বললে, 'বন্ধু, তুমি আর আমি? হাতি আর পিঁপড়ে? তোমার পনেরো দিনের খোরাকেও আমার দেহের এক দিনের বেশি চলবে না যে!'

নরেন বললে, 'কেবল দেহের খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে দিনে দিনে তুমি তোমার মস্তিষ্ককে আরও কাহিল করে ফেলছ। হাতি খুব প্রকাণ্ড জীব বটে, কিন্তু তাকে দাসত্ব করতে হয় ক্ষুদ্র মানুষেরই।'

নারায়ণ বললে, 'কিন্তু ভায়া, আমার মস্তিষ্কের ভার তো আমি তোমাকেই অর্পণ করেছি। এজন্যে আমাকে খোঁটা দিয়ে তোমার কোনওই লাভ হবে না। আমার মস্তিষ্ক তুমিই, আর তোমার দেহ হচ্ছি আমি। কেমন, আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্তই পাকা হয়ে আছে কি না? অতএব আমাকে দেহরক্ষা করবার অবসর দাও। বেয়ারা, বেয়ারা! আরও খান-ছয়েক টোস্ট, আর আধ-ডজন এগপোচ!'

নরেন আর কিছু বলবার চেষ্টা না করে চায়ের পেয়ালায় ছোটো একটি চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলে। আবার এল এগপোচ, টোস্ট আর এক কেটলি চা। নারায়ণ আবার নতুন খাবারগুলোকে আক্রমণ করলে বিপুল বিক্রমে।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় একখানা গাড়ি থামার শব্দ হল। নরেন কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, 'এই বাদলে বাড়ির দরজায় আবার কার গাড়ি এসে থামল!'

নারায়ণ একটা বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গি করে বললে, 'হয়তো কোনও মক্কেল! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আজ যেন কেউ আমাদের বাইরে বেরুবার অনুরোধ না করে! আমার এতখানি ডাগর দেহ একবার ভিজে গেলে শুকোতে লাগবে সারাটা দিন।'

ঘরের ভিতরে যে হোমরাচোমরা লোকটি এসে ঢুকলেন, তিনি হচ্ছেন পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন বিস্মিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এ কী অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! এমন দুর্যোগে এমন অসময়ে আপনি!'

শচীনবাবু বললেন, 'এক সমস্যায় ঠেকে গিয়েছি মশায়! তাই ঠকবার আগেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছি।'

নরেন বললে, 'ঠকবার ভয় আছে নাকি?'

—'আছে বই কি! হয়তো এর মধ্যে বেশ খানিকটা ঠকেও গিয়েছি।'

নরেন বললে, 'পুলিশ যেখানে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে, ব্যাপারটা সেখানে মারাত্মক বলেই সন্দেহ হয়!'

—'হ্যাঁ মশাই, মারাত্মক বিভ্রাটের মধ্যেই পড়ে আছি।'

—'ভালো, বসতে আজ্ঞা হোক। চা-টা কিছু ইচ্ছা করেন?'

—'কিছু না, কিছু না! ওসব ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই এসেছি', বলতে বলতে শচীনবাবু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

নরেন একখানা সোফার উপরে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল, তার ছোটো দেহখানি সোফার ভিতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

শচীনবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর আর গোপনীয়। গোড়াতেই আপনাকে এই কথাটা বলে রাখতে চাই।'

নরেন কোনও জবাব দিলে না, শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।

শচীনবাবু বললেন, 'খবরের কাগজে পঞ্চমবাহিনীর কথা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এদেশের কোনও কোনও গুপ্তচর আমাদের প্রধান শত্রু জাপানকে গোপনে সাহায্য করছে।'

—'আপনার এমন সন্দেহের কারণ?'

—'আমরা প্রমাণ পেয়েছি, কোনও কোনও সরকারি গুপ্তকথা বাইরে ব্যক্ত হবার আগেই একেবারে শত্রুপক্ষের কানে গিয়ে উঠছে। এমনকি এখানে কোনও বড়ো জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছোবার তিন-চার দিন পরেই সেই খবর সরাসরি গিয়ে হাজির হচ্ছে জাপানিদের কাছে।'

—'কেমন করে জানলেন?'

—'শত্রুশিবিরে আমাদেরও গুপ্তচরের অভাব নেই তো! আমরা খবর পাচ্ছি তাদের কাছ থেকেই।'

—'গুরুতর কথা বটে। কারুকে সন্দেহ করতে পেরেছেন?'

শচীনবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'না। আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি।'

—'আপনি আমাদের কী করতে বলেন?'

—'আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই আমরা অপরাধীদের আবিষ্কার করবার কিছু কিছু চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমরা যে গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করি, মামলার ভার পাবার কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। তারপর নিযুক্ত করি আর একজন গোয়েন্দাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকদিন পরেই তাকেও ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। তারপর নিযুক্ত করি তৃতীয় ব্যক্তিকে, কিন্তু সে-ও আজ বেঁচে নেই। বুঝতে পারছেন, ঘটনাগুলো কেবল রহস্যময়ই নয়, রীতিমতো সন্দেহজনক।'

সোফার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে নরেন ধীরে ধীরে বললে, 'তিন-তিনজন লোক একই মামলার ভার নিয়ে পরে পরে মারা পড়েছে। কথাটা শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে। কেমন করে তারা মারা পড়ল? কেউ তাদের খুন করেছে?'

—'খুনোখুনি বা মারামারির কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি।'

—'তবু তারা মারা পড়ল কেন?'

—'স্বাভাবিক ভাবেই বিছানায় শুয়ে।'

—'মানে?'

—'তারা প্রত্যেকেই মারা পড়েছে একই রোগে।'

—'রোগটা কী?'

—'নিউমোনিয়া!'

নরেন আবার সোফার উপরে এলিয়ে পড়ে, দুই চক্ষু মুদে স্তব্ধ হয়ে রইল। নারায়ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে আবার শচীনবাবুর সামনে এসে বসে পড়ল। তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা হতভম্ব ভাব।

নরেন আবার চক্ষু মেলে মৃদুকণ্ঠে বললে, 'স্বাভাবিক মৃত্যুর ভিতরেও যে এমন অস্বাভাবিক যোগাযোগ থাকতে পারে, একথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। একই মামলার ভার নিয়েই তিনজনে মারা পড়ল একই নিউমোনিয়া রোগে?'

নারায়ণ বললে, 'বাবা, আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছেই, পেটের পিলেও বিলক্ষণ চমকে গিয়েছে। আজকাল নিউমোনিয়া ব্যাধিও শত্রুপক্ষে যোগদান করেছে নাকি?'

শচীনবাবু বললেন, 'এখন বলুন দেখি নরেনবাবু, এ রহস্যের তল কোথায়? এগুলো যদি হত্যাকাণ্ড না হয় তাহলে এগুলো কী? এই কথা জানবার জন্যেই আমি এসেছি আপনার কাছে।'

নরেন তেমনই মৃদুস্বরেই বললে, 'এত তাড়াতাড়ি জোর করে আমি কোনওই মত প্রকাশ করতে রাজি নই। পঞ্চমবাহিনীর নাম আমরা প্রথম শুনেছি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকেই। প্রথম প্রথম পঞ্চমবাহিনীর অর্থ বুঝতেও কষ্ট হত, এখন খবরের কাগজে তার উদাহরণ পেয়ে বুদ্ধি কতকটা খুলেছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধেও তথাকথিত পঞ্চমবাহিনীভুক্ত একজাতীয় জীবের অভাব ছিল না। তাদের অধিকাংশ ইতিহাসই প্রকাশিত হয়েছে, আর আমিও তা পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। আমার স্মরণ হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরনেরই কোনও কোনও ঘটনা ঘটেছিল।'

শচীনবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘটনাগুলো কী রকম?'

—'আপাতত তা শুনে কাজ নেই। কারণ, গোড়া থেকেই কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলে আমরা অনায়াসেই বিপথে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। এখন আপনার কী কর্তব্য জানেন?'

—'বলুন।'

—'আপনি আজই প্রচার করে দিন যে, এই মামলার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছি আমি।'

—'তাতে আপনার কিছু সুবিধে হবে?'

—'যথেষ্ট। আমি দেখতে চাই, আমার সন্দেহ সত্য কি না। অর্থাৎ এই তিনটে মৃত্যুর মধ্যে কোনও গুরুতর অপরাধের নিদর্শন আছে কি না। আমি অপরাধীদের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। আজ আর কোনও কথা নয়, আমাকে এখন কিছু ভাববার সময় দিন।' নরেন আবার তার দুই চক্ষু মুদে ফেলে ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

শচীনবাবুর হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু তিনি নরেনের স্বভাব জানতেন। তিনি বুঝলেন, আপাতত সে কিছুতেই ভঙ্গ করবে না তার মৌনব্রত। অতএব আর দ্বিরুক্তি না করে সেদিনের মতন বিদায়-গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয়
পকেটমারের কীর্তি

শচীনবাবু ঘরের ভিতর থেকে যেই অদৃশ্য হলেন, নরেন অমনি আবার চক্ষু মেলে বললে, 'নারায়ণ, অবিলম্বে গাত্রোত্থান করো।'

নারায়ণ তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তারপর?'

—'তারপর সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হও।'

'আমি প্রস্তুত। কিন্তু কারণ?'

—'কারণ, জানলার ভিতর দিয়ে আমি বারবার লক্ষ করেছি, রাস্তার ওধারের ফুটপাতের উপরে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে একটি ভদ্রলোক মূর্তির মতো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ওর ওই উদাসীনতা সন্দেহজনক, কারণ শচীনবাবুর গাড়ি চলে যাওয়ার পরেই ও-লোকটিরও পদযুগল রীতিমতো সচল হয়ে উঠল। এখন আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না! তুমি তার পিছনে পিছনে ধাবমান হতে পারবে?'

—'অনায়াসে। কিন্তু তাকে চিনব কেমন করে?'

—'সে ও-ফুটপাত ধরে এইমাত্র উত্তর দিকে গিয়েছে। তার পায়ের দিকটা আমি দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তার গায়ে আছে একটি নীল রঙের পাঞ্জাবি, চোখে আছে চশমা, ঠোঁটে আছে গোঁফের রেখা, মাথায় আছে গান্ধি-টুপি আর হাতে আছে মোটা মালাক্কা বেত। মাথায় সে মাঝারি আর তার গায়ের রং তোমার চেয়ে ফরসা হলেও রীতিমতো কালো। যাও।'

নারায়ণ দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নরেন হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললে, 'নারায়ণ, আর একটা দরকারি কথা শুনে যাও।'

দরজার ওপাশ থেকে নিজের মস্ত মুখখানা বাড়িয়ে নারায়ণ বললে, 'কী হুকুম হুজুর?'

—'লোকটা এখনও আমাদের উপরে হয়তো কোনও সন্দেহ করতে পারেনি। খুব সম্ভব তুমি ওর আড্ডার সন্ধান পাবে। যদি পাও, ওর আড্ডার উপরে পাহারা রাখবার ব্যবস্থা করে এসো।'

—'আচ্ছা' বলে নারায়ণের মুখ আবার আড়ালে চলে গেল।

নরেন নিজের মনেই ভাবতে লাগল, কিছুকাল আগেও এদেশি অপরাধীদের সঙ্গে বিলাতি অপরাধীদের তফাত ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজকাল এদেশেও মাঝে মাঝে এমন অপরাধের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যার আদর্শ আছে সাত সাগরের ওপারে। জানি না, আজ যে মামলাটার ভার গ্রহণ করলুম, সেটাও ওই জাতীয় কি না!

ঘণ্টা-তিন পরে নারায়ণ আবার ফিরে এল।

নরেন তখন বসে বসে খান-কয়েক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ তুলে বললে, 'কী খবর নারায়ণ?'

—'খবর ভালো। আমি একেবারে লোকটার ডেরা পর্যন্ত না-দেখে ছাড়িনি। লোকটা থাকে রজনী বোস স্ট্রিটের একখানা প্রকাণ্ড ব্যারাকবাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সে-বাড়িতে নানা জাতের লোকের বাস। তাদের অনেকেই কেউ কারুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সেখানে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে; বাংলার নানা জেলার লোকও আছে, আবার পশ্চিমের নানাদেশি মানুষেরও নমুনা আছে। এমনকি দু-ঘর মাদ্রাজিরও খোঁজ পেয়েছি।'

—'সেখানে কোনও পাহারার ব্যবস্থা করে এসেছ?'

—'করেছি বই কি! বাড়ির সামনে বিজয়কে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।'

—'কোন বিজয়? চোর বিজয়, না পকেটমার বিজয়?'

—'পকেটমার।'

—'বেশ করেছ। ছোকরা যেমন চালাক, তেমনি চটপটে।'

এইখানে একটুখানি ব্যাখ্যার দরকার। আপন আপন চেহারার বিচিত্র বিশেষত্বের জন্য নরেন্দ্র ও নারায়ণ বৃহৎ জনতার ভিতরে থেকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কোনওরকম ছদ্মবেশই নরেনের বালকের মতন দেহের ক্ষুদ্রত্ব এবং নারায়ণের দানবের মতন দেহের বিপুলতা ঢেকে রাখতে পারত না। গোয়েন্দাগিরির পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত অসুবিধাকর।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে তারা একটি উপায় অবলম্বন করেছিল। তারা মাহিনা দিয়ে পুষেছিল এমন কয়েকটি জীবকে, যাদের পেশা ছিল রাহাজানি, গুণ্ডামি, চুরি ও পকেটকাটা প্রভৃতি। এ-শ্রেণির লোক পুলিশে চাকরি না নিলেও গোয়েন্দাগিরির বহু বিশেষত্বের সঙ্গে সুপরিচিত থাকে।

সর্বদা পুলিশের ও জনসাধারণের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে রাখতে তাদেরও দৃষ্টি হয়ে ওঠে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এবং প্রকাশ্যে থেকেও কী কৌশলে আত্মগোপন করতে হয়, তারা ভালো করেই জানে সে গুপ্তকথা।

এরা নর-নারায়ণকে দেখত প্রভুর মতো। তাদের সংসর্গে এসে তারা পুরোদস্তুর সাধু না হলেও অসৎ পথের দিকে সহজে পা বাড়াতে চাইত না। অন্তত তাদের পক্ষে থেকে এইটুকু বলা যেতে পারে, নরেন ও নারায়ণকে তারা কোনওদিন ঠকাবার চেষ্টা করেনি, বরং প্রাণপণে আদেশ অনুযায়ী কাজ করে নিমকের মর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করে এসেছে। এ-শ্রেণির লোকের চরিত্র ছিল নরেনের নখদর্পণে। তাদের বশ করবার কৌশল সে জানত।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় পকেটমার বিজয় নরেনের সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

নরেন বিরক্ত ভাবে বললে, 'বিজয়, তুমি পাহারা ছেড়ে এখানে কেন?'

বিজয় দুই হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে সেখানে নসীরামকে পাহারায় রেখে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।'

—'কী কথা?'

—'গোড়া থেকেই বলি, শুনুন হুজুর। সেই ব্যারাকবাড়িখানার সামনে আমার এক আলাপী লোকের একখানা পানের দোকান ছিল। সারাদিন আমি সেইখানেই বসেছিলুম। যে-লোকটার উপরে আমাকে নজর রাখতে বলা হয়েছে, বিকেলবেলায় দেখি সে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়েই হন হন করে একদিকে এগিয়ে চলল। আমিও তার পোষা কুত্তার মতন লোকটার পিছু নিলুম। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে তার সঙ্গে আমিও একখানা বাসে উঠে বসলুম। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছে লোকটা বাস থেকে নেমে পড়ল। তারপর টালিগঞ্জের দিকে হেঁটে খানিকটা গিয়ে একখানা বড়ো বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল, আমি চুপ করে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইলুম। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে বাড়ির বাইরে এসে সে আবার উঠল ধর্মতলার এক ট্রামে। আমিও উঠলুম। ট্রামে এত ভিড় যে আমাদের দুজনেরই বসবার জায়গা হল না। তার গায়ে গা মিশিয়েই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর হুজুর—'

—'বলো থামলে কেন? তারপর?'

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বিজয় বাধো-বাধো গলায় লজ্জিত ভাবে বললে, 'তারপর হুজুর, কেন জানি না, আমি আর লোভ সামলাতে পারলুম না।'

নরেন একটুখানি হেসে বললে, 'বুঝেছি। তুমি লোকটার পকেট মেরে দিয়েছ?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিজয় বললে, 'কী আর বলব হুজুর, হাতদুটো কেমন যেন নিশপিশ করে উঠল! পোড়া মনকেও কত যে বোঝাই, মন তবু বশ মানতে চায় না। তাই—'

নরেন বাধা দিয়ে অধীর স্বরে বললে, 'অত আর ওজর দেখাবার দরকার নেই, আসল কথা বলো।'

বিজয় কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তার পকেট থেকে পেয়েছি একটা মানিব্যাগ, একখানা চিঠি, আর ওষুধ-ভরা ছোট্ট একটা কাচের নলচে। আমার মনে হল এগুলো হুজুরের কাজে লাগতে পারে। তাই আমি এখানে ছুটে এসেছি।'

নারায়ণ বিজয়ের পিঠের উপরে এক থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভ্যালা মোর বাপ রে, জিতা রহো!'

নরেন গম্ভীর ভাবে বললে, 'আচ্ছা, চিঠিখানা আর ওষুধের নলচেটা আমার হাতে দাও। মানিব্যাগটা তুমি রাখতে পারো। আর তোমাকে দরকার নেই।'

বিজয় একটা সেলাম ঠুকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

ছোট্ট একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতরে পুরু তুলো জড়িয়ে একটি কাচের চুঙি সযত্নে রাখা হয়েছে। চুঙিটির দু-মুখই বন্ধ, ডাক্তাররা ইনজেকশন দেবার সময় এই রকম ওষুধ-ভরা কাচের চুঙি ব্যবহার করেন।

নরেন সেটিকে আলোর দিকে ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, 'চুঙির ভিতরে এই জলীয় পদার্থটা যে কী, আপাতত তা বোঝা যাচ্ছে না। দেখছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা দরকার।'

চুঙিটিকে আবার যথাস্থানে রক্ষা করে নরেন চিঠি-ভরা খোলা খামখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর খামখানা উলটেপালটে ভালো করে দেখে বললে, 'দ্যাখো নারায়ণ, খামের ওপরে ডাকঘরের ছাপ নেই। পত্রলেখক বোধ হয় ডাকঘরকে বিশ্বাস করে না, তাই চিঠি বিলি করেছে অন্য কোনও লোকের হাত দিয়ে। খামের এক কোণে খালি একটি নাম লেখা রয়েছে—'নৃপেশ'। আচ্ছা, এইবার চিঠিখানা বার করে পড়ে দেখা যাক।'

চিঠিখানা এই

'নৃপেশ,

শচীন দত্তের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। সন্ধান নেবে, সে আর-কোনও নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে কি না। যদি কোনও নতুন খোঁজখবর পাও, তাহলে তখনই আমাদের তিন নম্বর বাড়িতে চলে আসবে। আমি দিন-তিনেকের জন্যে ওই বাড়িতে থাকব। তারপর আমাকে পাবে হপ্তাখানেকের জন্যে আমাদের চার নম্বর বাড়িতে।

ছোটোবাবু।'

নরেন বললে, 'চিঠির উপরে তারিখ লেখা রয়েছে তেসরা। আজ হচ্ছে পাঁচ তারিখ। তাহলে পত্রলেখক আজই তিন নম্বরের বাসা ত্যাগ করবে। ধরে নেওয়া যাক, বিজয় আজ টালিগঞ্জের যে বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল, সেই-খানাকেই তিন নম্বরের বাড়ি বলা হয়েছে। তাহলে এর পরেও আছে চার নম্বরের বাড়ি, যার ঠিকানা আমরা জানি না।'

নারায়ণ বললে, 'যদিও তুমি আমার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করো না, তবু আমার মনে হচ্ছে, এই চিঠিখানার ভেতরে আছে যেন কোনও ষড়যন্ত্রের গন্ধ।'

নরেন বললে, 'তোমার মস্তিষ্ক না থাকুক, ঘ্রাণশক্তি যে আছে একথা আমি কোনওদিনই অস্বীকার করি না। হ্যাঁ, এই পত্রে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বই কি! এই ছোটোবাবু নামক মহাত্মাটি যে কে তা আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, এই লোকটি আমাদের শচীনবাবুর পিছনে নিযুক্ত করেছে গুপ্তচর। কোনও একটি মামলার জন্যে শচীনবাবু আর কোনও নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন কি না, এটা জানবার জন্যে তার যথেষ্ট আগ্রহ। মামলাটা কোন জাতীয় সেটা তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ কি?'

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, 'আন্দাজি ঢিল ছোড়ার অভ্যাস যে আমার নেই, তুমি একথা জানোই তো নরেন!'

নরেন বললে, 'কিন্তু আমার সে অভ্যাস আছে। এই কথাগুলো লক্ষ করো—'আর কোনও নতুন

গোয়েন্দা'। এথেকে কি এই বুঝায় না যে, এটা হচ্ছে এমন কোনও মামলা যার জন্যে শচীনবাবু আগে এক বা একাধিক গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন, পরে আবার নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে পারেন? কিন্তু সেই বিশেষ মামলাটি কী? শচীনবাবুর নিজের মুখেই আমরা শুনেছি, পঞ্চমবাহিনীর অপরাধীদের আবিষ্কার করবার জন্যে পুলিশ থেকে পরে পরে তিনজন গোয়েন্দাকে কাজে লাগানো হয়েছিল, আর তিনজনই একে একে মারা পড়েছে। হ্যাঁ নারায়ণ, এ সেই পঞ্চমবাহিনীর মামলা না হয়ে যায় না।'

নারায়ণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

নরেন বললে, 'ব্যাপারটা গোড়া থেকে আরও ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। পুনরুক্তি আমি ভালোবাসি না, কিন্তু তোমার মাথার ভিতরে জটিল কিছু ঢুকাতে গেলে পুনরুক্তি ছাড়া উপায় নাই। শোনো

'পুলিশ টের পেয়েছে, ইউরোপের মতন এদেশেও পঞ্চমবাহিনীর আবির্ভাব হয়েছে। তারা এখানকার সামরিক গুপ্তকথা সংগ্রহ করে শত্রুপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কী উপায়ে তারা সংবাদ সংগ্রহ করে আর কী উপায়েই বা তা যথাস্থানে প্রেরণ করে, আমরা এখনও সেসব জানতে পারিনি। আর সত্য সত্যই এখানে পঞ্চমবাহিনীর অস্তিত্ব আছে কি না, তাও জোর করে মানা যায় না। আমাদের কাজ করতে হবে কেবল পুলিশের সন্দেহের উপরেই নির্ভর করে। শেষ পর্যন্ত গিয়ে হয়তো দেখব, আমরা ছুটে মরেছি কোনও মরীচিকার পিছনে পিছনে!

'কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে, পুলিশ হাওয়ার উপরে কোনও মামলা খাড়া করেনি, পুলিশের সন্দেহের মূলে বস্তু আছে। পুলিশ দেখেছে, এখানকার সামরিক তথ্য বাইরে প্রকাশ পাবার আগেই জাপানিদের কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই আশ্চর্য রহস্যের তল খোঁজবার জন্যে পুলিশ একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে। হঠাৎ সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ল। অবশ্য এজন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই, কারণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

'তারপর নিযুক্ত হল দ্বিতীয় গোয়েন্দা, আর সে-ও মারা পড়ল ওই নিউমোনিয়া রোগেই! পুলিশ কিঞ্চিৎ চমকিত হল বটে, কিন্তু তখনও ভাবলে এ হচ্ছে দৈবের খেলা। তারপর তৃতীয় গোয়েন্দার প্রবেশ এবং ওই একই রোগে আক্রান্ত হয়ে সে-ও করলে ইহলোক থেকে প্রস্থান! পুলিশ এবার দস্তুরমতো ভীত হয়ে উঠেছে, কারণ এরকম অসম্ভব দৈব বিড়ম্বনা কল্পনাও করা যায় না। পুলিশ তাই তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসেছে সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যে। এই মামলায় নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত হলেই সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ে কেন? ভিন্ন ভিন্ন রোগে তারা মারা পড়লে হয়তো পুলিশ এতটা সজাগ হয়ে উঠত না—যদিও একই মামলায় নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপর-উপরি তিন-তিন গোয়েন্দার মারা পড়াটাও হচ্ছে যথেষ্ট সন্দেহজনক।

'বুঝে দ্যাখো নারায়ণ, এইবারে এই মামলায় নিযুক্ত হয়েই আমরা দৈবক্রমে একখানা অদ্ভুত পত্র হস্তগত করেছি। পত্রলেখক তার এক চরের উপরে আদেশ দিয়েছে, পুলিশ কোনও নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে কি না সে যেন সেই সন্ধান নেয়। এখন তোমার কী মনে হয়? অন্ধকারের ভিতরে একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছ কি?'

টেবিলের উপরে সশব্দে মুষ্টি প্রহার করে নারায়ণ বলে উঠল, 'ঠিক! ঠিক! এইবারে আমারও চোখ ফুটল।'

নরেন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'শেষ পর্যন্ত তোমার চোখ ফুটেছে দেখে পরম আশ্বস্ত হলুম। হ্যাঁ! শচীনবাবু আবার একজন নতুন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়েছেন—আর সে হচ্ছি আমি। তারপরে

ভাববার কথা হচ্ছে, রাস্তা থেকে আজই একটি উদাসীন ভদ্রলোক দেখে গিয়েছে, আমার সঙ্গে শচীনবাবুর মিলন। তাই সে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্যে টালিগঞ্জের পত্রলেখকের সেই তিন নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে কী পরামর্শ হয়েছে, আমরা তা জানি না। তবে এইটুকু অনুমান করতে পারি, রিপোর্ট পেয়ে ছোটোবাবু নিশ্চয়ই খুব চনমনে হয়ে উঠবেন। অতএব এখন আমাদের যে-কোনও ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।'

বিপুল উৎসাহে একটি লম্ফত্যাগ করে সোফার ওপাশ থেকে এপাশে এসে পড়ে নারায়ণ বলে উঠল, 'ফুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে! হ্যাঁ বন্ধু, আমি চাই ঘটনা, ঘটনা—ঘটনার ঘোর ঘটা! মুহূর্তে নতুন নতুন বিপদ আর বিস্ময় আর উত্তেজনা! আমার এ দেহ হচ্ছে দস্তুরমতো পুরুষের দেহ, সোফায় নরম কুশনে হেলান দিয়ে বসে থাকবার জন্যে ভগবান এ দেহ নির্মাণ করেননি।'

নরেন কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়ে বললে, 'এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, এই ছোটোবাবুটির নাম আর পরিচয় কী? দলের মধ্যে সে কোন স্থান দখল করে বসে আছে? সেই কি দলপতি, না ছোটোবাবুর উপরেও মেজোবাবু আর বড়োবাবু আছেন? এই দলটি চালনা করছে কোন মস্তিষ্ক? যদি তারা পঞ্চমবাহিনীর লোকই হয়, তাহলে কোন উপায়ে শত্রুদের সঙ্গে খবর আদান-প্রদান করছে? প্রশ্ন হচ্ছে অনেকগুলি, তাড়াতাড়ি সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে মনে করি না।'

নারায়ণ বললে, 'কোনও ভাবনা নেই। ইচ্ছা করলেই আমরা আজই সব প্রশ্নের উত্তর আদায় করতে পারি।'

—'কেমন করে?'

—'চলো, আজই সেই ব্যারাকবাড়ি থেকে নৃপেশকে ক্যাঁক করে ধরে আনি।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী, নৃপেশ যদি সহজে বশ না মানে, আমার দু-চারটে কিল আর চড় খেলেই মনের কথা উগরে দেবার পথ পাবে না। এক-একটি কিলে তার এক-একখানা হাড় আমি গুঁড়ো করে দেব।'

নরেন মৃদু হেসে বললে, 'তোমাকে কেবল হাতির মতন দেখতে নয়, তুমি হচ্ছে হস্তীমূর্খ! নৃপেশ যদি পাকা অপরাধী হয়, তাহলে তুমি কিল মেরে তার মুখ ভেঙে দিলেও সে পেটের কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। আর নৃপেশকে আমরা ধরে আনবই বা কোন আইনের জোরে? তাকে আইনের ফাঁদে ফেলা যায়, তার এমন কোনও অপরাধের কথা এখনও আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। বরং আইনত অপরাধ করেছি আমরাই, কারণ তার পিছনে পকেটমার লেলিয়ে দিয়ে আমরা তার পকেটে যা ছিল সব হস্তগত করেছি।'

নারায়ণ চোখ ও ভুরু নাচিয়ে বললে, 'সত্যি কথাই তো। এতক্ষণ আমার এ খেয়ালটা হয়নি। তবে তুমি কী করতে চাও?'

—'আপাতত নৃপেশের উপরে কড়া পাহারা রাখতে চাই। গোপনে তার পিছনে লেগে থাকলে শত্রুদের আরও অনেক খবর পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের দুঃখিত হবার কোনওই কারণ নেই, এক দিনেই আমরা যতটা জানতে পেরেছি সেটা অভাবিত সৌভাগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। আর এর মূলে আছে প্রধানত আমাদের পকেটমার-চ্যালা শ্রীমান বিজয়চন্দ্র। ভাগ্যে সে পকেট কেটেছিল! এজন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলেও অন্যায় হবে না।'

নারায়ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'বিজয়ছোকরাকে কালই আমি নিমন্ত্রণ করে ভালো করে এক পেট খাইয়ে দেব!'

নরেন ঘাড় নেড়ে বললে, 'অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে। পাপীদের উৎসাহিত করলে বিপদের ভয় আছে।'

ঠিক এই সময়ে বাহির থেকে সাড়া এল, 'হুজুর, ভেতরে যেতে পারি কি?'

—'কে?'

—'আজ্ঞে, আমি নসীরাম!'

—'ভেতরে এসো। তুমি আবার কী বলতে চাও?'

নসীরাম ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললে, 'হুজুর, বিজুর কথায় আজ আমি ব্যারাকবাড়ির একটা লোকের ওপর নজর রেখেছিলুম। বিজু চলে আসবার পরই লোকটা হন্তদন্তের মতো বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে এসেই একখানা ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় চলে গেল। সেখানে আর কোনও ট্যাক্সি ছিল না বলে আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না। আমি সেইখানেই চুপ করে বুড়ি ছুঁয়ে বসে রইলুম। তারপর বিজু আবার ফিরে এল। আর সেই লোকটাও খানিকক্ষণ হল ট্যাক্সিতে চড়েই আবার ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারে সে একলা নয়, তার সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে। এই খবরটা আপনাদের জানাবার জন্যেই বিজু আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে। এখন আমাদের ওপর কী হুকুম হয়?'

'তোমরা দুজনেই সেই বাড়িখানার ওপরে পাহারা দাও গে যাও। খুব সাবধান, লোকটাকে এবার আর এক মিনিটের জন্যেও চোখের আড়ালে যেতে দিয়ো না।'

নসীরাম ভক্তিভরে আবার একটি নমস্কার ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে, 'নারায়ণ, ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছ কি?'

—'আবার আমাকে আন্দাজ করতে বলছ? আমি আন্দাজ-ফান্দাজের ধার ধারি না।'

—'কিন্তু, একটা শিশুও এ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। নৃপেশ বাড়িতে ঢুকেই নিজের কাটা পকেট আবিষ্কার করে ফেলেছে আর তখনই খবর দেবার জন্যে ট্যাক্সিতে চড়ে সেই তিন নম্বরের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছে। তিন নম্বরের বাসিন্দারা খবর শুনে বোধ হয় যথেষ্ট বিচলিত হয়েছে। কিন্তু কেন তারা এতটা বিচলিত হল? তার কারণ কি এই কাচের চুড়ি, না এই চিঠিখানা? তাদের চোখে এ দুটোর মধ্যে কোনটা হচ্ছে বেশি মূল্যবান? আর নৃপেশের সঙ্গে যারা এসেছে তারা কে? একসঙ্গে ছোটোবাবু আর বড়োবাবু নয় তো?'

নারায়ণ মস্ত একটা হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে বললে, 'ওসব ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আমার উদরে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।'

নরেন রাগ করে বললে, 'তোমার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তুমি রসাতলে গমন করো। আমি আজ একেবারেই আহার করব না।'

নারায়ণ চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'আহার করবে না মানে? উপোস করে থাকবে?'

—'ঠিক তাই। তোমাকে তো কতবারই বলেছি, পেট ভরা থাকলে মস্তিষ্কের ধারও ভোঁতা হয়ে থাকে? শূন্য উদর মস্তিষ্ককে দান করে অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি।'

নারায়ণ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'চুলোয় যাক তোমার চিন্তাশক্তি! আমি চাই বাহুবল, আমি চাই পেট-ভরা খোরাক!'

তৃতীয়
চিঠি আর চুণি

সেই রাত্রির কথাই বলছি।

নারায়ণ উদরস্থ খাদ্যের ভারে কিঞ্চিৎ কাবু হয়ে নিজের শয়নগৃহের ভিতরে অদৃশ্য হল।

নরেন খানিকক্ষণ দোতলার বারান্দার উপরে পায়চারি করে বেড়ালে। তার মুখ দেখেই বোঝা যায়, সে যেন মনে মনে কী চিন্তা করছে। মিনিট কয়েক পরে সে আবার নীচে নেমে গেল। তার বাড়ির পিছন দিকে ছিল ছোটো-বড়ো গাছে ভরা খানিকটা জায়গা। তারা স্থানটিকে বাগান বলেই ডাকত, কিন্তু ও-জায়গাটি 'বাগান' আখ্যা লাভ করবার যোগ্য নয়। সেখানে ফুলগাছ চোখে পড়ত না একটাও, কিন্তু আগাছার ছড়াছড়ি ছিল যত্রতত্র।

নরেন কোথা থেকে একটা বড়ো চাঙাড়ি সংগ্রহ করে এনে তাদের বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। জমির সর্বত্রই পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতা। সেই শুকনো পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে চাঙাড়ির ভিতরে রাখতে লাগল। চাঙাড়ি পূর্ণ হলে পর সেটা নিয়ে আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপরে প্রত্যেক সিঁড়ির উপরে সেই শুকনো পাতাগুলো ছড়াতে ছড়াতে নরেন তাদের দ্বিতল বাড়ির ছাদ পর্যন্ত গিয়ে উঠল। চাঙাড়ি খালি হলে পর সে আবার নেমে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

নরেন আর নারায়ণ পাশাপাশি বাস করত দুটি ঘরে। মাঝখানের একটি দরজা দিয়ে তারা পরস্পরের ঘরে আনাগোনা করতে পারত।

নরেন নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে নারায়ণের বিরাট নাসিকার বিকট গর্জন। সে আগে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে, তারপর মাঝের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে নারায়ণের ঘরে।

এর মধ্যেই নারায়ণ মুখব্যাদান করে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে। তার নিদ্রাকে নাম দেওয়া যেতে পারে 'ইচ্ছানিদ্রা'—অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই সে একেবারে নিদ্রা-সাগরে তলিয়ে যেতে পারত।

নরেন সেই ঘরের বাইরে যাবার দরজাটির খিল ভিতর থেকে খুলে রাখলে। আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর একখানা ইজিচেয়ার টেনে এনে এমন জায়গায় রাখলে, যাতে করে সেই চেয়ারে বসে মাঝের দরজা দিয়ে নারায়ণের শয্যাটি ভালো করে দেখা যায়।

নারায়ণের ঘর অন্ধকার। নরেন নিজের ঘরের আলোও নিবিয়ে দিলে। তারপর ইজিচেয়ারের উপরে বসে হেলান দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় স্থির হয়ে রইল।

রাত্রি ক্রমে বাড়ছে, শহরের নানান রকম গোলমাল ক্রমেই কমে আসছে। আরও খানিকক্ষণ কাটল। কলকাতার মুখ প্রায় বোবা হয়ে এল। টুং, টুং, টুং! ঘরের ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত এখন তিনটে। শহর একেবারে নিসাড়। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যায়, হঠাৎ একটা প্যাঁচা বা কুকুরের চিৎকার। আকাশে বাতাসে বাজছে যেন ঝিম ঝিম ঝিম নীরবতার বীণা। এবং তারই মধ্যে ফাঁক পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভালো করে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ঘরের ঘড়ির টিক টিক টিক শব্দ।

ঘরে ঘরে ঘুমোচ্ছে শহরের জীবরা। কিন্তু নরেন তখনও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত—তার চক্ষে ঘুমের এতটুকু আমেজ নেই।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। নরেন যখন ভাবছে আজকের মতো অনিদ্রাকে বরণ করা বোধ হয় ব্যর্থ

হয়ে গেল, তখন হঠাৎ সে সচমকে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল!

তার কান যা শুনতে চাইছিল, শুনতে পেয়েছে তা! এক রকম শব্দ হচ্ছে—মড় মড়, মড় মড়! কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে দোতলার ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে!

উৎকর্ণ হয়ে নরেন বসে রইল পাথরের পুতুলের মতন। সিঁড়ির উপর শুকনো পাতার আর্তনাদ। তার মুখ দেখলে মনে হয়, এই পত্রমর্মর তার কানে করছে যেন মধুবৃষ্টি! অল্পক্ষণ পরে সব চুপচাপ।

তারপরেই শোনা গেল একটা কর্কশ শব্দ—যেন কেউ ধীরে ধীরে ঠেলে ও-ঘরের একটা দরজা খুলছে এবং আওয়াজ হচ্ছে দরজার তৈলহীন কব্জা থেকে। নরেন জানত, ও-ঘরের দরজা কেউ নিঃশব্দে খুলতে পারে না। তাই সে আজ নিজের হাতেই নারায়ণের ঘরের দরজার খিল খুলে রেখে এসেছে। সে আগেই অনুমান করেছিল, আজ এখানে কারুর ভয়াবহ আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, তার অনুমান মিথ্যা নয়।

নরেন উঠে দাঁড়াল এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে নিজের ঘরের ইলেকট্রিক সুইচের উপরে আঙুল রাখলে। তার ডান হাতে একটি ছোট্ট রিভলভার। তারপর সে শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা তখনও কার হাতের ঠেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তারপর দরজা হল নীরব। নরেন আরও আধ মিনিট অপেক্ষা করলে, তারপর হঠাৎ টিপে দিলে তার ঘরের আলোর সুইচটা। এ-ঘরের আলোটা ছিল এমন জায়গায় যে, সেটা জ্বললেই তার খানিকটা শিখা মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে।

আলো জ্বেলেই নরেন দেখলে, নারায়ণের শয্যাশায়ী দেহের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একটা মূর্তি এবং তার উদ্যত হাতে একখানা মস্ত চকচকে ছোরা!

পরমুহূর্তেই ছোরাখানা বোধ হয় নারায়ণের বক্ষ ভেদ করত কিন্তু নরেন হত্যাকারীকে অস্ত্র ব্যবহারের কোনওই সুযোগ দিলে না, লক্ষ স্থির না করেই সে নিজের রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলে!

গুলিটা গিয়ে লাগল ও-ঘরের দেওয়ালের উপরে। সচকিত মূর্তিটা হল বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য! এবং রিভলভারের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল নারায়ণের। প্রথমটা সে হতভম্বের মতন চারিধারে তাকাতে লাগল। তারপর খাটের নীচে লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, 'কী হয়েছে নরেন? তুমি রিভলভার ছুড়লে কেন?'

নরেন শান্ত ভাবে সহজ স্বরে বললে, 'তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।'

—'সে আবার কী?'

—'আর একটু হলেই খুনির ছোরা বিঁধত তোমার বুকে!'

—'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

—'বোঝাবুঝি পরে হবে—এখন শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো! সিঁড়ির ওপরে পাতার শব্দ শুনেই বুঝেছি, খুনি আবার ছাতের দিকে উঠে গিয়েছে।' বলেই নরেন বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল এবং নারায়ণও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

ছাদে উঠে নরেন পকেট থেকে টর্চ বার করে চারিদিকে আলোক নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু কোথাও কারুকে দেখা গেল না।

নরেন বললে, 'বুঝেছি। এইদিকে এসো।' সে দৌড়ে ছাদের একদিকে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে আলো ফেলে দেখলে, ছাদের জল বেরুবার লোহার পাইপ ধরে একটা মূর্তি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

নারায়ণও মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তারপরেই প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে সে-ও তাড়াতাড়ি পাইপ ধরে নীচের দিকে নামতে গেল। নরেন টপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'করো কী নারায়ণ, করো কী! তোমার ওই বিপুল দেহের ভার এই তুচ্ছ পাইপটা কি সহ্য করতে পারবে? তুমি কি পাগল হয়েছ?'

তার কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার উপরে জাগল বিষম এক আর্তনাদ! কে চেঁচিয়ে উঠল— 'খুন করলে, আমাকে খুন করলে! হুজুর, আমাকে রক্ষা করুন!'

—'সর্বনাশ, এ যে বিজয়ের গলা!' বলেই নরেন আবার ছাদের আলসের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখবার চেষ্টা করলে!

কিন্তু নিশ্চন্দ্র আকাশ ও ব্ল্যাকআউটের রাত্রি। দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় রন্ধ্রহীন অন্ধকার। তবু যাতে কারুর গায়ে না লাগে এমন ভাবে নরেন বার-দুয়েক রিভলভার ছুড়লে—হত্যাকারীকে ভয় দেখাবার জন্যে। তারপর টর্চের আলো রাস্তার উপরে ফেলে দেখলে, ধুলোয় শুয়ে ছটফট করছে একটা মূর্তি। সেখানে আর কারুকে দেখা গেল না, হত্যাকারী নিশ্চয়ই পলায়ন করেছে।

নরেন বললে, 'নীচে নেমে চলো নারায়ণ, দেখি বিজয়ের আবার কী হল!'

দুজনে দ্রুতপদে সেই শুষ্কপর্ণে পরিপূর্ণ সোপানকে শব্দিত করতে করতে নেমে এল একতলায়। তারপর সদর দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

বিজয়ের ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, 'হুজুর, আর আমি বাঁচব না!'

নরেন বললে, 'নারায়ণ, টর্চটা ধরো তো, আমি একবার বিজয়কে পরীক্ষা করে দেখি।'

নরেন টর্চটা নিয়ে বিজয়ের উপরে আলো ফেলে দেখলে, তার মুখ যন্ত্রণাবিকৃত এবং তার কাপড়-চোপড়ে রক্তের দাগ!

নরেন লক্ষ করলে বিজয় ছোরার ঘা খেয়েছে কাঁধের উপরে। অল্পক্ষণ ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে সে বললে, 'ভয় নেই বিজয়, এ-যাত্রা তোমাকে মরতে হবে না। তোমার আঘাত সাংঘাতিক নয়।'

বিজয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত স্বরে বললে, 'ঠিক বলছেন হুজুর? আপনি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছেন না তো?'

—'না বিজয়, আমার কথা বিশ্বাস করো। কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

বিজয় আস্তে আস্তে উঠে বসে বললে, 'আপনার হুকুম তামিল করবার জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।'

—'সংক্ষেপে সব কথা গুছিয়ে বলো।'

—'হুজুর বলেছিলেন, নৃপেশকে আমি যেন একবারও চোখের আড়াল না করি। আমি সেই ব্যারাকবাড়ির দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলুম। হঠাৎ দেখলুম অনেক রাতে দুটো লোক ছায়ার মতন সেই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন চারিদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, তারা যে কারা কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপরই একটা লোক সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, আর সেই আলোতে দেখা গেল নৃপেশের মুখখানা। তারপর তারা অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল, কেবল শোনা যেতে লাগল তাদের পায়ের জুতোর শব্দ। সেই শব্দ শুনতে শুনতেই আমি তাদের পিছু নিলুম, এপথ-ওপথ ঘুরে শেষটা তারা এসে দাঁড়াল আপনাদের এই বাড়ির কাছে। তারপর তাদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। তারা যে অন্ধকারে কী করছে না করছে কিছুই বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলুম। এগুতে ভরসা হল না, পাছে তাদের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ি।

এমনইভাবে খানিকক্ষণ কাটল। তারপর হঠাৎ বাড়ির ভিতরে শুনলুম রিভলভারের আওয়াজ। আমি তো ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম, ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারলুম না। তার খানিক পরেই দেখলুম ছাতের ধারে জ্বলে উঠেছে আপনার টর্চের আলো আর জলের নল ধরে তড়বড় করে নীচের দিকে নেমে আসছে একটা লোক। রাস্তায় পড়েই লোকটা ছুটতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশ হল। সে যেই আমার সামনে এসে পড়ল, আমি তখনই তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলুম। খানিকক্ষণ ঝটাপটির পরেই লোকটা আমাকে ছুরি মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে আবার পালিয়ে গেল।'

নারায়ণ ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে বললে, 'ব্যাটা যদি পড়ত আমার হাতে, তাহলে ছোরাসুদ্ধ হাতখানা ঢুকিয়ে দিতুম তার পেটের ভিতরে! একেবারে কীচক-বধ করে ছাড়তুম!'

নরেন একটু চুপ করে থেকে বললে, 'বিজয়, তুমি ঠিক দেখেছ তো, আমার বাড়ির সামনে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল?'

বিজয় বললে, 'অন্ধকারে ঠিক দেখেছি কি না কী করে বলব হুজুর? তবে এইটুকু শুনেছি, দু-জোড়া পায়ের শব্দ আপনার বাড়ির সামনে এসেই থেমে গিয়েছিল।'

নরেন ভাবতে ভাবতে বললে, 'তাহলে আর একটা লোক কোথায় গেল?'

নারায়ণ বললে, 'ওসব কথা পরে ভাবলেও চলবে। বিজয়ের ক্ষতস্থান দিয়ে এখনও রক্ত বেরুচ্ছে, আগে ও-জায়গাটা ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখা দরকার।' বলেই সে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের দেহ পথ থেকে তুলে নিলে শিশুর মতো।

বিজয়ের ক্ষতস্থান ধুয়ে ও বেঁধে দিয়ে একটা ঘরে তাকে সে-রাতের মতো শুইয়ে রেখে তারা দুজনে আবার উপরে গিয়ে উঠল।

নরেন নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলে, চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলার দৃশ্য এবং তার বড়ো টেবিলের দেরাজগুলো সব খোলা! সে ছুটে গিয়ে একটা খোলা দেরাজের ভিতরে হস্ত সঞ্চালন করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'নারায়ণ, আমার ঘরেও চোর এসেছিল।'

—'সে কী! কখন এল?'

—'খুব সম্ভব একটা লোক নল বেয়ে উঠেছিল ছাতের উপরে আর একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল পাহারা দেবার জন্যে। প্রথম লোকটা বিজয়কে ছোরা মেরে পালিয়ে যাবার পর আমরা যখন সদর খুলে রাস্তায় আসি, দ্বিতীয় লোকটা সেই সময়ে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকেছিল। তারপর আমরাও রইলুম বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত, আর সে-ও আমার ঘরে ঢুকে কাজ হাসিল করে আবার দিলে লম্বা! নারায়ণ, এ হচ্ছে অসম্ভব-রকম দুঃসাহসী চোর! চোর যে কে, তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি।'

—'কে সে?'

—'নৃপেশ ছাড়া আর কেউ নয়।'

—'কেমন করে জানলে?'

—'বিজয় স্বচক্ষে দেশলাইয়ের আলোতে দেখেছে নৃপেশের মুখ। কিন্তু আমি দেখেছি ছোরা নিয়ে তোমার বুকের উপরে যে-লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, সে নৃপেশ নয়। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে-লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল সেই-ই হচ্ছে নৃপেশ।'

—'কিন্তু সে কী চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে?'

নরেন চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'সেই কাচের চুড়ি আর চিঠিখানা।'

নারায়ণ খুশি হয়ে বললে, 'বাঁচা গেল! কাচের চুড়ি আর চিঠি নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই! আমি ভেবেছিলুম, চোর ব্যাটা বুঝি কোনও দামি জিনিস নিয়ে সরে পড়েছে।'

চেয়ারের হাতলের উপরে আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত করতে করতে নরেন বললে, 'উঁহু, তোমার কথা মানতে পারলুম না। ও-দুটো জিনিস নিশ্চয়ই মূল্যবান! নইলে ও-দুটোর জন্যে ওদের এতটা মাথাব্যথা হবে কেন? হয়তো ওই চুড়ি আর চিঠি যে আমাদের হাতেই পড়েছে, ওরা নিশ্চিতরূপে সেকথা জানত না। হয়তো ওরা এসেছিল আমাদের পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যে, তারপর দৈবগতিকে পথ খোলা পেয়ে নৃপেশ বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখতে এসেছিল তার সন্দেহ সত্য কি না—অর্থাৎ চুড়ি আর চিঠি আমাদের কাছেই আছে কি না।'

—'তাহলে তুমি জানতে যে ওরা আজ এখানে আসবে?'

—'জানতুম বলা ঠিক হবে না, তবে আন্দাজ করেছিলুম আজকালের মধ্যেই ওদের এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে।'

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, 'আশ্চর্য তোমার আন্দাজ! এরকম আন্দাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

নরেন দৃঢ় স্বরে বললে, 'নিশ্চয়ই পাওয়া যায়! এইটুকু মনে রেখো, এরা সাধারণ অপরাধী নয়। এরা হচ্ছে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। বাংলা দেশের ভিতরে এরা একটা প্রকাণ্ড দল গঠন করেছে। এরা জানে, খুব গোপনে আর তাড়াতাড়ি কাজ করতে না পারলে ধরা পড়তে হবে, আর ধরা পড়লে সকলকেই চড়তে হবে ফাঁসিকাঠে। আমার দৃঢ় ধারণা, ওই চিঠি আর চুড়ির ভিতরেই এই মামলাটার সমস্ত রহস্যের চাবি লুকানো আছে। ওরা যে-মুহূর্তে সন্দেহ করতে পারলে যে, এই মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছি আমরা আর মামলার ভার পেয়েই আমরা হস্তগত করেছি ওদের বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র, সেই মুহূর্তেই স্থির করে ফেললে, ভিতরের কথা প্রকাশ পাবার আগেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হয় আমাদের পথ থেকে সরাতে নয় চিঠি আর চুড়ি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ওদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—চিঠি আর চুড়ি গিয়েছে আবার ওদের পকেটেই। নারায়ণ, এখন বুঝতে পারছ, কেন আমি আন্দাজ করেছিলুম যে, আমাদের বাড়িতে আসতে ওরা বিলম্ব করবে না?'

—'হুঁ, তুমি বুঝিয়ে দিলে, তাই বুঝলুম। কিন্তু আর একটা ব্যাপার এখনও বোঝা যাচ্ছে না। চিঠিখানা আমি পড়ে দেখেছি, কিন্তু ওই চুড়ির ভিতরে কী আছে সেটা তুমি জানতে পেরেছ কি?'

—'পরীক্ষা করে জানতে পেরেছি বই কি!'

—'কী জেনেছ শুনি?'

রহস্যময় হাসি হেসে নরেন বললে, 'এখনও তোমাকে বলবার সময় হয়নি।'

নারায়ণ চটে বললে, 'তুমি চুলোয় যাও!'

চতুর্থ

ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ

দিন-তিনেক পরেকার কথা। ডন-বৈঠক দেওয়া এবং মুগুর ভাঁজা শেষ করে নারায়ণ বারান্দার উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে হাঁপ ছাড়ছিল। এমন সময়ে নরেনের আবির্ভাব। নারায়ণ ভুরু কুঁচকে

বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'আজ তিন দিন ধরে দেখছি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একলাই হাওয়া খেতে যাচ্ছ।'

নরেন বললে, 'হাওয়া খেতে নয় ভাই, কিছু কিছু খোঁজখবর নিতে।'

—'কীসের খোঁজখবর? পঞ্চমবাহিনীর?'

—'তা ছাড়া আবার কী।'

নারায়ণ মেঝের উপরে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'না, না, এসব ব্যাপারে তোমার একলা যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না!'

—'কেন?'

—'ওরা হচ্ছে ভয়ানক বিপজ্জনক লোক! একলা ওদের হাতে পড়লে কিছুতেই তুমি আর বেঁচে ফিরে আসবে না! তুমি যতবড়ো চালাক লোকই হও না কেন, হাতাহাতির সময় তুমি হচ্ছ একটি সামান্য শিশু! তোমার রক্ষাকর্তা হতে পারি একমাত্র আমি। এর পরে আমাকে ছেড়ে তুমি রাস্তায় এক পা বেরুতে পারবে না।'

নরেন হেসে বললে, 'তথাস্তু! কিন্তু ভায়া, আর একটা কথাও ভেবে রেখো। যে-দলের পিছনে আমরা লেগেছি, সে-দলে গুন্ডা আর ডাকাতও থাকতে পারে, আর সময়ে সময়ে তারা গায়ের জোরে বা সাধারণ অস্ত্র চালিয়েও নরহত্যা করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দলপতির নরহত্যার আসল পদ্ধতি হচ্ছে আরও সূক্ষ্ম। সেখানে তোমারও গায়ের জোর কোনও কাজেই আসবে না।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। এই রকমই আমি আন্দাজ করছি।'

—'নরেন, তোমার আন্দাজের ধাক্কা সহ্য করা ক্রমেই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। তোমাকে নিয়ে আর আমি পারব না, তুমি স্তব্ধ হও!'

—'উত্তম। তোমাকে একটা খবর দিয়েই আমি মৌনব্রত অবলম্বন করব।'

—'কী খবর?'

বারান্দার কোণ থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে নারায়ণের সামনে বসে পড়ে নরেন বললে, 'তুমি জানো, এই মামলায় আমার আগে আরও তিনজন গোয়েন্দা একই নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়েছে? আমি খবর নিয়ে জানলুম যে, ওই তিন গোয়েন্দারই চিকিৎসার ভার পেয়েছিল একই ডাক্তার।'

সামনের একখানা রেকাবি থেকে এক মুঠো ভিজে ছোলা তুলে নিয়ে নারায়ণ নিজের বদন-গহ্বরে নিক্ষেপ করলে। তারপর চর্বণ করতে করতে বললে, 'তাতে হয়েছে কী?'

—'হয়তো বিশেষ কিছুই নয়। ডাক্তারটির নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ, বিলাত ফেরত। ডাক্তারটি একবার জাপানেও বেড়িয়ে এসেছেন। পুলিশ মহলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাই পুলিশ বিভাগের অনেকেই অসুখে পড়লে তাঁকেই আহ্বান করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে একটি ব্যাপার।'

—'কী?'

—'একই নিউমোনিয়া রোগে তিন গোয়েন্দার মৃত্যু, আর একই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষের চিকিৎসা।'

নারায়ণ একটু ভেবে বোঝবার চেষ্টা করে বললে, 'আমি তো এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো কলকাতায় নিউমোনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে।'

—'না, তা হয়নি। সে খোঁজও আমি নিয়েছি। কলকাতায় এখন নিউমোনিয়া রোগের বাড়াবাড়ি

নেই। আর বাড়াবাড়ি হলেও পরে পরে একই মামলায় নিযুক্ত তিনজন গোয়েন্দাই যদি একই ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে নিউমোনিয়ায় মারা পড়ে, তাহলে শুনতে যেন কেমন কেমন লাগে না?'

নারায়ণ হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'বন্ধু, তুমি একটি মূর্তিমান হেঁয়ালি। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'বুঝেও কাজ নেই। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসা হচ্ছে ডাহা বোকামি।' উঠে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলতে বলতে নরেন নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সে জামাকাপড় ছেড়ে সবে বসেছে, এমন সময় এসে হাজির হলেন শচীনবাবু। আসন গ্রহণ করবার আগেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মামলাটার কোনও হদিশ করতে পারলেন?'

নরেন বললে, 'কী যে বলেন! এতবড়ো একটা মামলা, আপনাদের মতন মস্ত মস্ত সব মাথা থাকতেও তিন বেচারা গোয়েন্দার প্রাণ গেল, আর আমি এর মধ্যেই কিনারায় গিয়ে পৌঁছোব? তাও কখনও হয়!'

শচীনবাবু একখানা আসনের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ভগবান সহায় থাকলে সবই হতে পারে নরেনবাবু! আমরা এখনও মামলাটার ঠিক কিনারা না করতে পারলেও ভাগ্যগুণে হঠাৎ দু-একটা গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।'

জিজ্ঞাসু চোখে শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে নরেন বললে, 'হঠাৎ?'

—'হ্যাঁ, হঠাৎ। একরকম দৈবগতিকে আর কী! ব্যাপারটা শুনবেন?'

—'নিশ্চয়ই!'

—'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। আজ সকালে আমার এক বন্ধুকে ফোন করে শুনলুম অচেনা দুজন লোকের গলা! অর্থাৎ cross connection আর কী! প্রথম ব্যক্তি বলছে, 'ছোটোবাবু, নর-নারায়ণকে আপনি বোধহয় এখনও ভালো করে চেনেননি। তারা যে মামলার ভার হাতে নেয়, তার শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ে না।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'নৃপেশ, থো করো তোমার নর-নারায়ণের কথা! আমিও তাদের শেষ না করে ছাড়ব না।' নৃপেশ নামধারী ব্যক্তি বললে, 'তাহলে আমার উপরে কী হুকুম হয় বলুন?' সেই ছোটোবাবু বললে, 'আসছে অমাবস্যার রাত্রে ঠিক বারোটার সময় চার নম্বরের বাড়িতে একটা বড়ো পরামর্শ-সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সভায় আমাদের দলের সবাইকে যোগ দিতে হবে। তোমরাও যেন ভুলো না।' নৃপেশ বললে, 'আমাদের বড়োবাবুও কি সেখানে হাজির থাকবেন?' ছোটোবাবু বললে, 'নিশ্চয়ই। তিনিই তো সভা আহ্বান করেছেন আর সভাপতি হবেন তিনিই।' নৃপেশ খুশি-গলায় বললে, 'তাহলে এতদিন পরে বড়োবাবুকে আমরা সামনাসামনি দেখতে পাব?' ছোটোবাবু বললে, 'মূর্খ! আমি ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ বড়োবাবুর মুখ দেখেনি, কখনও দেখতেও পাবে না। বড়োবাবু সভায় আসবেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ ঢাকা থাকবে কালো কাপড়ের মুখোশে। খালি বড়োবাবু নয়, তোমাকে আমাকে আর অন্য সবাইকেও সেদিনকার সভায় যেতে হবে মুখোশে মুখ ঢেকে। যথাসময়ে তোমাদের সবাইকেই এক একটি মুখোশ উপহার দেওয়া হবে।' নৃপেশ বললে, 'নিজেদের আস্তানায় এতটা লুকোচুরির কারণ কী ছোটোবাবু?' জবাব হল, 'নৃপেশ, আমরা যে কাজে নেমেছি, তাতে পদে পদে মৃত্যু-ভয়। আমাদের দলে লোক আছে অনেক। ভয়ে বা অর্থলোভে বা বাধ্য হয়ে পরে হয়তো কেউ বিশ্বাসঘাতকও হতে পারে। সেইজন্যেই এই সাবধানতা। বড়োবাবু চান না যে, তাঁর দলের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তোমরা আসবে, কেউ কারুকে চিনবে না, অথচ এক জায়গায় বসে বড়োবাবুর সমস্ত উপদেশ শুনতে পাবে।' নৃপেশ বললে, 'বড়োবাবুর হুকুম

তো আপনার মুখ থেকে আমরা সর্বদা শুনতে পাই! তবে হঠাৎ এতবড়ো সভার আয়োজন কেন?' ছোটোবাবু বললে, 'নৃপেশ, তুমি জানো, বড়োবাবুর কি আমার সামনে তোমাদের কারুর কোনওই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তুমি আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক বলেই তোমার এই মুখরতা ক্ষমা করলুম। সভা আহ্বান করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বন্ধু জাপানিরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে, খবরের কাগজে একথা অবশ্যই তুমি পাঠ করেছ। জাপানিরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই আমাদের কী করতে হবে জানো? তখন আমাদের' ... এইখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে cross connection-এর পালা হঠাৎ সাঙ্গ হয়ে গেল। নরেনবাবু, সবটা শুনতে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলুম বটে, তবু যতটুকু শুনেছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়?'

ইতিমধ্যে নারায়ণ ঘরের মধ্যে এসে হাঁ করে শচীনবাবুর কথাগুলো যেন ভক্ষণ করছিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই যথেষ্ট! না, যথেষ্টরও বেশি!'

নরেন ভাবহীন মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে, 'আসছে অমাবস্যার রাত বারোটার সময়। তার মানে, ঠিক আর সাত দিন পরে। চার নম্বরের বাড়ি। চার নম্বরের বাড়ির কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ঠিকানা কোথায়?'

শচীনবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'চার নম্বরের বাড়ির কথা আপনারাও জানেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। খালি চার নম্বরের নয়, তিন নম্বরের বাড়ির কথাও জানি—তার ঠিকানাও আমাদের অজানা নেই।'

—'তাহলে এ মামলার ভিতরে আপনারাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন? কিছু কিছু সূত্রও পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি বটে। ওই নৃপেশ বাবাজির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ছোটোবাবুর নামও আমরা শুনেছি, আর বড়োবাবুরও অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করেছি।'

শচীনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বটে, বটে, বটে! অথচ এমন সব জবর খবর এখনও আমাকে দেননি?'

—'এখনও দেবার সময় হয়নি শচীনবাবু! এতক্ষণ আমরা দুজনে ছিলুম ত্র্যাঙ্ক নাটকের প্রথম অঙ্কে। আপনার cross connection-এর মহিমায় এখন আমরা এসে পড়েছি দ্বিতীয় অঙ্কে। এইবারে আশা করছি তৃতীয় অঙ্কের শেষে গিয়ে যবনিকা ফেলতে আর আমাদের বেশি দেরি লাগবে না। কী বলো হে নারায়ণ?'

নারায়ণ মস্তকান্দোলন করে বললে, 'ধেৎ, আমি কিছুই বলি না! যতক্ষণ না ব্যাটাদের মুণ্ডুগুলো হাতের কাছে পাই, ততক্ষণ আমি একেবারে বোবা হয়ে থাকতে চাই! আমি কথার মানুষ নই, আমি হচ্ছি কাজের মানুষ!'

শচীনবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, নরেন আচম্বিতে চেয়ারের উপরে হেলে পড়ে নিজের বুকের উপরে হাত রেখে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বলে উঠল, 'উঃ!'

শচীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে নরেনবাবু? অমন করছেন কেন?'

নরেন দুই চোখ মুদে ক্ষীণ স্বরে বললে, 'কেন জানি না, বোধহয় আমার বিষম সর্দি লেগেছে। বুকে দারুণ ব্যথা। মাঝে মাঝে যাতনা আর সহ্য করতে পারছি না।'

নারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কই নরেন, তোমার অসুখের কথা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি?'

নরেন তেমনি ভাবেই বললে, 'ইচ্ছা করেই বলিনি। কারণ আমি জানি তুমি একটুতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠো। সমস্ত অসুখ আমি চেপে রাখতে চেয়েছি, অথচ আমার নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে!'

শচীনবাবুর দুই চক্ষে রীতিমতো আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, 'আ
এতই যদি অসুখ, তাহলে ডাক্তার ডাকাননি কেন?'

নরেন বললে, 'হ্যাঁ, আমার ডাক্তার ডাকাই উচিত ছিল। কিন্তু যে-সে ডাক্তারকে ডাকতে ও
ভয় হয়! আমাদের কাকে ডাকা উচিত বলুন দেখি শচীনবাবু?'

—'কেন, আমাদের চন্দ্রনাথকে ডাকুন না! পুলিশের অনেকেই বলে, তাঁর মতন ভালো ড
নাকি খুব কমই আছেন।'

—'চন্দ্রনাথবাবুকে আপনি কতদিন জানেন?'

—'বহুকাল থেকেই। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সে বর্মায় গিয়েছিল।'

—'কেন?'

—'এক ধনী রোগীর আহ্বানে। এমনি তার দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই জাপানিরা বর্মা আ
করে। তারপর থেকে কিছুদিন চন্দ্রনাথের আর কোনও খোঁজ খবর পাওয়া গেল না, আমরা অ
করলুম সে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন আবার চন্দ্রনাথের দেখা গে
আমরা সবাই তো অবাক! কিন্তু চন্দ্রনাথ বললে, জাপানিরা রেঙ্গুন দখল করবার আগেই সেখান
সে পালিয়ে যায়, তারপর বর্মা থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে অনেক বনজঙ্গল পাহাড় নদী পার
বহু বিপদ এড়িয়ে আবার ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে। তার মুখে জাপানিদের নিষ্ঠু
যেসব বর্ণনা শুনেছি তা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।'

নরেন বললে, 'চন্দ্রনাথবাবু জাপানিদের উপরে নিশ্চয়ই খুব চটে আছেন?'

—'সে কথা আর বলতে? জাপানিদের কাছে পেলে চন্দ্রনাথ বোধ হয় খালি হাতেই মাথা
ফেলে।'

—'চন্দ্রনাথবাবু বুঝি সর্বদাই জাপানিদের নিন্দা করেন?'

—'জাপানিদের নিন্দা ছাড়া তার মুখে কথাই নেই। এইটেই স্বাভাবিক। জাপানিদের জন্যে
তো কম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি! তাকে ডাকলে আপনিও তার মুখে জাপানিদের অনেক কথাই শ
পাবেন। চন্দ্রনাথকে খবর দেব কি?'

—'শচীনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে, আমারও বোধ হয় নিউমোনিয়া হবে। কলকাতায় হ
নিউমোনিয়া এবারে মারাত্মক রূপে দেখা দেবে। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার নিযুক্ত আরও
ভদ্রলোক এই রোগে মারা গিয়েছেন। আর আমি শুনেছি ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষই চিকিৎসা করে
তিনজন লোককে বাঁচাতে পারেননি। তাঁর উপরে আমার চিকিৎসার ভার দিলে কোনও বিপদ
না তো?'

—'নরেনবাবু, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত—ডাক্তাররা হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র। পরমায়ু ফ
ডাক্তাররা কারুকেই বাঁচাতে পারে না।'

নরেন অধিকতর ক্লিন্ন কণ্ঠে বললে, 'সেকথা আমিও মানি। বেশ তবে চন্দ্রবাবুকেই খবর দি

নারায়ণ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, 'না, না, না! ওই চন্দ্রবাবুকে ডাকা হতেই পারে না!
হাতে পড়ে তিনজন...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল, কারণ সে আরও কিছু বলবার আগেই
গোপনে হাত বাড়িয়ে তার পিঠে বিষম এক চিমটি কেটে দিলে।

শচীনবাবু বললেন, 'আপনি কী বলছিলেন নারায়ণবাবু?'

নারায়ণের মুখে আর রা নেই। নরেন বললে, 'নারানের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবে

তো আপনার মুখ থেকে আমরা সর্বদা শুনতে পাই! তবে হঠাৎ এতবড়ো সভার আয়োজন কেন?'
ছোটোবাবু বললে, 'নৃপেশ, তুমি জানো, বড়োবাবুর কি আমার সামনে তোমাদের কারুর কোনওই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তুমি আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক বলেই তোমার এই মুখরতা ক্ষমা করলুম। সভা আহ্বান করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বন্ধু জাপানিরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে, খবরের কাগজে একথা অবশ্যই তুমি পাঠ করেছ। জাপানিরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই আমাদের কী করতে হবে জানো? তখন আমাদের' ... এইখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে cross connection-এর পালা হঠাৎ সাঙ্গ হয়ে গেল। নরেনবাবু, সবটা শুনতে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলুম বটে, তবু যতটুকু শুনেছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়?'

ইতিমধ্যে নারায়ণ ঘরের মধ্যে এসে হাঁ করে শচীনবাবুর কথাগুলো যেন ভক্ষণ করছিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই যথেষ্ট! না, যথেষ্টরও বেশি!'

নরেন ভাবহীন মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে, 'আসছে অমাবস্যার রাত বারোটার সময়। তার মানে, ঠিক আর সাত দিন পরে। চার নম্বরের বাড়ি। চার নম্বরের বাড়ির কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ঠিকানা কোথায়?'

শচীনবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'চার নম্বরের বাড়ির কথা আপনারাও জানেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। খালি চার নম্বরের নয়, তিন নম্বরের বাড়ির কথাও জানি—তার ঠিকানাও আমাদের অজানা নেই।'

—'তাহলে এ মামলার ভিতরে আপনারাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন? কিছু কিছু সূত্রও পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি বটে। ওই নৃপেশ বাবাজির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ছোটোবাবুর নামও আমরা শুনেছি, আর বড়োবাবুরও অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করেছি।'

শচীনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বটে, বটে, বটে! অথচ এমন সব জবর খবর এখনও আমাকে দেননি?'

—'এখনও দেবার সময় হয়নি শচীনবাবু! এতক্ষণ আমরা দুজনে ছিলুম ত্র্যাঙ্ক নাটকের প্রথম অঙ্কে। আপনার cross connection-এর মহিমায় এখন আমরা এসে পড়েছি দ্বিতীয় অঙ্কে। এইবারে আশা করছি তৃতীয় অঙ্কের শেষে গিয়ে যবনিকা ফেলতে আর আমাদের বেশি দেরি লাগবে না। কী বলো হে নারায়ণ?'

নারায়ণ মস্তকান্দোলন করে বললে, 'ধেৎ, আমি কিছুই বলি না! যতক্ষণ না ব্যাটাদের মুণ্ডুগুলো হাতের কাছে পাই, ততক্ষণ আমি এক্কেবারে বোবা হয়ে থাকতে চাই! আমি কথার মানুষ নই, আমি হচ্ছি কাজের মানুষ!'

শচীনবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, নরেন আচম্বিতে চেয়ারের উপরে হেলে পড়ে নিজের বুকের উপরে হাত রেখে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বলে উঠল, 'উঃ!'

শচীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে নরেনবাবু? অমন করছেন কেন?'

নরেন দুই চোখ মুদে ক্ষীণ স্বরে বললে, 'কেন জানি না, বোধহয় আমার বিষম সর্দি লেগেছে। বুকে দারুণ ব্যথা। মাঝে মাঝে যাতনা আর সহ্য করতে পারছি না।'

নারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কই নরেন, তোমার অসুখের কথা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি?'

নরেন তেমনি ভাবেই বললে, 'ইচ্ছা করেই বলিনি। কারণ আমি জানি তুমি একটুতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠো। সমস্ত অসুখ আমি চেপে রাখতে চেয়েছি, অথচ আমার নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে!'

শচীনবাবুর দুই চক্ষে রীতিমতো আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনার এতই যদি অসুখ, তাহলে ডাক্তার ডাকাননি কেন?'

নরেন বললে, 'হ্যাঁ, আমার ডাক্তার ডাকাই উচিত ছিল। কিন্তু যে-সে ডাক্তারকে ডাকতে আমার ভয় হয়! আমাদের কাকে ডাকা উচিত বলুন দেখি শচীনবাবু?'

—'কেন, আমাদের চন্দ্রনাথকে ডাকুন না! পুলিশের অনেকেই বলে, তাঁর মতন ভালো ডাক্তার নাকি খুব কমই আছেন।'

—'চন্দ্রনাথবাবুকে আপনি কতদিন জানেন?'

—'বহুকাল থেকেই। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সে বর্মায় গিয়েছিল।'

—'কেন?'

—'এক ধনী রোগীর আহ্বানে। এমনি তার দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই জাপানিরা বর্মা আক্রমণ করে। তারপর থেকে কিছুদিন চন্দ্রনাথের আর কোনও খোঁজ খবর পাওয়া গেল না, আমরা আন্দাজ করলুম সে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন আবার চন্দ্রনাথের দেখা পেলুম। আমরা সবাই তো অবাক! কিন্তু চন্দ্রনাথ বললে, জাপানিরা রেঙ্গুন দখল করবার আগেই সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়, তারপর বর্মা থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে অনেক বনজঙ্গল পাহাড় নদী পার হয়ে বহু বিপদ এড়িয়ে আবার ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে। তার মুখে জাপানিদের নিষ্ঠুরতার যেসব বর্ণনা শুনেছি তা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।'

নরেন বললে, 'চন্দ্রনাথবাবু জাপানিদের উপরে নিশ্চয়ই খুব চটে আছেন?'

—'সে কথা আর বলতে? জাপানিদের কাছে পেলে চন্দ্রনাথ বোধ হয় খালি হাতেই মাথা কেটে ফেলে।'

—'চন্দ্রনাথবাবু বুঝি সর্বদাই জাপানিদের নিন্দা করেন?'

—'জাপানিদের নিন্দা ছাড়া তার মুখে কথাই নেই। এইটেই স্বাভাবিক। জাপানিদের জন্যে তাকে তো কম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি! তাকে ডাকলে আপনিও তার মুখে জাপানিদের অনেক কথাই শুনতে পাবেন। চন্দ্রনাথকে খবর দেব কি?'

—'শচীনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে, আমারও বোধ হয় নিউমোনিয়া হবে। কলকাতায় হয়তো নিউমোনিয়া এবারে মারাত্মক রূপে দেখা দেবে। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার নিযুক্ত আরও তিন ভদ্রলোক এই রোগে মারা গিয়েছেন। আর আমি শুনেছি ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষই চিকিৎসা করেও ওই তিনজন লোককে বাঁচাতে পারেননি। তাঁর উপরে আমার চিকিৎসার ভার দিলে কোনও বিপদ হবে না তো?'

—'নরেনবাবু, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত—ডাক্তাররা হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র। পরমায়ু ফুরুলে ডাক্তাররা কারুকেই বাঁচাতে পারে না।'

নরেন অধিকতর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে, 'সেকথা আমিও মানি। বেশ তবে চন্দ্রবাবুকেই খবর দিন।'

নারায়ণ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, 'না, না, না! ওই চন্দ্রবাবুকে ডাকা হতেই পারে না! ওরই হাতে পড়ে তিনজন...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল, কারণ সে আরও কিছু বলবার আগেই নরেন গোপনে হাত বাড়িয়ে তার পিঠে বিষম এক চিমটি কেটে দিলে।

শচীনবাবু বললেন, 'আপনি কী বলছিলেন নারায়ণবাবু?'

নারায়ণের মুখে আর রা নেই। নরেন বললে, 'নারানের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না।

ও হচ্ছে একটি আস্ত পাগল! আমি কিন্তু আর কষ্ট সইতে পারছি না। হয়তো এখনও চিকিৎসার সময় অতীত হয়ে যায়নি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখনই একবার চন্দ্রবাবুকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি অতিশয় বাধিত হব।'

শচীনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার যাবার পথেই চন্দ্রবাবুর বাড়ি পড়ে। আমি তাঁকে সব কথা জানিয়ে এখনই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। আপনার অবস্থা দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আপনাকে হারালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরাই।' বলেই তিনি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নারায়ণ ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'নরেন, তুমি হঠাৎ অত জোরে আমাকে চিমটি কাটলে কেন?'

নরেন রুক্ষ কণ্ঠে বললে, 'কেন? সেকথা পরে শুনো অখন। তুমি খালি হস্তীমূর্খ নও, তুমি হচ্ছ গণ্ডমূর্খ!'

নারায়ণ কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তুমি আমাকে এমন শক্ত শক্ত গালাগাল দিচ্ছ কেন নরেন? আমি কী মূর্খতা প্রকাশ করেছি?'

—'তুমি কিছু করোনি। তুমি এখন দয়া করে নিজের ঘরে যাও। তারপরে যত-খুশি খাবারের পাহাড় খণ্ড খণ্ড করে কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে নিজের উদরকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ করে তোলো। আজ আর আমি তোমাকে কোনও বাধা দেব না। আজ কেবল দয়া করে এইটুকু মনে রেখো, এখনই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে দেখতে আসবেন। যতক্ষণ তিনি থাকবেন, এ ঘরে যেন তোমার টিকিটি দেখতে না পাই। আমার এ অনুরোধ রাখবে কি?'

নারায়ণ দস্তুরমতো হতভম্বের মতন নরেনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটিমাত্র কথা উচ্চারণ না করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন নিজের মনেই মুখ টিপে একটুখানি হেসে নিলে। তারপর একটা টেবিল টেনে নিজের খাটের পাশে এনে রাখলে। টেবিলের উপরে স্থাপন করলে একই রকমের ছোটো ছোটো চার-পাঁচটা গেলাস—যে-রকম গেলাসে লোকে তরল ওষুধ পান করে। একটা ছোটো কাচের ঢাকনি আগে নিজের বালিশের তলায় রেখে খাটের উপরে উঠে শয়ন করলে। তারপর দুই চক্ষু মুদ্রিত করে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল।

মিনিট-পঁচিশ পরেই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ সেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি, রং ফরসা, পরনে কোট-পেন্টলুন। চক্ষুদুটি ছোটো হলেও দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি। নাক দেখলে মনে পড়ে শুকচঞ্চু। ওষ্ঠাধরে মিষ্ট হাসির প্রলেপ যেন কখনও শুকোয় না।

সচমকে চক্ষু মেলে নরেন বললে, 'কে? কে আপনি? আপনি কি চন্দ্রবাবু, শচীনবাবু এইমাত্র যাঁর কথা বলে গেলেন?'

বিনীত ভাবে ঈষৎ অবনত হয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ। শচীনবাবুর মুখে শুনলুম, আপনি নাকি অত্যন্ত অসুস্থ?'

যন্ত্রণা-ভরা কণ্ঠে নরেন বললে, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, বড়োই কষ্ট পাচ্ছি। আমার কী হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার নিশ্বাস ক্রমেই যেন বন্ধ হয়ে আসছে।'

চন্দ্রবাবু কোনও কথা না বলে একখানা চেয়ার টেনে এনে নরেনের শয্যার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে স্টেথসকোপটি বার করে নরেনের পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যে রঞ্জিত করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন, 'আপনার কোনও ভয় নেই।

যথাসময়েই আমায় ডেকেছেন—যদিও আরও-কিছু আগে খবর পেলে আরও শীঘ্র আপনাকে নিরাময় করতে পারতুম। আপনার পীড়া গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করছে বটে, তবু যাতে আপনি দু-তিন দিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করেন আমি সেই-রকমই একটি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।'

নরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'এই কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দিন ডাক্তারবাবু, আমি চিরদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

চন্দ্রনাথের অমন স্নিগ্ধ হাসিমাখা ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্ত হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল—কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে! তারপরেই তিনি রোগীর দেহের উপরে ঝুঁকে পড়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন, 'কোনও ভয় নেই নরেনবাবু। আপনার পীড়া এখনও গুরুতর হয়ে ওঠেনি।' চন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশের টেবিলের উপর থেকে একটি ওষুধ পান করবার ছোটো কাচের গেলাস সামনের দিকে টেনে আনলেন। তারপর তিনি নিজের ব্যাগের ভিতর থেকে একটি বড়ো শিশি বার করে সেই গেলাসের ভিতরে ঢাললেন খানিকটা তরল পদার্থ। তারপর সেই ছোটো ঔষধের গেলাসটি তুলে নিয়ে নরেনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কী যে করলেন, সেটা বোঝা গেল না।

মুখের উপর থেকে সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন মুছে ফেলে নরেন অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণ চোখে চন্দ্রনাথের পিছন দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার যেই আবার সামনের দিকে ফিরলেন অমনি মুখের ভাব বদলে ফেলে কাতর কণ্ঠে নরেন বললে, 'ডাক্তারবাবু, বড়ো কষ্ট হচ্ছে!'

চন্দ্রবাবু ঔষধের গেলাসটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা খেয়ে ফেলুন, সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে।'

নরেন থর থর কম্পিত হস্তে ঔষধের পাত্রটি গ্রহণ করে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনাদের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেতে আমার বড়ো ভয় হয়! যদি আপনি কিছু মনে না করেন, একটি অনুরোধ করতে পারি কি?'

—'নিশ্চয়ই পারেন! বলুন, আপনি কী বলতে চান?'

—'ঘরের বাইরে ওই বারান্দার ডান পাশেই র‍্যাকে আমার তোয়ালে টাঙানো আছে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ আমি কখনও খাইনি—কী জানি যদি বমন হয়? আপনি অনুগ্রহ করে তোয়ালেখানা একবার এনে দেবেন কি?'

—'একথা আবার বলতে! নিশ্চয়ই আমি এনে দেব!' বলেই চন্দ্রবাবু ঘরের বাইরে গেলেন।

সেই মুহূর্তে নরেনের সমস্ত জড়তা এবং অসহায়তার ভাব অদৃশ্য হয়ে গেল। চন্দ্রবাবুর দেওয়া ঔষধের পাত্রটি বিদ্যুৎবেগে সে হেঁট হয়ে খাটের তলায় রেখে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা থেকে ঢাকনিটি বার করে তার উপরে দিলে চাপা। তারপর খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে ঠিক সেই-রকম দেখতে আর একটি ঔষধ পান করবার শূন্য গেলাস তুলে নিয়ে আবার বিছানার উপরে শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন।

চন্দ্রবাবু তোয়ালে হাতে করে ঘরের ভিতর ঢুকে নরেনের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে, ওষুধটা খেয়ে ফেলেছেন দেখছি! বেশ, বেশ!' তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির ভাব।

নরেন ঢোক গিলতে গিলতে বললে, 'খেয়েছি ডাক্তারবাবু! বড়ো গা বমি বমি করছে!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনও ভয় নেই, ওটা এখনই সেরে যাবে।' তারপর আরও মিনিট-পাঁচেক কথাবার্তা কয়ে 'কাল সকালে আবার আসব' বলে তিনি সেদিনকার মতন বিদায় নিলেন।

নরেন আরও কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল, তারপর হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'ওহে নারায়ণ, ওহে বন্ধুবর, একবার দয়া করে এদিকে আসবে কি?'

নারায়ণ ঘরের ভিতরে এসে বিস্মিত চোখে দেখলে, নরেনের মুখের উপরে রোগের আর কোনও চিহ্নই নেই! জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ তোমার ব্যাপারখানা কী বলো দেখি? দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার কোনও অসুখ হয়েছে!'

নরেন কৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'অসুখ? অসুখ আবার কীসের? অসুখ হোক শত্রুর!'

নারায়ণ মূঢ়ের মতন বললে, 'তাহলে সত্যিই তোমার কোনও অসুখ হয়নি?'

—'উঁহু!'

—'তবে ডাক্তার ডেকেছিলে কেন?'

—'কিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন করব বলে।'

—'অসুখ হয়নি, অথচ ওষুধ খাবে?'

—'খাব কেন? আমি দেখতে চেয়েছিলুম, ডাক্তারবাবু আমাকে কী ওষুধ দেন।'

নারায়ণ মুখভঙ্গি করে বললে, 'তোমার কথার মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এতক্ষণ ধরে রোগের অভিনয় করলে, ডাক্তারবাবু কী ওষুধ দেন কেবল তাই দেখবার জন্যে?'

—'ঠিক তাই।'

—'ওষুধ পেয়েছ?'

—'হ্যাঁ, ওই দ্যাখো!' নরেন খাটের তলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

নারায়ণ হেঁট হয়ে ঔষধের গ্লাসটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে নরেন সবলে তার হাতখানা চেপে ধরে বলে উঠল, 'আরে আরে, করো কী!'

—'হঠাৎ অমন করে উঠলে কেন?'

—'খবরদার, ও ওষুধের গেলাস ছুঁয়ো না!'

নারায়ণ অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললে, 'কেন বলো দেখি?'

—'ওর ভেতরে ভীষণ বিষ আছে!'

—'বিষ?'

—'সেইরকমই তো আন্দাজ করছি। ওই ওষুধটা এখনই কোনও জীবাণুতত্ত্ববিদের কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মধ্যে আছে নিউমোনিয়ার জীবাণু। নারায়ণ, ওই চন্দ্রবাবুটি আজ এখানে এসেছিলেন আমার দেহের ভিতরে নিউমোনিয়া রোগের বীজ বপন করতে।'

নারায়ণ খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'তাহলে ওই ডাক্তারটি হচ্ছে হত্যাকারী?'

—'হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। এই অদ্ভুত উপায়ে চন্দ্রবাবু আমার আগেই আরও তিনজন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি করেছেন হত্যা, অথচ আইন বলবে ওদের মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। আমিও গোড়া থেকেই এই সন্দেহই করে আসছি। কাচের চুড়িটা পেয়ে সন্দেহ আমার দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আমি জানি, জার্মান গুপ্তচররা এইভাবে অনেক শত্রু নিপাত করেছে।'

নারায়ণ বললে, 'হুঁ! এখন বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ পরিচালিত হচ্ছেন পঞ্চমবাহিনীর দ্বারাই?'

—'সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই।'

—'ওই ভয়ানক লোকটাকে তো এখুনি গ্রেপ্তার করা উচিত!'

—'না, এখনও গ্রেপ্তারের সময় হয়নি। এখন ওকে গ্রেপ্তার করলে দলের আর-সবাই সাবধান হয়ে

যাবে। খালি ওকে নয়, আমি গ্রেপ্তার করতে চাই সমস্ত দলটাকে। জালে শিকার পড়েছে, আর পালাতে পারবে না। আপাতত আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, চার নম্বরের বাড়িখানাকে আবিষ্কার করা। এই নাটকের শেষ-দৃশ্যের অভিনয় হবে সেই বাড়ির ভিতরেই।'

পঞ্চম

জাগো নারায়ণ

দু-দিন পরে ফোনে শচীনবাবুর গলা পাওয়া গেল—'কেমন আছেন নরেনবাবু? আপনার জন্যে আমার মন বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।'

নরেন বললে, 'কেন?'

—'শুনলুম আপনার দেহে নাকি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে?'

—'কে বললে?'

—'চন্দ্রনাথ।'

নরেন হেসে বললে, 'কালও ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। তাহলে তাঁরও বিশ্বাস যে আমি নিউমোনিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি?'

—'তার তো তাই মত।'

—'জানি না আমার নিউমোনিয়া হয়েছে কি না। তবে আমার বুকের ভিতরটা বিষম টাটিয়ে উঠেছে, আর একটু একটু জ্বরও হচ্ছে বটে। হয়তো গোয়েন্দাদের ভিতরে আমিই হব চতুর্থ বলি।'

—'বড়োই আশ্চর্য কথা মশাই, এমন যোগাযোগ যে হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না।'

—'শচীনবাবু, আমি কী স্থির করেছি জানেন?'

—'কী?'

—'আমি আর চন্দ্রনাথবাবুর চিকিৎসায় থাকব না। নতুন কোনও ডাক্তারকে ডাকব।'

একটু চুপ করে থেকে শচীনবাবু বললেন, 'আমারও মনে হচ্ছে আপনার তাই করাই উচিত। এবারে আমারও বিষম সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী সন্দেহ?'

—'বেছে বেছে পুলিশের লোকের উপরে নিউমোনিয়ার এই আক্রমণ, এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কি না।'

—'সেটা পরে বোঝা যাবে। শচীনবাবু, আপাতত আপনাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে। চন্দ্রবাবুকে দয়া করে জানিয়ে দেবেন যে, আমি এখন শয্যাগত আর নতুন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন। তাঁকে আর কষ্ট করে আমার এখানে আসতে হবে না।'

—'জানিয়ে দেব। অবশ্য চন্দ্রনাথ মনে মনে বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হবে। তা আর কী করা যাবে? সকলের সব ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস থাকে না।'

নরেন বললে, 'না শচীনবাবু, ঠিক তাই নয়। চন্দ্রবাবুর উপরে আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি।'

—'তবে?'

—'আমার বিশ্বাস নিউমোনিয়া রোগ সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু অনেক নতুন তথ্যই জানেন। এদেশের অনেক ডাক্তারের চেয়ে এ-বিভাগে তাঁর জ্ঞান বোধ হয় খুব গভীর!'

শচীনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তবু আপনি তাঁর চিকিৎসায় থাকতে চান না কেন?'

মুখ টিপে হাসতে হাসতে নরেন বললে, 'কিন্তু অতি-বুদ্ধির মতন অতি-জ্ঞানও যে সময়ে সময়ে মারাত্মক হতে পারে, চন্দ্রবাবু হচ্ছেন তারই একটি মূর্তিমান প্রমাণ!'

শচীনবাবু হতভম্বের মতন বললেন, 'আপনি কী বলতে চান নরেনবাবু?'

—'আমি খালি বলতে চাই, চন্দ্রবাবুর অতি-জ্ঞানের মহিমায় উপর-উপরি চারজন পুলিশ কর্মচারী একই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকের টিকিট কাটতে বাধ্য হয়েছে। চন্দ্রবাবু যারই চিকিৎসার ভার নেন তাকেই ধরে নিউমোনিয়ায়। আপনিই বলুন, কোন ভরসায় এমন ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করি?'

শচীনবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'নরেনবাবু, নরেনবাবু, আপনি কি বলতে চান যে—না, না, অসম্ভব!'

তাড়াতাড়ি ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করলে, 'চার নম্বরের বাড়ির ঠিকানাটা আদায় করতে পেরেছেন?'

—'কেমন করে পারব?'

—'খুব সহজেই। নৃপেশের উপরে কড়া পাহারা রাখুন। আসছে অমাবস্যার রাত্রে নিশ্চয়ই সে চার নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।'

—'এ যে আপনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে বলছেন! আমি নৃপেশের নামই খালি শুনেছি তার চেহারাও কখনও দেখিনি, আর সে কোথায় থাকে তাও জানি না।'

—'নৃপেশের ঠিকানা আমি আপনাকে বাতলে দেব।'

—'কী আশ্চর্য, আপনি তার ঠিকানা জানেন?'

—'জানি বই কি! আমার লোকেরাও তার উপরে নজর রেখেছে যে! আপনি আরও ভালোরকম পাহারার ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, আপনাদের ফাঁকি দিয়ে সে যেন লুকিয়ে চার নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে না পারে।'

শচীনবাবু মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, 'বেশ, বেশ! এই এক চালেই বোধহয় কিস্তিমাত করতে পারব! আপনি বাহাদুর ব্যক্তি দেখছি! কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন নরেনবাবু, আপনাকে আমরা হারাতে পারব না। আজ তাহলে আসি, নমস্কার!'

একে একে কয়েকটা দিন কেটে গিয়ে এল কালো অমাবস্যার রাত্রি। টেলিফোন যন্ত্রের সামনে বসে নরেন ও নারায়ণ কথাবার্তা কইছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোনের ঘণ্টা।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে নরেন শুধোলে, 'হ্যালো, কে আপনি?'

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, 'আমি শচীন। আপনার কথাই ঠিক! আজ রাত নয়টার সময় নৃপেশ একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একখানা মস্ত বড়ো কিন্তু সেকেলে বাগানবাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। নিশ্চয়ই ওইখানা হচ্ছে তাদের চার নম্বরের বাড়ি। আমরা একটু পরেই বাড়িখানা ঘেরাও করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না?'

—'নিশ্চয়ই পারব!'

—'বলেন কী মশাই! ওই অসুস্থ শরীরে?'

—'আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। নিউমোনিয়া চুলোয় যাক, আমার কোনও অসুখই হয়নি!'

ফোন খানিকক্ষণ মৌন। বোধ হয় শচীনবাবু এত বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন যে তাঁর আর কথা বলবার শক্তি ছিল না। তারপর রিসিভার পুনর্বার বহন করে নিয়ে এল শচীনবাবুর কণ্ঠস্বর—'আপনার নিউমোনিয়া হয়নি!'

—'উঁহু!'

—'কিন্তু চন্দ্রনাথও যে বললে, আপনার নিউমোনিয়া হয়েছে!'

—'চন্দ্রবাবু বোধ হয় মনে করেন নিউমোনিয়া রোগটি তাঁর অনুগত ভৃত্য!'

—'মানে?'

—'ক্রমশ প্রকাশ পাবে।'

—'তাহলে আপনি শয্যাগত হয়ে আছেন কেন?'

—'ওটা মিথ্যা রটনা। আমি শত্রুদের ভোলাতে চেয়েছি!'

—'আঃ, শুনে নিশ্চিন্ত হলুম! তাহলে আপনি আসছেন?'

—'আমরা প্রস্তুত। আমি আর নারায়ণ। আমরা দলে বেশ ভারী হয়ে যাব তো?'

—'সেকথা আর বলতে! চার নম্বরের বাড়ি থেকে আজ একটা ইঁদুরও বাইরে বেরুবার পথ পাবে না। আজই আমরা বুঝতে পারব, বড়োবাবু আর ছোটোবাবু এ দুই মহাত্মার আসল পরিচয় কী? তাহলে এখনই চলে আসুন। একটু আগে থাকতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছোনো দরকার। নমস্কার!'

রিসিভারটা রেখে দিয়ে নরেন বললে, 'জাগো নারায়ণ, যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করো।'

নারায়ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'যথা আজ্ঞা, সেনাপতি!'

—'হ্যাঁ নারায়ণ, এইবারে রঙ্গমঞ্চের উপরে তুমিই হবে প্রধান অভিনেতা।'

—'কেন?'

—'কারণ আমার মস্তিষ্কের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার হয়তো দরকার হবে তোমার বাহুবল!'

—'বাহু আমার বহুক্ষণ থেকেই তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।'

—'আদেশ তো পেলে। হে বীরবাহু, এখন অগ্রসর হও।'

ষষ্ঠ

অমাবস্যায়

অমাবস্যার রাত।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড অদৃশ্য হয়ে গেছে নিবিড় অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে।

অন্ধকারের সঙ্গে পাপের বন্ধুত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধুরা তাকে ভয় করে, কিন্তু পাপীরা খোঁজে অন্ধকারের আশ্রয়।

সেই ঝিল্লিমন্দ্রিত, জোনাকিখচিত অন্ধকারের ভিতরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে এক-একখানা গাড়ির শব্দ। কোনও গাড়ির শব্দ কাছে এসেই আবার দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে, আবার কোনও কোনও

গাড়ির শব্দ যাচ্ছে হঠাৎ বন্ধ হয়ে। এখন চোখ দিয়ে কিছুই দেখা যায় না, ধ্বনি শুনে কান দিয়ে সব অনুমান করে নিতে হয়।

রাত বারোটা বাজল। এইবারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে একখানা বাগানবাড়ির মধ্যে। বাহির থেকে তার মধ্যে কোনও জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই আমরা দেখতে পাব, মস্ত একখানা হল্-ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছে একদল লোক।

একদিকে রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো এবং আর একদিকে প্ল্যাটফর্মের উপরে আছে একটি টেবিল ও দুইখানা চেয়ার। প্ল্যাটফর্মের উপরে ও নীচে কোনও চেয়ারই খালি নেই। এ যেন একটা সভার দৃশ্য—কিন্তু কোনও সভ্যেরই মুখ দেখবার জো নেই। প্রত্যেকেরই মুখের উপরে বিরাজ করছে একটা করে কালো কাপড়ের মুখোশ বা মাস্ক। ঘরের ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলছে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প, তার আলো এমন অপ্রচুর যে চারিদিকেই দেখা যায় আবছায়ার লীলা!

প্ল্যাটফর্মের উপরে যে দুজন লোক বসেছিল, তাদের একজন ফিসফিস করে আর-একজনকে সম্বোধন করে বললে, 'ছোটোবাবু, আজ আমাদের এখানে কজন সভ্য আসবার কথা ছিল মনে আছে?'

—'মনে আছে বড়োবাবু! তিরিশ জন।'

—'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ কি?'

—'কী ব্যাপার?'

—'আমরা কজন এখানে আছি একবার গুণে দ্যাখো দেখি?'

ছোটোবাবু মনে মনে গণনা করে সবিস্ময়ে বললে, 'এখানে সভ্য তো দেখছি বত্রিশ জন!'

—'তাহলে এই বাড়তি সভ্য দুজন কেমন করে এখানে এল?'

ছোটোবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

—'কিন্তু আমাদের বুঝতে হবেই। মাঝখানের দরজার কাছে ওই যে দুটি লোক বসে আছে, ওদের দেখে কী বুঝছ?'

—'দেখছি তো একজন ভয়ানক লম্বা-চওড়া, আর একজন হচ্ছে ভয়ানক বেঁটে আর রোগা!'

—'ওদের দেখে আমার কাদের মনে পড়ছে জানো? নর-নারায়ণকে!'

—'কিন্তু তা—তা কেমন করে হবে বড়োবাবু? আমরা তো সকলেই জানি, নরেন এখন নিউমোনিয়া রোগে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছে। আর তার বিছানার পাশে দিনরাত বসে আছে তার বন্ধু নারায়ণ।'

—'ধরলুম নর-নারায়ণের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব। তবে ওরা কে? ব্যাপারটা ভালো বোধ হচ্ছে না। ওদের পাশের ঘরে ধরে নিয়ে চলো। আগে ওদের পরীক্ষা না করে কোনও কাজই করা চলবে না।'

ছোটোবাবু ইঙ্গিত করে ডাকতেই দুজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। সে তাদের কানে কানে কী কথা বললে কিছুই শোনা গেল না। লোকদুটো পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রথমেই সেই বৃহৎ মূর্তিটির দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দুদিক থেকে তার দুই হাত চেপে ধরে বললে, 'তোমাকে একবার পাশের ঘরে যেতে হবে।'

অকস্মাৎ মূর্তিটা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর ঝটকান মেরে মুক্ত করে নিলে নিজের হাত-দুখানা। পরমুহূর্তে যারা তার হাত ধরেছিল, তারা দুজনেই দূরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল।

ইতিমধ্যেই ছোটোখাটো লোকটিও দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে জামার পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে খুব জোরে ফুঁ দিলে এবং ডান হাত দিয়ে আর এক পকেট থেকে বার করলে রিভলভার। বড়ো মূর্তিটিও আর একটি রিভলভার বার করতে দেরি করলে না।

সভার সকলেই বিপুল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমটা হতভম্বের মতো হয়ে রইল।

তারপরেই বাহির থেকে জাগল কার উচ্চ সতর্কবাণী—'পালাও, পালাও! পুলিশ!' সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো জুতো-পরা পায়ের দৌড়াদৌড়ির শব্দ।

তারপরই বেধে গেল মহা গোলমাল। সকলেই সভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে।

বড়োবাবু ও ছোটোবাবুও প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু কোথা থেকে স্বয়ং শচীনবাবু এসেই বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন ছোটোবাবুর কণ্ঠদেশ! বড়োবাবু বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল একটা দরজার ভিতর দিয়ে। নরেন ও নারায়ণ তখন টান মেরে নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলেছে। তারা ছুটল বড়োবাবুর পিছনে পিছনে।

নরেন ও নারায়ণ বাইরের বারান্দায় এসে পড়েই দেখলে, বড়োবাবু দৌড়ে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দিলে দরজা। নারায়ণ ছুটে গিয়ে দরজার উপরে পদাঘাতের পর পদাঘাত করতে লাগল। সে প্রচণ্ড আঘাত দরজার পাল্লা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলে না, খিল ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। নরেন ও নারায়ণ অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজেদের টর্চ জ্বেলে ফেললে, কিন্তু ঘরের কোনওদিকে কেউ নেই!

এক কোণে ছিল ছোটো একটা তক্তাপোশ। তা ছাড়া ঘরের ভিতরে আর কোনও আসবাবই নেই। নারায়ণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, 'কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়? ফুসমন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?'

নরেন বললে, 'মানুষের দেহ কর্পূর দিয়ে গড়া নয়, আর কর্পূরও এত তাড়াতাড়ি উবে যেতে পারে না।'

—'তবে সে গেল কোথায়? আমরা যে স্বচক্ষে তাকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছি! এঘর থেকে তো বেরুবার আর কোনও পথ নেই!'

নরেন বললে, 'ওই তক্তাপোশখানা টেনে সরিয়ে আনো দেখি!'

নারায়ণ তক্তাপোশখানা হিড়হিড় করে একদিকে টেনে আনলে। তারপরেই দেখা গেল, তক্তাপোশের ঠিক তলায় মেঝের উপরে রয়েছে ছোটো একটা কাঠের দরজা!

নরেন বললে, 'বড়োবাবু তক্তাপোশ সরিয়ে এই দরজা খুলে পাতাল-প্রবেশ করেছেন। ভিতরে নেমে দরজা বন্ধ করবার আগে তক্তাপোশখানা আবার যথাস্থানে টেনে এনে রেখেছেন। এইবারে আমাদেরও পাতাল-প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।'

ততক্ষণে শচীনবাবুও কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে ছুটে এসে বললেন, 'এখানে আবার কী ব্যাপার?'

নারায়ণ বললে, 'দলের সর্দার এই দরজার আড়ালে বসে বিশ্রাম করছে। দরজাটা ভেঙে ফেলবার ব্যবস্থা করুন।'

পাহারাওয়ালারা খানিকক্ষণ চেষ্টা করবার পরই দরজার পাল্লা দুইখানা খুলে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল। নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখা গেল কয়েকটা ছোটো ছোটো সিঁড়ির ধাপ। তারপর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ সুড়ঙ্গের ভিতরে জাগল রিভলভারের গর্জন এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা ভারী জিনিসের পতন-শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ!

শচীনবাবু বললেন, 'এখন কী করা উচিত? লোকটা দেখোছি সশস্ত্র।'

নরেন মাথা নাড়তে নাড়তে সহাস্যে বললে, 'আমার বিশ্বাস, সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকলে এখন দেখতে পাওয়া যাবে বড়োবাবুর মৃতদেহ। সে বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।'

নরেনের অনুমানই সত্য হল। পাহারাওয়ালারা সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বার করে নিয়ে এল একটা রক্তাক্ত দেহ।

কিন্তু সে তখনও মারা পড়েনি। নারায়ণ টান মারতেই তার মুখের আবরণ গেল সরে।

শচীনবাবু বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী! এ যে ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ!'

নরেন হাস্যমুখে বললে, 'চন্দ্রনাথকে চিনতে পেরেছেন দেখে খুশি হলুম। হ্যাঁ শচীনবাবু, এই চন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে সাজে পুলিশের প্রিয় ডাক্তার, আর যবনিকার অন্তরালে বসে চালনা করে গুপ্তচরের এই বৃহৎ দলটি!'

শচীনবাবু তখনও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারেননি। হতভম্ব ভাবে বললেন, 'চন্দ্রনাথ পঞ্চমবাহিনীর সর্দার!'

—'এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।'

—'অথচ এই চন্দ্রনাথ মুখের কথায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড়ো শত্রু জাপানিদের আর কেউ নেই।'

—'আপনার মতো পাকা পুলিশের চোখে যখন ধুলো দিয়েছে তখন চন্দ্রনাথকে একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেতা বলে স্বীকার করতেই হবে।'

নারায়ণ বললে, 'কিন্তু চন্দ্রনাথ কেমন করে জাপানিদের গুপ্তচর হল?'

নরেন বললে, 'আমার বিশ্বাস চন্দ্রনাথ যখন বর্মায় ছিল তখনই সে এই সুযোগ পেয়েছিল। তারপর সাধারণ পলাতকের মতোই আবার ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করেছে আর শত্রুদের টাকায় গড়ে তুলেছে এই মস্ত গুপ্তচর সমিতি।'

নরেনের একখানা হাত চেপে ধরে শচীনবাবু বললেন, 'নরেনবাবু, আপনাকে বহু ধন্যবাদ! আপনি না থাকলে চন্দ্রনাথ আজ ধরা পড়ত না।'

চন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে দুই চোখ মেলে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। অতি মৃদু হাসি হেসে অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'কিন্তু তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি এখনই তোমাদের ফাঁকি দেব।'

সে ফাঁকিই দিলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই তার মৃত্যু হল।

কিন্তু তার দলের সকলেই ধরা পড়ল।

পরে জানা গেল, চন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও কয়েকজন বিপথগামী ভারতবাসীকে নিয়ে একখানা জাপানি সাবমেরিন ব্রহ্মদেশ থেকে সমুদ্রপথে সুন্দরবন অঞ্চলে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

তাদের বিভিন্ন আড্ডা খানাতল্লাশ করে পাওয়া গেল কাঁচের চুঙির ভিতরে সুরক্ষিত বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু, ভারতবর্ষের নানাদেশের বড়ো বড়ো মানচিত্র, অনেকরকম আগ্নেয়াস্ত্র আর বোমা ও ডিনামাইট এবং শত্রুপক্ষের কাছে খবর পাঠাবার জন্যে বেতারযন্ত্র প্রভৃতি আরও অনেক জিনিস।

নরেন বললে, 'দ্যাখো নারায়ণ, অপরাধীরা অতি-চালাক হলেও প্রায়ই ধরা পড়ে অতি-বোকামির জন্যে। চন্দ্রনাথের কাছে আরও কতরকম জীবাণু ছিল! কিন্তু সে যদি বারবার একই নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু ব্যবহার না করত, তাহলে আমাদের সন্দেহ এত শীঘ্র তার উপরে গিয়ে পড়ত না!'

নারায়ণ সভয়ে মুখভঙ্গি করে বললে, 'বাপু! এ অস্ত্রযুদ্ধ নয়, মল্লযুদ্ধ নয়, এ হচ্ছে জীবাণুযুদ্ধ! এসব বোঝবার মতন বুদ্ধি বা বিদ্যে আমার নেই!'

অনুবিসের অভিশাপ

কিম্ভুত না অদ্ভুত?
কিংবা এ আসল ভূত?

এটা প্রায়ই দেখা যায়।

হয়তো বহুকাল রামের পাত্তা নেই। আমিও তাকে ভুলেছিলুম। আচমকা একদিন অকারণেই তার কথা স্মরণ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে রামের দেখা পেলুম পথেঘাটে বা অন্য কোথাও।

আজকের ব্যাপারটাও অনেকটা ওই রকম!

প্রভাতি চায়ের আসর তেমন জমেনি, কারণ সুন্দরবাবুর অনুপস্থিতি। আন্দাজ করা গেল, সুন্দরবাবু যখন চা ও তৎসহ রসনারোচক খাদ্যসামগ্রীর লোভ ছেড়েছেন তখন জড়িয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই কোনও জটিল মামলার জালে।

চায়ের পালা চুকিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলুম। দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ। ঘটনাটা ভৌতিক। পুরানো বাড়িতে নতুন ভূতের ওস্তাদি! অর্থাৎ উত্তর কলিকাতার একখানা দেড়শো বছরের বুড়ো বাড়িতে হঠাৎ ভূতের ভেলকি খেলা শুরু হয়েছে।

বাড়িখানা মস্ত বড়ো। তার ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা বিভিন্ন উদ্বাস্তু পরিবার। ভূতের হামলা চলছে তাদেরই উপরে।

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে কি অনুমান করতে হবে যে, এই ভূতও বাস্তুহারা? কোথাও কোনও রোজা তার আড্ডা ভেঙেছে, আর সে-ও সোজা এসে মাথা গুঁজেছে উদ্বাস্তুদের বাসাবাড়িতে?'

—'না জয়, ঠাট্টা নয়। ভূতের পাল্লায় পড়ে এক ব্যক্তি নাকি মারা যেতে যেতে কোনওরকমে বেঁচে গিয়েছে।'

—'পুলিশ খবর পেয়েছে?'

—'নিশ্চয়! কিন্তু পুলিশ কিছুই করতে পারছেন না। কে যে আততায়ী, কেউ জানে না। পুলিশ সদলবলে ঘটনাস্থল ঘিরে বসে আছে, অথচ কোথা থেকে যে রাশি রাশি ইট-পাটকেল বৃষ্টি হচ্ছে কেউ তার হদিস পাচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'পুলিশ যদি বিদেহ ভূতকে না খুঁজে দেহী মানুষকে খুঁজত, তাহলে হয়তো তাকে গ্রেপ্তার করতে পারত।'

—'তোমার এমন বিশ্বাসের কারণ?'

—'দেড়শো বছরের পুরানো বাড়িতে কেউ কখনও ভূতের গন্ধ পায়নি, সেখানে ভূত আজ হঠাৎ হানা দিতে আসবে কেন?'

আমি উত্তর দেবার আগেই ভিতরে আচম্বিতে মুখে হুম-হাম ও পায়ে দুম-দাম শব্দ সৃষ্টি করে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর প্রবেশ এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর এক অচেনা ভদ্রলোক।

আমি বললুম, 'কী সুন্দরবাবু, আজ চায়ে চুমুক দিতে আসেননি, হঠাৎ এই আশ্চর্য বিরাগের কারণ কী?'

—'হুম! চায়েই চুমুক দেব বটে! যে ভৌতিক মামলার প্যাঁচে পড়েছি চিত্ত একেবারে চড়কগাছ আর কী!'

আমি বললুম, 'ভৌতিক মামলা? খবরের কাগজে আজ যার কথা বেরিয়েছে?'

জয়ন্ত বললে, 'উদ্বাস্তুদের উপরে বাস্তুহারা ভূতের অত্যাচার?'

—'না হে, না! এ মামলার সঙ্গে বাস্তুহারা ভূত কি বস্তুতান্ত্রিক মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই।'

—'তবে কি আর-একটা আনকোরা ভৌতিক মামলা? কী আশ্চর্য! আজকাল কি লোকে ভূত ধরবার জন্যে রোজার বদলে পুলিশ ডাকে?'

—'যেখানে খুনোখুনি হয় বা হবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে লোকে পুলিশ না ডেকে কী আর করবে বলো? খুনি ভূত না মানুষ সেটা তদন্ত না করলে তো চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না!'

—'খুন-টুন হয়েছে নাকি?'

—'কিছুকাল আগে একটা খুন হয়েছে আর খুনিও ধরা পড়েনি বটে, তবে আমার এলাকায় নয়, কাজেই তা নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু সম্প্রতি আমারই এলাকায় রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তোড়জোড় চলছে—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু তার সঙ্গে ভূতের সম্পর্কটা কী?'

—'খুনটা যিনি করতে চান তিনি নাকি সেকালে দেবতা বলে পূজা পেয়েছেন কিন্তু একালের ভাষায় তিনি দেবতা নন, উপদেবতা।'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলুম, 'বলেন কী দাদা, সেকেলে দেবতা একেলে পৃথিবীতে উপদেবতার ভূমিকায় দেখা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন?'

—'ঠিক তাই। তুমি শুনলে আরও অবাক হবে যে, এই উপদেবতাটির সাকিন হচ্ছে প্রাচীন মিশর।'

শুনেই তো আমি একেবারে 'ফ্ল্যাট'!

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার এই উপদেবতার উপকথা শুনে আমার কলেবর রোমাঞ্চিত হবে বলে সন্দেহ হচ্ছে না। অতঃ কিম্?'

—'তারপর? এই দেবতা বা উপদেবতার নাম হচ্ছে অনুবিস।'

আমি বললুম, 'অনুবিসের কথা আমি কেতাবে পড়েছি। প্রাচীন মিশরিদের মতে তিনি হচ্ছেন সূর্যদেবতা ওসিরিসের পুত্র, মানুষ মারা গেলে পরে তিনি তার অভিভাবক হন।

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু প্রাচীন মিশরিরা তো তাদের সভ্যতা, ধর্ম আর কুসংস্কার নিয়ে মহাকালের মহাসাগরতটে জলের লিখনের মতো কবে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ধরলুম তাদের দেবতা ও উপদেবতাদের মৃত্যু নেই। কিন্তু অনন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ না করে আজকে এই সর্বনেশে অ্যাটমবোমার যুগে তারা কি আবার জেগে উঠে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে সাহস করবে?'

সুন্দরবাবু একটু অধীর ভাবে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, গোড়াতেই কথাসরিৎসাগরে সন্তরণ দিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ঘটনাটা ভাসা ভাসা শুনেই চমকে গিয়েছি। এ মামলা গ্রহণযোগ্য কি না মনে সন্দেহ হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে এই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি, এঁর প্রমুখাৎ আসল ঘটনা শ্রবণ করো। এঁর নাম যতীন্দ্রনাথ সেন, ইনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।'

তখন আগন্তুকের দিকে ভালো করে ফিরে তাকালুম।

মাথায় খানিক সাদা খানিক কালো অযত্নবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ, সৌম্য মুখ, দাড়ি গোঁফ বোধ করি তিন-চার দিন কামানো হয়নি, মোটা কাচের চওড়া ফ্রেমের চশমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে চিন্তান্বিত দৃষ্টি, সাদাসিধে আধময়লা জামাকাপড়ে প্রসাধন-পারিপাট্যের কোনও চিহ্নই নেই, পায়ে বার্নিশ না করা পাদুকা। শ্যামবর্ণ, মাঝারি আকার। হাতে একগাছা যষ্টি, তার স্থূলতা দেখলেই বোঝা যায় তাকে ধারণ করা হয়েছে শোভার্থে নয়, আত্মরক্ষার্থে।

জয়ন্ত বললে, 'যতীনবাবু, নমস্কার। আপনার নাম আমি শুনেছি, আপনি অবিখ্যাত ব্যক্তি নন। বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ের পুরাতত্ত্ব নিয়ে পত্রিকায় আপনার সুলিখিত আলোচনা আমি পড়েছি। কিন্তু আপনার মতো নিরীহ প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে অমন একগাছা বেমানান বাঘমারা লাঠি কেন?'

এতক্ষণ পরে মুখ খুলে যতীনবাবু বললেন, 'ভয়ে মশাই, ভয়ে।'

—'ভয়ে! কার ভয়ে?'

—'অনুবিসের।'

—'তাহলে অনুবিস যে জাগ্রত দেবতা, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?'

—'করি। বিশ্বাস আগে করতুম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি।'

—'কেন বাধ্য হয়েছেন?'

—'অনুবিস যে জাগ্রত দেবতা, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'

—'যতীনবাবু, আপনার কথা শুনলে লোকে হাসবে।'

—'আমার সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই হাসতে পারবেন না।'

—'উত্তম, বলুন আপনার সব কথা! এমনকি আপনার বিষয়সম্পত্তি আর পরিবারবর্গের কথাও শুনতে চাই।'

যাদুকরের মন্ত্র কয়—
শুকনো মড়া জ্যান্ত হয়!

যতীনবাবু বলতে লাগলেন

'অল্পবিস্তর বিষয়আশয় আর ব্যাংকের খাতার মহিমায় আমার জীবন কাটে সুখে-স্বচ্ছন্দে। লোকের মতে, আমি ধনী! আর পরিবারবর্গের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমি বিবাহ করিনি, পরিবারবর্গ বলতে আমার সংসারে আপাতত আর কেউ নেই।

দুই বিধবা সহোদরা ছিল, তারাও এখন পরলোকে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে পুত্র। তারাই এতদিন আমার সঙ্গে বাস করত। একজনের নাম মুরলীধর, আর একজনের সনৎকুমার। কিন্তু সনৎ মারা পড়েছে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় আর মুরলীধর থেকেও নেই, চরিত্রদোষের জন্যে তাকে আমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। তাকে আমি নিজের মনের মতো শিক্ষা দিয়ে মানুষ করবার চেষ্টায় ছিলুম। প্রত্নতত্ত্বের কাজে সে ছিল আমার সহকারী। কিন্তু দিনে দিনে তার মতিগতির অধোগতি দেখে তার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিয়েছি। আজ চার বৎসর তার মুখ দেখিনি। সে-ও একরকম নিরুদ্দেশ হয়েই আছে—তবে কারুর কারুর মুখে ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছি, ভবঘুরের জীবন যাপন করতে করতে সে এখন নাকি আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশে গিয়ে পড়েছে।

কাজেই সংসারে আমি এখন একলা। কিন্তু সেজন্যে আমার দুঃখ বা অভিযোগ নেই। আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকদের একক জীবনই সুবিধাজনক। এই প্রত্নতত্ত্বের দুর্জয় নেশায় মেতে শিলালিপি, তাম্রলিপি বা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খোঁজবার জন্যে আমাকে দেশবিদেশে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কখনও গিয়েছি উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পা বা অন্য কোথাও—অধুনালুপ্ত প্রাচীন সভ্যতার নষ্টোদ্ধার করতে; কখনও গিয়েছি আফগানিস্তানে—পুরাতন বৌদ্ধকীর্তিকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে

পুনরাবিষ্কার করবার জন্যে; কখনও গিয়েছি আদি সভ্যতার অন্যতম লীলাক্ষেত্র মিশরের নীল নদের তীরে। এ হচ্ছে প্রায় যাযাবর জীবন, সংসারধর্ম পালনের পক্ষে উপযোগী নয় আদৌ।

আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত ওই নীল নদের তীরেই—যেখানে আকাশছোঁয়া পিরামিডের সমাধিস্মৃতিজড়িত স্বপ্ন-কুজ্ঝটির দিকে চির-অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে নারসিংহী স্ফিংক্স-এর বিরাট শিলামূর্তি।

মিশরের 'মমি' বা মশলার দ্বারা সুরক্ষিত মানুষের মৃতদেহের কথা আজ আর কারুর কাছেই অবিদিত নেই। প্রাচীন মিশরিদের মতে, এক চরম বিচারের দিনে বিচারকর্তা দেবতার সামনে এই মৃতদেহগুলিকে আবার মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবন্ত করে তোলা হবে।

আধুনিক মানুষেরা মিশরের নানাস্থানে কবর খুঁড়ে অসংখ্য মমি আবিষ্কার করেছে। মমি আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্ববিদরা অসংখ্য মমি ক্রয় করেছেন, কলকাতার যাদুঘরেও একটি নারী-মূর্তির প্রায়-নষ্ট মমি আছে।

মেমফিস নামক জায়গায় গিয়ে দেখি এক বহুদূরবিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি চার হাজার বৎসরের মমি কেনবার লোভ সামলাতে পারলুম না। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর আগে একাদশ রাজবংশের চতুর্থ মেনতুহোতেপ যখন মিশরের অধিপতি, তখন তাঁর রাজসভায় ছিলেন তানুতামেন নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এটি হচ্ছে তাঁরই সুরক্ষিত মৃতদেহ।

শোনা যায়, মমিকে কবরস্থ করবার আগে পুরোহিতরা এমন জাদুমন্ত্র পড়ে দিতেন, কখনও মন্দীভূত হত না যার প্রভাব। ফলে কোনও অবিশ্বাসী ব্যক্তি মমিকে ঠাঁইনাড়া করলে সমূহ বিপদে পড়ত।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হাওয়ার্ড কার্টার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা রাজা তুতানখামেনের মমি স্থানান্তরিত করেছিলেন। মন্ত্রগুণে সেই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা নাকি মারা পড়েছিলেন অভাবিত ও আকস্মিক দুর্ঘটনায়। পুরোহিত কিংবা দেবতার অভিশাপ গিয়েছিল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু আমার ধারণা ছিল এসব হচ্ছে বাজে কুসংস্কার, বিশ্বাসের অযোগ্য একজন মিশরি ভদ্রলোক আমাকেও মমি কিনতে মানা করে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, এই মৃতদেহ মিশরের বাইরে নিয়ে গেলে আমাকেও মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাঁর কথা আমি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। মমিটিকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আমি নিজের সংগ্রহশালায় রক্ষা করেছি।

দেশে ফেরবার পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি। কিন্তু তারপরেই মিশরের রাজধানী কাইরো থেকে আমার কাছে আসে ইংরেজি ভাষায় টাইপরাইটারে লেখা একখানা বেনামি চিঠি। তাতে এই বলে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয় যে, আমি যদি এক মাসের মধ্যে তানুতামেনের মমিকে পুনরায় মিশরে পাঠিয়ে না দি, তবে আমাকে বিষম বিপদের আবর্তে পড়তে হবে। পত্রের তলায় প্রেরকের নামের পরিবর্তে শুধু লেখা ছিল—'শুভার্থী বন্ধু'।

কিন্তু তথাকথিত শুভার্থী বন্ধুর উপদেশ মানতে পারিনি। প্রচুর মূল্য দিয়ে মমিটি কিনেছিলুম, কোনও ধাপ্পাবাজের উড়োচিঠিতে ভয় পেয়ে হারাতে রাজি হলুম না। দেখতে দেখতে কেটে গেল এক মাস। তারপরেই ঘটল প্রথম দুর্ঘটনা।

মুরলীধরকে ত্যাগ করবার পর থেকেই আমার দ্বিতীয় ভগ্নীর পুত্র সনৎকুমার আমার বাড়িতেই বাস করত। সে ছিল অত্যন্ত সৎস্বভাব, বিনয়ী ও অধ্যয়নশীল। আমার সেবায় ছিল তার পরম আনন্দ। তাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করব, এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা।

কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়েছে। সনৎকুমার অপঘাতে মারা পড়েছে এবং তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে রহস্যাবৃত।'

এই পর্যন্ত শুনে জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'আপনার ভাগনের মৃত্যুকে রহস্যাবৃত বলছেন কেন?'

—'কারণ তার সঙ্গে অপার্থিব ব্যাপারের সম্পর্ক আছে।'

—'অপার্থিব ব্যাপার বলতে আপনি কী বোঝেন জানি না। কিন্তু আমি এখানে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

মিত্রাক্ষর নয়, চিত্রাক্ষর,
মৃত্যুদূতের লেখা নিজ-স্বাক্ষর!

জয়ন্ত বললে, 'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, সনৎবাবু কতদিন আগে মারা পড়েছেন?'

—'ঠিক এক মাস আগে রাত্রিকালে।'

—'পুলিশের মতেও কি এটা হত্যাকাণ্ড?'

—'নিশ্চয়! এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হতে পারে না। কেউ বিষাক্ত তির ছুড়ে তাকে হত্যা করেছে। বক্ষে তিরবিদ্ধ অবস্থায় সনতের মৃতদেহ পাওয়া যায়।'

—'এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে চাই।'

—'সনতের মৃতদেহ পড়ে ছিল ঘরের মেঝের উপরে। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।'

—'জানালা?'

—'খোলা ছিল।'

—'ঘরে আলো জ্বলছিল বোধ হয়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সব বুঝতে পারছি। কেউ বাহির থেকে তির ছুড়ে সনৎবাবুকে হত্যা করেছে।'

—'পুলিশও তাই বলে।'

—'পুলিশ কারুকে সন্দেহ করেছে?'

—'কার উপরে সন্দেহ করবে? সনৎ ছিল অজাতশত্রু। তার মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি কেবল আমি। বোধ করি হত্যাকারীর উদ্দেশ্যও ছিল তাই।'

—'এইবার আসল প্রশ্নে আসা যাক। যতীনবাবু আপনার মতে সনৎবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে অপার্থিব রহস্যের সম্পর্ক আছে। এমন বিশ্বাসের কারণ কী?'

—'প্রথমত, সনতের বুকে যে তিরগাছা বিদ্ধ ছিল, তা আধুনিক নয়। হাজার হাজার বৎসর আগে প্রাচীন মিশরিরা সেইরকম তির ব্যবহার করত। সেরকম অনেক তির প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজও পাওয়া যায়।'

—'তারপর?'

—'দ্বিতীয়ত, তিরের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল একখানা কাগজ। কিন্তু সেখানা সাধারণ কাগজ নয়।'

—'তবে?'

—'সেকেলে বাঙালিরা লিখবার জন্যে ব্যবহার করত তালপাতা। মিশরে আজও 'প্যাপাইরাস' নামে একরকম জলজ তৃণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরিরা সেই তৃণ থেকে কাগজ তৈরি করে লেখবার জন্যে ব্যবহার করত।'

—'এ কথা আমরাও জানি।'

—'তিরের সঙ্গে সংলগ্ন কাগজখানা ছিল সেই রকম আর তার উপরে লেখা ছিল দুটি শব্দ।'

—'প্রাচীন মিশরিরা লিখত তো চিত্রাক্ষরে, যাকে 'হায়ারগ্লিফিক্‌স' বলা হয়।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে হচ্ছে একরকম সাংকেতিক ভাষা, বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারে না।'

—'আপনি পড়তে পারেন তো?'

—'নিশ্চয়!'

—'সেই কাগজে কী লেখা ছিল?'

—'অনুবিসের অভিশাপ।'

—'অর্থাৎ তানুতামেনের মমি চুরি বা ঠাঁইনাড়া করেছেন বলে অনুবিসের অভিশাপে আপনার ভাগিনেয় নিহত হয়েছেন?'

—'ওছাড়া আর কী অর্থ হবে বলুন?'

—'কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা কি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে নয়? দোষ করলেন আপনি, শাস্তি পেলে অন্য লোক!'

—'তারপর শুনুন। সনতের মৃত্যুর হপ্তাখানেক পরে আবার এক উড়োচিঠি আসে—সেইরকম টাইপরাইটারে লেখা। লেখক সেই 'শুভার্থী বন্ধু'।'

—'এবারের চিঠির খামের উপরেও কি মিশরের ডাকঘরের ছাপ ছিল?'

—'না, কোনও ছাপ থাকবার কথা নয়। কারণ এবারের চিঠিখানা কেউ স্বহস্তে আমার বাড়ির ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।'

—'বটে, বটে! বড়োই চিত্তাকর্ষক কথা!'

—'এবারের চিঠিতে লেখা ছিল—এখনও সাবধান হোন। তানুতামেনের মমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন। নইলে এবারে আপনার নিজের পালা। অনুবিসের সম্পত্তি আপনি হরণ করেছেন, অনুবিস আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আর সাত দিন মাত্র সময় দেওয়া হল।'

—'আপনার অভিপ্রায় কী? মমিটাকে আবার মিশরে পাঠিয়ে দেবেন?'

—'প্রাণ থাকতে নয়। ওই মমির সঙ্গে চিত্রাক্ষরে লেখা একখানা দলিল পেয়েছি। তাতে বহু দুর্লভ তথ্য আছে, পুরাতত্ত্ববিদদের কাছে যা অমূল্য। তবে নিরাপদ হবার জন্যে বসতবাড়ি ছেড়ে আমি নিজের বাগানবাড়িতে চলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসেও আবার পেয়েছি বিপদের সাড়া।'

—'তাই নাকি? কিন্তু আপনার নতুন বিপদের কথা শোনবার আগে আর একটা কথা জানতে চাই। প্রাচীন মিশরি তির আর চিত্রাক্ষরে অনুবিসের নাম দেখেই কি আপনি ধরে নিয়েছেন যে, এইসব ঘটনার সঙ্গে আছে অলৌকিকের সম্পর্ক?'

যতীনবাবু জোরে মাথানাড়া দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। অলৌকিককে আমি যে দেখেছি!'

—'কাকে দেখেছেন?'

—'অনুবিসকে।'

—'স্বচক্ষে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বচক্ষে। সে হচ্ছে ভয়াবহ মূর্তি!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'প্রাচীন মিশরের কথা আজ পরিণত হয়েছে সুদুর অতীতের স্বপ্ন

কাহিনিতে। আর আপনি কিনা বলতে চান, সেই বিস্মৃত পৌরাণিক যুগের ভূতুড়ে দেবতা অনুবিসকে স্বচক্ষে দেখেছেন এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতায়!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আপনি একটা বিটকেল স্বপ্ন দেখেছেন!'

আমি বললুম, 'সব কথা না শুনে কোনও মত প্রকাশ না করাই উচিত। যতীনবাবুর বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি।'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক। যতীনবাবু, আপনার আশ্চর্য দর্শনের কথা শেষ করুন।'

কী ভীষণ! কার মুখ?
নরদেহে জম্বুক!

যতীনবাবু আবার শুরু করলেন তাঁর কাহিনি:

'গতকল্যকার কথা বলছি।

আমার বাগানবাড়ি একতলা। চারিদিকে ষোলো বিঘা জমির উপরে আছে ফল-ফুলের গাছ, লতাপাতার ঝাড়, আলবাঁধা ছোটো ছোটো খোলা জমি এবং পুকুর। বাগানে পাঁচিল নেই বটে, কিন্তু মেদী ও তারের বেড়া দিয়ে সব দিকে ঘেরা। চারখানি ঘরের একখানিতে আমি শয়ন করি। বাগানের পিছনে মালির এবং ফটকের পাশে দারোয়ানের ঘর।

প্রথম রাতটা ছিল গুমট, রাত বারোটার পর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠান্ডা পড়ে, কনকনে বাতাস বইতে থাকে। শীত শীত করায় ঘুম ভেঙে যায়, মাথার কাছেকার জানালাটা বন্ধ করে দেবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

জানালার কাছে গিয়ে বুঝি তখনও থামেনি ঝুরঝুরে ইলশেগুঁড়ুনি। এত হালকা যে শব্দ শোনা না গেলেও হাওয়ায় উড়ে এসে গায়ে লাগে। আচম্বিতে নিঝুম অন্ধকারের বুক চিরে ও আমার চোখে চমক লাগিয়ে ঝলকে উঠল এক তীব্র ও সুদীর্ঘ বিদ্যুৎ শিখা এবং তারপরেই আকাশ পৃথিবী কাঁপিয়ে গমগম করে কানে বাজতে লাগল যন্ত্রের গম্ভীর গর্জন।

কিন্তু সেই গর্জমান বজ্রধ্বনি শুনতে শুনতেই আর একটা কল্পনাতীত দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত।

জানালা থেকে অল্প তফাতেই হাসনুহানার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত দীপ্তচক্ষু মূর্তি!

মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতোই তুরন্ত প্রশ্ন খেলে গেল—কে ও, কে ও, কে ও?

তারপর কান থেকে বজ্রধ্বনির প্রতিধ্বনি মিলোতে না মিলোতেই বিছানা থেকে খপ করে ইলেকট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে জ্বেলে ফেলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম, ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নিকষ-কালো মনুষ্য-দেহের উপরে বিরাজমান প্রকাণ্ড এক শৃগালের মুখ আর সেই আশ্চর্য শেয়াল মুখেই দপ দপ করে জ্বলছিল দু-দুটো নীলাভ আগুন-চোখ! অত্যুক্তি নয়, চোখ দুটো সত্যসত্যই অগ্নিময়! কিন্তু টর্চের আলো জ্বলতেই নিবে গেল সেই চোখের আগুন! আমি সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম।

ধরা পড়েই সেই ভয়ংকর অমানুষিক মূর্তিটা বিকট এক হুংকার দিয়ে অদৃশ্য হল ঝোপের আড়ালে।

আমার চিৎকারে লোকজন ছুটে এল। তারপর শুনতে পেলুম কার ধাবমান মোটরের শব্দ। বেয়ারা ও দারোয়ানরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাগানে বাইরের কারুকে দেখতে পেলে না।

তারপর বাকি রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে দিয়ে ভোর হতেই থানায় এসে হাজির হয়েছি।'

সব শুনে জয়ন্ত চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বলো তো জয়ন্তভায়া, এমন উদ্ভট মামলা নিয়ে পুলিশ কী করতে পারে? হুম, শেয়ালমুখো আগুনচোখো মানুষখেকো ভূত! কেন বাপু, ভূত কি অন্য কোনও রকম ভদ্রমূর্তি ধারণ করতে পারলে না? দেহ মানুষের, মুখ শেয়ালের, চোখ আগুনের! ধ্যেৎ যা নয় তাই!'

যতীনবাবু বললেন, 'মশাই, প্রাচীন মিশরের দেবতা অনুবিসের মুখ ছিল শৃগালের!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেবতার এমন যাচ্ছেতাই জানোয়ারি বুদ্ধি হয়, আমি একথা বিশ্বাসই করি না! শেয়ালমুখো দেবতাকে কেউ আবার পুজো করে নাকি? কক্ষনো না—হুম!'

যতীনবাবু বললেন, 'সেকালের মিশরের এমন সব দেবতাও পুজো পেতেন যাঁদের মুখ ছিল কারুর ভেড়া, কারুর গোরু, কারুর সিংহ, কারুর বক বা বাজপাখির মতো।'

—'আরে ছি ছি, এ যে দেবতাদের অপমান!'

—'তাহলে আমাদের—অর্থাৎ হিন্দুদেরও তো দোষী বলতে হয়। গণেশের হাতির মতো মুখের কথা ভুলে যাবেন না। তারও উপরে আছেন নৃসিংহাবতার! আবার পুরানো মন্দিরে বিষ্ণুর নরবরাহ মূর্তিও দেখা যায়।'

আমি বললুম, 'ওসব বাজে কথা যেতে দিন। হ্যাঁ যতীনবাবু, ওই শেয়ালমুখো বিদেশি দেবতাকে দেখতে গিয়ে ভয়ে আপনার চোখের ভ্রম হয়নি তো?'

—'ভ্রম? অসম্ভব! প্রাচীন চিত্রে আর ভাস্কর্যে আমি অনুবিসের যেরকম আঁটসাট ছোটো জামা আর বিশেষ ধরনে তৈরি হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঝোলানো খাটো কাপড় দেখেছি, আমার বাগানের শেয়ালমুখো মূর্তিটার পরনেও ঠিক সেই রকম পোশাকই ছিল। মুখ, দেহ, সাজপোশাক সব হুবহু মিলে গেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার কথা মানলে বলতে হয় ওই অনুবিস হচ্ছে মড়াদের রক্ষক—অর্থাৎ গোরস্থানের দেবতা। এমন বিচ্ছিরি ভূতুড়ে দেবতাকে ঘাঁটিয়ে লাভ কী মশাই, তানুতামেনের শুকনো মড়াটা মানে মানে ফিরিয়ে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়—আপনারও প্রাণরক্ষা হয়, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!'

যতীনবাবুর মুখে ফুটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি বললেন, 'ফিরিয়ে দেব? বলেন কী? তাহলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের গোঁ আপনি জানেন না। গোঁ বজায় রাখবার জন্যে আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব।'

সুন্দরবাবু বিরক্তমুখে বললেন, 'অর্থাৎ আমাদের জ্বালিয়ে আর খাটিয়ে মারবেন? না মশাই, পুলিশ ভূত-ধরার বেসাতি করে না, আপনি ভালো রোজার তল্লাশ করুন। কী বলো জয়ন্ত?'

সুন্দরবাবুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'যতীনবাবু, মমিটা প্রত্যার্পণ করবার জন্যে আপনাকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই সাত দিনের কয় দিন আর বাকি আছে?'

—'বাকি নেই। গতকাল ঠিক সাত দিনের মাথায় অনুবিসের দেখা পেয়েছি।'

—'তাহলে পত্রলেখকের কথায় বিশ্বাস করলে বলতে হয়, এখন যে-কোনও মুহূর্তে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কাল রাত্রে সেই শেয়ালমুখো মূর্তিটাকে আপনি বাগানে হাসনুহানার ঝোপের কাছে দেখেছিলেন?'

—'হুঁ।'

—'মূর্তিটা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানা চলন্ত মোটরের শব্দ শুনেছিলেন?'

—'শুনেছিলুম।'

—'শব্দটা আসছিল বাগানের কোন দিক থেকে?'

—'পিছন দিক থেকে।'

—'সেদিকে মোটর চলবার উপযোগী রাস্তা আছে?'

—'একটা সরু কাঁচা রাস্তা আছে বটে, কিন্তু দিনেও সেদিকে-গাড়িতে চড়ে বা পায়ে হেঁটে কারুকে বড়ো একটা যাতায়াত করতে দেখিনি। আর রাত্রে তো নয়ই। সেদিকে আছে কেবল পোড়ো জঙ্গুলে জমি।'

—'যতীনবাবু মূর্তিটার দেখা পাবার আগেই তো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ এক পশলা।'

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, গা তুলুন। আমরা যতীনবাবুর বাগানবাড়িতে যাত্রা করব।'

—'কেন হে, তুমি কি এই আজগুবি মামলাটার ভার নিতে চাও?'

—'তা চাই বই কি!'

—'কিন্তু মনে রেখো, শেষটা এ ভার দুর্বহ আর দুঃসহ হতে পারে!'

—'হলেও সে ভার নামাবার শক্তি আমার আছে। উঠুন।'

অনুবিসের বিষের রীষে জ্বললে, শেষে বাঁচবে কীসে?

কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়—মাত্র মাইল বারো পথ। তারপরেই যতীনবাবুর বাগানবাড়ি। বেশ সাজানো বাগান, বাড়িখানি বাংলো ধরনের, ছোটো হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একেবারে শয়নগৃহে ঢুকে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'যতীনবাবু, কোন জানালা থেকে আপনি সেই মূর্তিটা দেখেছিলেন?'

যতীনবাবু অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিলেন।

জয়ন্ত জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিচালনা করে বললে, 'কালকের এক পশলা বৃষ্টি গাছপালার ময়লা ধুয়ে দিয়েছে। সোনালি রোদের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওই হাসনুহানা ঝোপটার শ্যামলতা সুন্দর দেখাচ্ছে। যতীনবাবু, ওইখানেই কি সেই বিভীষিকার আবির্ভাব হয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'উত্তম। চলুন ওইখানে।'

সুন্দরবাবু অধীর ভাবে বললেন, 'ভায়া, তুমি কি এখনও ওই ঝোপের মধ্যে কোনও অসম্ভব নরশৃগালকে আবিষ্কার করতে চাও?'

জয়ন্ত অগ্রসর হতে হতে বললে, 'দেখা যাক। অন্তত ওখানে একটা কিছু দেখতে পাব বলেই আশা করছি।'

—'বোধ হয় অশ্বডিম্ব?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। আমি কিন্তু সুন্দরবাবুর মেজাজকে গরম করবার এমন সুযোগ ছাড়তে পারলুম না। হেসে বললুম, 'ওখানে অশ্বডিম্ব পাওয়া গেলে আমি তার ওমলেট বানিয়ে আপনার জঠরাগ্নি নেবাবার চেষ্টা করব।'

সুন্দরবাবু রেগে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্থানে-অস্থানে তোমার ফাজলামি ভালো লাগে না মানিক!'

—'কিন্তু ওমলেট? ওমলেট আপনার ভালো লাগে তো? বিশেষ অশ্বডিম্বের ওমলেট। মস্ত বড়ো।'

সুন্দরবাবু নিরুত্তর ক্রোধারক্ত মুখে গট গট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে হাসনুহানার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এখানে ঘাসজমির ওপরে দেখবার কিছুই নেই।'

—'সেটা আমি এখানে না এলেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতুম।'

জয়ন্ত ঝোপের ওপাশে গিয়ে বললে, 'ঝোপের নীচে আদুড় কাঁচা মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

'দেখব আবার কী ছাই?'

—'ছাইভস্ম নয়, দেখবেন কারুর একখানা বাঁ পায়ের ছাপ।'

—'পায়ের ছাপ?'

—'হ্যাঁ। কাল রাতে এখানে যে মূর্তিমান হয়েছিল, যতীনবাবুর চিৎকার শুনে সে তাড়াতাড়ি সরে এসেছিল ঝোপের এইখানে। পায়ের ছাপটা তারই অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে।'

—'হুম!' বিস্মিত সুন্দরবাবুর মুখ দিয়ে আর কোনও শব্দ নির্গত হল না।

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তির আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল শুনেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম যে, আগন্তুক বাগানের কোথাও না কোথাও তার আগমনের চিহ্ন রেখে যাবে। তাই তো তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসেছি! আমি আরও কিছু দেখবার আশা করি।'

—'আরও কী?'

—'সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত এই ছাপটাই পর্যবেক্ষণ করুন। এটা হচ্ছে একপাটি রবারের জুতোর ছাপ। সাত নম্বরের জুতো। ছাপের নকশা দেখেই বলে দেওয়া যায়, বাটা কোম্পানির জুতো। যতীনবাবু, বাটা কোম্পানির রবারের জুতো পরে, আপনার বাড়িতে এমন কেউ আছে?'

—'কেউ না।'

—'সুন্দরবাবু, ছাপটার ছাঁচ তোলবার ব্যবস্থা করবেন, এটা হচ্ছে মূল্যবান সূত্র। পরে কাজে লাগবে। যতীনবাবু, রাত্রে মোটরের আওয়াজ শুনেছিলেন কোন দিকে?'

—'বাগানের ওই পিছন দিকের রাস্তায়।'

—'চলুন, ওইদিকে পা চালাই।'

বাগানের পশ্চাদ্‌ভাগ। কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা। তার ওপাশে পোড়ো জমি, এঁদো পুকুর, আগাছা আর কাঁটাঝোপ, বাঁশঝাড়, অযত্নবর্ধিত তাল, নারিকেল ও খেজুর প্রভৃতি গাছের ভিড়।

বাগানবাড়ির ঠিক পিছনে পথের কাদায় মোটরগাড়ির চাকার দীর্ঘ একটানা রেখা।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, 'ফায়ারস্টোন টায়ারের ছাপ। এরও ছাঁচ তুলে রাখতে হবে। মোটরখানা যে এইখানে বাগানের বেড়ার ধারে এসে থেমেছিল তাও বোঝা যাচ্ছে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি এই ব্যাপারটাই দেখবার আশা করেছিলুম। অতঃপর অনুমান করা যেতে পারে, এইখানে গাড়ি থামিয়ে চালক নিজে কিংবা তার কোনও সঙ্গী কাল রাতে বেড়া টপকে বাগানের ভিতরে করেছিল অনধিকার প্রবেশ। যতীনবাবু, আপাতত আপনার প্রতি আমার এই নির্দেশ। আজ আপনি বাড়ির বাইরে আর মুখ দেখাবেন না। আমি চললুম, সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। তারপর যা করতে হবে, তখনই শুনবেন। সুন্দরবাবু, এখানকার কাজ সেরে আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব। কিছু গোপন পরামর্শ আছে। এখন নমস্কার।'

সন্ধ্যার মুখেই জয়ন্তের সঙ্গে আমি আবার বাগানবাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম।

যতীনবাবু একটা ঘরের বাইরের দিককার সব জানালা বন্ধ করে ভয়ে জবুথবু হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের আবির্ভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের দেখে যেন ধড়ে প্রাণ এল। এতক্ষণ একা বসে বসে দিকে দিকে শুনছিলুম যেন অমঙ্গলের ভয়াবহ পদধ্বনি—যেন হাজার হাজার বৎসরের ওপার থেকে মিশরের মৃত্যুস্তব্ধ প্রাচীন সমাধিভূমি ছেড়ে অন্ধকারের কোনও ভয়ংকর বাসিন্দা কত সাগর নদী মরু পর্বত ডিঙিয়ে ধেয়ে আসছে আমারই উদ্দেশে!'

আমি সহাস্যে বললুম, 'আপনি যে কবির ভাষায় কথা কইছেন! লোকে ভয়ে কি কবি হয়?'

যতীনবাবু বললেন, 'ভয়ে কেউ কবি হয় কি না জানি না, কিন্তু আধমরা যে হয় তার প্রমাণ আমি।'

জয়ন্ত বললে, 'অতএব ভয় পাবেন না। আমার হাতে এটা কী দেখছেন?'

—'ওটা তো একটা ব্যাগ। ওর ভেতরে কী আছে?'

—'মাথামুণ্ডু একটা কিছু আছেই।'

—'মাথামুণ্ডু?'

—'ঠিক তাই। এখন বিনাবাক্যব্যয়ে চলুন আপনার শয়নগৃহে।'

শয়নগৃহ। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, 'এইবারে এইখানে একটা ছোটো টেবিল আর একখানা সোফা এনে রাখুন।'

কথামতো কাজ হল।

—'এইবারে চাই দু-চারটে ছোটো বালিশ আর একটা তাকিয়া, একটা জামা আর কিছু ন্যাকড়া।'

বিস্মিত যতীনবাবু ফরমাশ মতো জিনিস সরবরাহ করলেন।

অতঃপর জয়ন্ত ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে মোম-দিয়ে-গড়া একটা নরমুণ্ড—হঠাৎ দেখলে ভ্রম হয় আসল মানুষের মাথা!

সচকিত কণ্ঠে যতীন শুধোলেন, 'ও কী ব্যাপার জয়ন্তবাবু, ও কী ব্যাপার!'

রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে নিরুত্তর মুখে জয়ন্ত প্রথমে সোফার উপরে তাকিয়া রেখে তার উপরে জামা পরালে, তারপর ন্যাকড়াগুলো গুঁজে দিলে এখানে ওখানে এবং তাকিয়ার ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করলে সেই কৃত্রিম নরমুণ্ডটা। তারপর ঘরের বাইরে বাগানে গিয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হতভম্ব যতীনবাবুর মুখে এতক্ষণ পরে কথা ফুটল। আমাকে শুধোলেন, 'আপনার বন্ধু কী করতে চান বলুন দেখি?'

আমি বললুম, 'এখনই শুনতে পাবেন, ধৈর্য ধরুন।'

—'কিন্তু ওই নকল নরমুণ্ডটা—'

—'ওটা এসেছে থিয়েটারের সাজঘর থেকে। মঞ্চের উপরে সময়ে সময়ে কাটা নরমুণ্ড দেখানো দরকার হয় কিনা!'

তবু যতীনবাবুর মুখ দেখে মনে হল না, অন্ধকারের মধ্যে তিনি একফোঁটা আলো দেখতে পেয়েছেন!

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এসে বললে, 'বাগান থেকে কী দেখলুম জানেন যতীনবাবু? টেবিলের দিকে মুখ করে সোফার উপরে বসে আছেন ঠিক যেন আপনি!'

—'আমি?'

—'তা ছাড়া আবার কে? বালিশ তাকিয়া প্রভৃতি সোফার পিছন দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল না। দেখতে পেলুম কেবল আপনার মাথাটা। এটা আপনার শোবার ঘর। এখানে রাত্রে আপনি ছাড়া আবার কে থাকবে?'

—'কিন্তু ঠিকে ভুল হল যে মশাই! ওই বিতিকিচ্ছি মুণ্ডটা কেউ আমার বলে সন্দেহ করবে না।'

—'মশাই গো, ভুলে যাচ্ছেন একে রাত্রিকাল, তায় বাগানের দর্শক থাকবে দূরে। তার উপরে অধিকতর সাবধানতার জন্যে ঘরে আজ স্বল্পশক্তির একটিমাত্র 'ইলেকট্রিক বালব' জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হবে। কৃত্রিম মুখটাকেও সুমুখ থেকে দেখা যাবে না। ওর মাথার পিছনে আছে ঠিক আপনারই মতো কাঁচাপাকা লম্বা চুল। সুতরাং দর্শকের চোখের ভুল হওয়া অনিবার্য। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেও একবার বাগানে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসুন না!'

যতীনবাবু চোখ কপালে তুলে শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, বলেন কী? সন্ধে উৎরে গিয়েছে, এই অন্ধকারে আমি যাব বাগানে? সে তো হবে আত্মহত্যারই সামিল! না মশাই, আমি না দেখেই আপনার কথাতেই বিশ্বাস করছি। কিন্তু আপনার অভিপ্রায়টা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না! এত তোড়জোড় কীসের?'

—'আজ রাত্রে বাগানে আবার যদি অনুবিসের অশুভ আগমন হয়, তবে নাগালের ভিতরে আপনার জলজ্যান্ত মাথাটা পেয়ে সে জানালাপথে নিশ্চয়ই বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করতে বিলম্ব করবে না। সাত দিন কেটে গেছে। কাল তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আজ হবে।'

—'ওরে বাবা, আমি তখন কোথায় থাকব?'

—'আপনাকে অন্য কোনও ঘরে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে।'

—'একলা?'

—'তা নয়তো কী!'

—'আর আপনারা?'

—'আমরা এখনই বিদায় হব।'

—'আর আমি এখানে বলির পাঁঠার মতো কেঁপে মরব? কিংবা আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ফস করে বন্ধ হয়ে যাবে? খাসা ব্যবস্থা! কেন, এখানে আজ কি পুলিশ মোতায়েন রাখা যায় না?'

—'না, অনুবিস পুলিশকে ভালোবাসে না। তবে আবার আমরা আসব বই কি!'

—'কিন্তু, আমি পটল তোলবার পরে বোধ হয়?'

—'ভয় নেই মশাই, ভয় নেই!'

—'ভরসাও নেই।'

বুঝিয়াছি তুমি বাপু, শৃগাল-ধূর্ত,
অপরূপ রূপে মর্তে হয়েছ মূর্ত!

যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে রাত্রির আত্মা। কৃষ্ণা নিশীথিনীর উষ্ণ নিশ্বাসবায়ু যেন বনে বনে মুহুর্মুহু জাগিয়ে তুলছে দুঃসহ যন্ত্রণার আর্ত আকুতি। পথিকহীন পল্লিপথ মনে আনে ভয়ের শিহরন, কোথাও নেই মানুষের সাড়া—অন্ধ বসুন্ধরা এখন যেন পরিণত হয়েছে অমানুষের বিচরণ ক্ষেত্রে! কোনও কালভৈরবের পদার্পণের জন্যে মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে আছে।

যতীনবাবুর বাগানবাড়িও অন্ধকারে আচ্ছন্ন—কেবল একটি ঘর ছাড়া। সেখানে জানালা-পথে অনুজ্জ্বল আলোকে দেখা যায়, একটি আসনে আসীন মনুষ্যমূর্তি বাইরের দিকে পিছন ফিরে টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে যেন একমনে কোনও পুস্তক পাঠ করছে।

আচম্বিতে নিশীথের নীরবতাকে ঘর্ঘর শব্দে যেন করাত দিয়ে কাটতে কাটতে বাগানবাড়ির নিকটস্থ হয়ে একখানা মোটরগাড়ি হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল।

বাগানের একটা ঝোপ একটু দুলে উঠল, যেন কোনও আসন্ন সম্ভাবনার ইঙ্গিত! কোনও গাছের পত্রান্তরালে জাগল একাধিক পক্ষীর কাতর চিৎকার, যেন তারা পেয়েছে অভাবিত, অপার্থিব অমঙ্গলের সন্ধান! একটা পথচারী কুকুরও হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে ক্রমে দূরে পালিয়ে গেল! চারিদিকেই কী এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রের আভাস!

পুকুর-পাড় দিয়ে অন্ধকারের চেয়েও কালো কী একটা ভয়াল অপচ্ছায়া ধীরে ধীরে বাগানবাড়ির আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত নিঃশব্দে। তার উপর দিকে আঁধারে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো রোমাঞ্চকর অগ্নিময় বীভৎস চক্ষু! নীলাভ দীপ্তি!

আলো-জ্বালা ঘরের কাছ-বরাবর গিয়ে দীপ্ত চক্ষু ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পরে কী একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঘরের ভিতরকার উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্তির মুণ্ডটা ঠিকরে পড়ল নীচের দিকে!

পরমুহূর্তে তোলপাড় করে উঠল হাসনুহানার ঝোপ এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগল একটা হিংস্র পাশবিক গর্জন, তারপরেই বিষম কোস্তাকুস্তি ধ্বস্তাধ্বস্তি ও মাটির উপরে একটা ভারী দেহপতনের শব্দ!

জয়ন্তের কণ্ঠে শোনা গেল, 'মানিক, মানিক! তুমি চটপট এর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও! সঙ্গে দড়ি এনেছি, হতভাগার পাদুটোও বেঁধে ফ্যালো!'

তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকারে নজর চলে না, কিন্তু দেখা যেতে লাগল দুটো জ্বলজ্বলে আগুনচোখ! মানুষের নাগপাশে বাঁধা পড়ল কি কোনও অমানুষিক শয়তান? তাও কি সম্ভব?

আচমকা বাগানের পিছন দিক থেকে ভেসে এল দুই-দুইবার রিভলভারের শব্দ এবং বহু কণ্ঠের হই হই রই রই! মহা ধুন্ধুমার! তারপরেই এক তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি!

জয়ন্ত সানন্দে বললে, 'সুন্দরবাবুর সংকেত শুনেই বুঝছি আরও কেউ বা কারা ধরা পড়ল! আমাদের ফন্দি সফল!'

এদিকে হট্টগোল শুনে লণ্ঠনধারী বেয়ারা ও যষ্টিধারী দারোয়ানদের সঙ্গে বন্দুকধারী যতীনবাবুও হন্তদন্ত হয়ে বাগানে ছুটে এসে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলেন, 'কী হল, কী হল? এত হট্টগোল কেন?'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'হানাদাররা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ওই দেখুন একজনকে!'

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, মাটির উপরে লম্বমান হয়ে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে একটা অদ্ভুত

বিজাতীয় পোশাক-পরা কৃষ্ণকায় মূর্তি—মুখ তার শৃগালের মতো, কিন্তু সেই শৃগালমুখের উপর থেকে নিবে গেছে তখন দপদপে নীলাভ দীপ্তি!

যতীনবাবু আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে বললেন, 'কী সর্বনাশ!'

জয়ন্ত বললে, 'সর্বনাশ নয় মশাই, সর্বরক্ষা! এই দেখুন!' সে একটানে মূর্তির কাঁধের উপর থেকে উপড়ে আনলে মুখ নয়, মুখোশ! শৃগালমুখের মুখোশ!

চমৎকৃত যতীনবাবু বলে উঠলেন, 'এ আবার কী?'

—'ছলনা!'

—'কে এই লোকটা?'

--'চিনতে পারছেন না?'

—'একে জীবনে কখনও দেখিনি!'

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন সবেগে ও সদলবলে সুন্দরবাবু। এসেই বলে উঠলেন, 'এক ব্যাটাকে বাগানের ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে আর এক ব্যাটা মোটরে গুম হয়ে বসেছিল। আমরা ধরতে যেতেই ব্যাটা আবার রিভলভার ছুড়তে শুরু করেছিল! সেপাই, ওটাকে টেনে নিয়ে আয় তো এখানে! হুম, আমাকে টিপ করে গুলি ছোড়া? পাজি, ছুঁচো, উল্লুক!'

হাতকড়ি-বদ্ধ অবস্থায় যাকে টেনে-হিঁচড়ে কনস্টেবলরা সামনে এনে হাজির করলে, তাকে দেখেই যতীনবাবু বিপুল বিস্ময়ে একেবারে থ!

—'কী যতীনবাবু, একে চেনেন নাকি?'

—'এ যে আমার দেশত্যাগী ভাগনে মুরলীধর!'

বেরুল জয়ন্তের রৌপ্যময় শামুক-নস্যদানি। খুশি মুখে নাকে নস্য গুঁজতে গুঁজতে সে বললে, 'যা যা আন্দাজ করেছিলুম হুবহু মিলে যাচ্ছে। যতীনবাবু, শয়নগৃহে গিয়ে দেখে আসুন, মুরলীধর প্রেরিত দূতের বাণাঘাতে আপনার নকল মুণ্ডটা এখন মেঝের উপরে গড়াগড়ি যাচ্ছে! চেয়ে দেখুন, এখানেও পড়ে রয়েছে ওর হস্তচ্যুত ধনুকখানা!'

যতীনবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'এসব কথা যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—'কিন্তু বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। শুনুন তবে সব কথা।'

নয় তো কিছুই অমানুষিক—
পাহাড় প্রসব করে মূষিক!

জয়ন্ত বললে

'এই মামলাটাকে গোড়াতেই প্যাঁচালো বলে মনে ধোঁকা লাগে বটে, কিন্তু অল্প মাথা ঘামালেই ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে আসে।

প্রথম থেকেই ভূতের কথা আমি একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ভূত বিষাক্ত তির ছুড়ে নরহত্যা করছে, ভৌতিক ইতিহাসেও সে কথা লেখে না। বিষের সাহায্য নেয় কেবল মানুষ খুনি। ভূতের কোনও বন্ধু বা সেক্রেটারি 'টাইপ-রাইটারে' পত্র লিখে কারুকে শাসাচ্ছে, এটাও হাস্যকর ব্যাপার। প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক প্রেতমূর্তি বা ছায়ামূর্তি পায়ের শব্দ ঢাকবার জন্য বাটা কোম্পানির পরম আধুনিক

রবারের জুতো পরে এবং তাড়া খেলে মোটরে চড়ে টেনে লম্বা দেয়, ভূতুড়ে যুক্তিতেও এসব মানা চলে না।

কিন্তু বিনা কারণে হত্যা বা নরহত্যার চেষ্টা হয় না। ভূতঘটিত ব্যাপারগুলো যদি অস্বীকার করি, তবে সনৎকুমারকে হত্যা আর যতীনবাবুকে মারাত্মক আক্রমণ করার মূলে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

নিজের মনের ভিতর থেকেই জিজ্ঞাসার জবাব পেলুম। যতীনবাবু ধনী ও নিঃসন্তান, তাঁর সম্পত্তির লোভেই কেউ এইসব কুকার্য করছে। যতীনবাবু ও সনৎকুমারের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হতে পারে কে? নিশ্চয়ই যতীনবাবুর অন্যতম ভাগিনেয় ও সনৎকুমারের মাসতুতো ভাই মুরলীধর।

তার পরিচয় দিয়েছেন যতীনবাবু স্বয়ং। সে এমন কুচরিত্র ও অমানুষ যে মাতুল তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হয়েছেন। সে নিখোঁজ এবং ভবঘুরে।

পরিত্যক্ত হবার আগে সে ছিল মাতুলের প্রিয়পাত্র। যতীনবাবুর কাছে থেকেই সে যে প্রত্নতত্ত্বের অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, এই তথ্যটা আমার যথেষ্ট কাজে লেগেছে।

আর একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, ভাসা ভাসা খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মুরলীধর নাকি আফ্রিকায় প্রবাসী হয়েছে।

আমি আন্দাজ করলুম, আফ্রিকায় থাকতে থাকতেই সে মাতুলের মমি কেনার কথা জানতে পারে এবং তারপরেই সে শয়তানি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ওই সুযোগটা গ্রহণ করে। মমি স্থানান্তরিত করলে মারাত্মক অভিশাপগ্রস্ত হতে হয়, এই চলতি কুসংস্কারটাও সে কাজে লাগাতে ছাড়েনি। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাবিশারদ মাতুল যে প্রাণভয়েও মমিকে হাতছাড়া করতে রাজি হবেন না, এটা জেনেই সে আটঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনুবিসের ছদ্মবেশে অন্য যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে, সে হচ্ছে তারই আজ্ঞাবহ এবং পাপকর্মের সঙ্গী।

খুনির স্বরূপ যদি কেউ ধরে ফেলে, তাই অনুবিসের ছদ্মবেশ আর রূপকথার প্রয়োজন হয়েছে। ওর মধ্যে পুলিশকেও বিপথে চালাবার গোপন অভিসন্ধি আছে।

আর অগ্নিময় চক্ষুর রহস্য? ওটা হচ্ছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল—অর্থাৎ ফসফরাস ঘটিত চালাকি, সহজেই সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধানো যায়! সাদা ফসফরাস অন্ধকারে জ্বলে।

আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।'

যতীনবাবুর মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না, কেবল কাতরভাবে একটা অব্যক্ত শব্দ করে তিনি অবসন্নের মতো বসে পড়লেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কথায় কথায় লোকে বলে—'যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা'! হায় রে, সেই কথাই দেখছি সত্য হয়ে দাঁড়াল!'

জয়ন্ত বললে, 'কথার কথা ছেড়ে দিন সুন্দরবাবু, এমন ভাগনে হাজারে একটাও হয় না। আসল কথা কী জানেন? সুজনের স্বজন সর্বজন, কিন্তু দুর্জন কারুকে স্বজন বলে মানে না!'

হন্তারক নরদানব

১

পটভূমিকা

ইতিহাস যখন লিখিত হয়নি, জলদস্যু বা বোম্বেটের অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগেও দেখা যায় প্রাচীন মিশর, গ্রিস ও রোমের সমুদ্রযাত্রী জাহাজ বোম্বেটেদের পাল্লা থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি, বিশ্ববিখ্যাত রোমান দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকে পর্যন্ত একবার বোম্বেটেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল! ইংরেজিতে Pirate বলতে বুঝায় বোম্বেটে এবং গ্রিক Peirates থেকে ওই শব্দটির উৎপত্তি। উপরন্তু পর্তুগিজ Bombardier শব্দটি ভেঙে গড়া হয়েছে বাংলায় চলতি 'বোম্বেটে' শব্দটি।

প্রাচীন ভারতবাসীরাও সাগরযাত্রায় বেরিয়ে যখন-তখন ধরা পড়ত বোম্বেটেদের ফাঁদে। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের মাটিতে মুসলমানরা যে প্রথম ইসলামের পতাকা রোপণ করবার সুযোগ পায়, তারও মূলে ছিল ভারত সাগরের বোম্বেটেরাই। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনি, এখানে বলবার জায়গা নেই।

তারপর মধ্যযুগের ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ ও উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান বোম্বেটেদের ভয়াবহ অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এবং জলদস্যুতা পরিণত হয়েছিল একটি রীতিমতো লাভজনক ব্যবসায়ে। ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য বোম্বেটেদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রেও। আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বোম্বেটেদের প্রাধান্য এতটা বেড়ে ওঠে যে, তারা জল ছেড়ে ডাঙায় নেমেও দেশের পর দেশে হানা দিতে ভয় পেত না।

বোম্বেটেদের সাহস বাড়বে না কেন? বড়ো বড়ো ইংরেজ বোম্বেটে ইংল্যান্ডের রাজাদের কাছ থেকেও আশকারা পেয়েছে। অনেক বোম্বেটের জন্ম আবার সম্ভ্রান্ত পরিবারে। স্পেন বা ফ্রান্সের সঙ্গে যখন লড়াই চলত, ইংল্যান্ডের রাজারা তখন বোম্বেটেদেরও লেলিয়ে দিতে লজ্জিত হতেন না এবং তারাও প্রশ্রয় পেয়ে স্পেন বা ফ্রান্সের যে-কোনও জাহাজের উপরে হামলা দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করত। হেনরি মর্গ্যান ছিল সতেরো শতাব্দীর এক কুখ্যাত ইংরেজ বোম্বেটে। সে কেবল জলপথে নয়, স্থলপথেও শত শত নরহত্যা করেছে এবং নির্বিচার লুণ্ঠনের পর বহু জনপদকে করেছে অগ্নিমুখে সমর্পণ। তাকে বন্দি করে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এমন মুগ্ধ হলেন যে, শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, মর্গ্যানকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে জামাইকা দ্বীপের শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দিলেন।

জনৈক ইংরেজ বোম্বেটে একবার ভারত সাগরে এসে মোগলদের জাহাজের উপরে চড়াও হয়ে বাদশাহ্ আলমগীরের পরিবারভুক্ত দুইজন রাজকন্যাকেও বন্দিনী করতে ভয় পায়নি।

সুন্দরবন ছিল আগে বর্ধিষ্ণু লোকালয়, পরে পরিণত হয়েছে বিজন জলা-জঙ্গলে। মানুষের বিচরণ-ভূমি দখল করেছে হিংস্র পশুর দল। কারণ? পর্তুগিজ ও মগ বোম্বেটেদের অত্যাচার।

দুইজন মেয়ে-বোম্বেটেরও নাম বিখ্যাত—আন বোনি ও মেরি রিড। জাতে ইংরেজ। তাদেরও গল্প অতিশয় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু আমরা বোম্বেটেদের ইতিহাস লিখতে বসিনি। ভূমিকার জন্যে যতটুকু চাই, ততটুকু ইঙ্গিতই দিলুম, আপাতত এ সম্বন্ধে আর বেশি বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই। এইবার মূল কাহিনি শুরু করা যাক।

যার কথা বলব তার আসল নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড টিচ, কিন্তু 'কালোদেড়ে' ডাকনামেই সে সর্বত্র পরিচিত (যেমন কুখ্যাত মুসলমান বোম্বেটে উরুজ পরিচিত ছিল 'লালদেড়ে' ডাকনামে)। সে কেবল স্পেন ও ফ্রান্সের শত্রুই ছিল না, নিজের জাতভাই ইংরেজদেরও সুবিধা পেলে ছেড়ে দিত না এবং সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ তার নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে সারা হত। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার উত্থান এবং পতন। আমেরিকায় তখন ইংরেজদেরই রাজত্ব।

২
নায়কের মঞ্চে প্রবেশ

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ। তারই উত্তরে আছে সাতশো আশি মাইল লম্বা বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—তাদেরও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। আমেরিকার দিকে যাত্রা করবার পর কলম্বসের চোখে পড়ে সর্বপ্রথমে বাহামা দ্বীপই।

বাহামার অন্যতম দ্বীপ নিউ প্রভিডেন্স এবং সেখানে ছিল বোম্বেটেদের জাহাজ ভিড়োবার এক মস্ত আড্ডা। আমাদের কাহিনির সূত্রপাত সেখানেই।

বোম্বেটেদের নিজস্ব এক কালো পতাকার নাম ছিল 'জলি রোজার'—তার উপরে সাদা রঙে আঁকা থাকত কোনাকুনি ভাবে রক্ষিত দুটো অস্থিখণ্ডের উপরে একটা মড়ার মাথা। সাগরপথের যাত্রীরা এই কৃষ্ণপতাকা বা 'জলি রোজার'কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ভয় করত। সৌভাগ্যের বিষয়, 'জলি রোজারে'র অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের বোম্বেটে-বহরের জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কাপ্তেন বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড। লোকের চোখ ভোলাবার জন্যে তাঁর জাহাজের উপরে উড়ছে এখন ইংল্যান্ডের রাজপতাকা বা 'ইউনিয়ন জ্যাক'। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দিলেই সেখানে 'ইউনিয়ন জ্যাকে'র জায়গা জুড়ে বসবে সর্বনেশে 'জলি রোজার'—কারণ তিনি হচ্ছেন একজন নামজাদা জলদস্যু!

হর্নিগোল্ড আজ কয়েকদিন জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন একজন সহকারী অধ্যক্ষের জন্যে। সহকারী অধ্যক্ষের অভাবে জাহাজের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন শুঁড়িখানা ও গুন্ডাপাড়ায় ঘুরেও তিনি মনের মতো সহকারী খুঁজে পাননি এবং সেই অভাবের জন্যে তাঁর জাহাজ বন্দরের মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে।

নিজের মনেই গজ গজ করে তিনি বললেন, 'এমন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক বেটা মনের মতো পাষণ্ড গুন্ডার পাত্তা পাওয়া গেল না! আমার জাহাজের খুনে বদমাইশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে যে খোদ শয়তানের মতো ধড়িবাজ লোক দরকার!'

আচম্বিতে কাছ থেকেই কে পাগলের মতো হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল—দস্তুরমতো শয়তানি হাসি!

চমকে উঠে নিজের পিস্তলের উপরে হাত রেখে হর্নিগোল্ড রুখে ফিরে দাঁড়ালেন—সত্যসত্যই কি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছে স্বয়ং শয়তান?

কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম! এ যে কবির ভাষায়—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!'

জাহাজ-ঘাটার অন্যান্য লোকদের মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে জেগে উঠেছে দৈত্যের মতো এক অসম্ভব মনুষ্যদেহ—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া! যেন বামনদের মাঝখানে এক বিরাট পুরুষ! তার মহাবলিষ্ঠ

বিপুল বপুর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে লৌহকঠিন পেশির পর পেশির তরঙ্গায়িত গতি। সেই রুক্ষ কেশকণ্টকিত মুখে আগুনের ফিনকির মতো জ্বলছে দুটো কুচুটে কুতকুতে চক্ষু। মাথায় পুরু কালো চুল—এবং চোখ-নাকের পাশে ও তলায় সে কী কৃষ্ণ ও ঘন শ্মশ্রুর ঘটা! কয়েকটা যত্নরচিত বেণিতে বিভক্ত হয়ে সেই প্রকাণ্ড চাপদাড়ি ঝুলে পড়েছে একেবারে কোমর পর্যন্ত! কেবল বিউনি বেঁধেই দাড়ির পরিচর্যা শেষ করা হয়নি—তার উপরে তাকে আবার অলংকৃত করা হয়েছে রংচঙে সব রেশমি ফিতে দিয়ে! তার বক্ষ-বন্ধনীতে ঝুলছে তিনজোড়া পিস্তল এবং গলায় আছে সোনা ও রুপায় গড়া হার!

তারপর বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! মাথার টুপির তলা থেকে ঝুলে পড়ে কয়েকটা মৃদু-জ্বলনশীল পলিতা সেই ভীষণ মুখখানা অধিকতর ভয়াল ও বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে গন্ধকের উগ্র গন্ধে!

যেন অপচ্ছায়ামূর্তি! থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে পড়লেন হর্নিগোল্ড! এমন ধারণাতীত দৃশ্য তিনি জীবনে আর দেখেননি।

পরমুহূর্তেই তাঁর সন্দেহ হল যে, মূর্তি তাঁকে দেখেই হাসছে যেন বিশ্রী ব্যঙ্গের হাসি!

এই কথা মনে হতেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ড খেপে গিয়ে পিস্তল বাগিয়ে ধরে কুপিত কণ্ঠে বললেন, 'ওরে কালোদেড়ে শয়তান, আমাকে দেখে ঠাট্টা? মজাটা দেখবি নাকি?'

কিন্তু কোনও মজাই দেখানো হল না—ধাঁ করে তাঁর মনে পড়ে গেল একটা কথা। তাড়াতাড়ি গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, 'টিচ? তুমি কি এডওয়ার্ড টিচ?'

—'সঠিক আন্দাজ! আমি এডওয়ার্ড টিচই বটে, দেশ আমার ব্রিস্টলে।'

—'সবাই তোমাকে কালোদেড়ে বলে ডাকে তো?'

পলিতার আগুন তখন দাড়ির উপরে নেমে এসেছে এবং চারিদিক ভরে উঠেছে গন্ধকের গন্ধের সঙ্গে চুল-পোড়া দুর্গন্ধে! কালোদেড়ে তার শ্মশ্রুর বেণিগুলো তাড়াতাড়ি কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমি কালোদেড়েই বটে! একটু আগেই আপনি যা বলেছিলেন আমি শুনতে পেয়েছি। জাহাজের বেয়াড়া বেহেড লোকগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে আপনার বেপরোয়া সহকারী দরকার?'

কালোদেড়ে কথা কইতে কইতে মিট মিট করে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে দেখে তপ্ত হয়ে উঠল হর্নিগোল্ডের বুকের রক্ত! এমন দুঃসহ বেয়াদপি দেখলে যে-কোনও বোম্বেটে-জাহাজের মালিক তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এই শ্রেণির একজন দুষ্ট ও ধৃষ্ট সহকারীর অভাবে তাঁর জাহাজ অচল হয়ে পড়েছে বলে মনের রাগ মনেই চেপে তিনি বললেন, 'তাহলে আমার জাহাজের অবাধ্য লোকগুলোর ভার আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম! কিন্তু তোমার ওই যাচ্ছেতাই জ্বলন্ত পলতেগুলো আর আমি সইতে পারছি না, ওগুলো নিবিয়ে ফ্যালো!'

৩

আগন্তুকের স্বরূপ

উপযোগী বাতাস পেয়ে জাহাজ বন্দর ছেড়ে ভেসে চলল আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দু-দিন পরেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুঝতে বাকি রইল না যে, সহকারীরূপে যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন, দুর্বৃত্ততায় সে শয়তানেরই জুড়িদার বটে! কাপ্তেনের ঘরের আওতাতেই দাঁড়িয়ে সে নোংরা, অশ্রাব্য ভাষায় চেঁচিয়ে, শপথ করে এবং টুপি থেকে ঝুলন্ত পলিতাগুলোতে আগুন লাগিয়ে যথেচ্ছ ভাবে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ছোড়ে ছয়-ছয়টা পিস্তল—কেউ হত বা আহত হল কি না তা নিয়ে

মোটেই মাথা ঘামায় না! একে তো সেই বিপুলবপু নরদানবের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে চমকে যায়, তার উপরে তার পাশবিক গর্জন শুনে এবং পিস্তলগুলো নিয়ে মারাত্মক খেলা দেখে মহাপাষণ্ড বোম্বেটেগুলো পর্যন্ত আতঙ্কে থরহরি কম্পমান দেহে জাহাজের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দেয় এবং তাদের মুখের ভাব যেন জাহির করতে চায়—ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি!

কালোদেড়ের সামনে গেলে সকলেরই অবস্থা হয় ভিরু ভেড়ার মতো।

একদিন সে হাঁক ছেড়ে ডাক দিলে, 'এই রাবিশের দল, আজ আমরা এক নিজস্ব নরক তৈরি করব! দেখব কতক্ষণ আমরা নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি! চল সবাই জাহাজের নীচের তলায়!'

ধ্রুম, ধ্রুম, ধ্রুম! পিস্তলের পর পিস্তলের ধমক! ভয়ে কেঁচোর মতো বোম্বেটের দল নীচের তলায় গিয়ে হাজির হতে দেরি করলে না। তারপর দুম-দাম করে বন্ধ করে দেওয়া হল সব দরজা। অগ্নিসংযোগ করা হল বড়ো বড়ো গন্ধকের কুণ্ডে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল না বটে, কিন্তু হু-হু করে গন্ধকের ধোঁয়া বেরিয়ে ক্রমেই কুণ্ডলিত ও পুঞ্জীভূত হয়ে সেই রন্ধ্রহীন বদ্ধ জায়গাটাকে করে তুললে ভয়ংকর দুঃসহ! দৃষ্টি হয়ে যায় অন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে আসে রুদ্ধ, অন্তিমকাল মনে হয় আসন্ন! অমন যে বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও নরঘাতক বোম্বেটের দল, তারাও হাঁচতে হাঁচতে, কাশতে কাশতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ও মৃত্যুভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে কালোদেড়ের সামনে বসে পড়ে আর্ত স্বরে চ্যাঁচাতে লাগল—'প্রাণ যায়, বাঁচাও! দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও!'

দুই হাতে দুটো করে পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে কালোদেড়ে বিকট স্বরে অট্টহাস্য করে নেচে নেচে বলে উঠল, 'একবার নরকে ভরতি হলে আমার শয়তানদাদা আর তোদের ছুটি দেবে না—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে নরকবাসের অভ্যাসটা করে নে রে!'

—'গেলুম, গেলুম,—আর নয়! বাবা রে, দম বন্ধ হয়ে এল!'

তখন দরজা খুলে দিয়ে কালোদেড়ে গর্জন করে বললে, 'কেমন, এখন বুঝলি তো, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?'

জাহাজের উপর থেকে কালোদেড়ের আস্ফালন শুনতে শুনতে কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, এমন সাংঘাতিক সহকারীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করা অতিশয় বিপজ্জনক। ভাবতে লাগলেন, এখন কোন উপায়ে এই নারকীর পাল্লা থেকে ভালোয় ভালোয় ছাড়ান পাওয়া যায়?

৪
কালোদেড়ের বিদায়ী সেলাম

আরও কয়েকদিন যেতে না যেতেই কাপ্তেনের ভয় আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল।

একদিন সমুদ্রে আবির্ভূত হল দুই-দুইখানা জাহাজ—তারা আসছে যথাক্রমে হাভানা ও বারমুডা থেকে।

হর্নিগোল্ডের জাহাজে অমনি উড়িয়ে দেওয়া হল হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা কালো 'জলি রোজার' পতাকা।

আগন্তুক দুই জাহাজই সেই অশুভ পতাকা দেখে শিউরে উঠে আত্মসমর্পণ করলে বিনা-বাক্যব্যয়ে।

হর্নিগোল্ড জাহাজ দুখানা নিঃশেষে লুণ্ঠন করলেন বটে, কিন্তু তাদের লোকজনদের অক্ষত দেহেই মুক্তি দিলেন। অকারণে তিনি রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে দারুণ ক্রোধে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গর্জন করে উঠল, 'ওদের সবাইকে ফেলে দাও সমুদ্রে, ওরা মাছেদের খোরাক হোক!'

হর্নিগোল্ড দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এ জাহাজের কাপ্তেন হচ্ছি আমি, তুমি হুকুম দেবার কেউ নও!'

কালোদেড়ে বললে, 'মরা মানুষ কথা কয় না, সাক্ষ্য দিতে পারে না। আমি কাপ্তেন হলে কখনও ওদের ছেড়ে দিতুম না।'

হর্নিগোল্ড বললেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই। তুমি যাতে কাপ্তেন হতে পারো, শীঘ্রই আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।'

কালোদেড়ের মুখে হাসি ফুটল বটে, কিন্তু সে হাসি হচ্ছে দস্তুরমতো বিষাক্ত।

বাসনা পূর্ণ হল না বলে মনের দুঃখ ভুলবার জন্যে সে সদ্যলুণ্ঠিত জাহাজ থেকে একটা মদের পিপে টেনে এনে নিজের দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বললে, 'চলে আয় সব তৃষ্ণার্তের দল! পেট ভরে মদ খা আর প্রাণ-ভরে ফুর্তি কর!'

জাহাজের উপরে বইল যেন মদের ঢেউ! কালোদেড়ের টুপি থেকে লম্বমান জ্বলন্ত পলিতাগুলোও দেখাতে লাগল যেন অভিনব দেওয়ালির বাঁধা-রোশনাই! মদে চুমুকের পর চুমুক দিতে দিতে বলতে লাগল, 'জানিস তোরা আমার বাহাদুরি? এ অঞ্চলের বারোটা বন্দরে আছে আমার এক ডজন বউ—আমি কি যে-সে লোক রে? দু-দিন সবুর করলেই দেখবি আমি হয়েছি নিজস্ব জাহাজের মালিক আর তার নাবিকরা হয়েছে পুরোপুরি আমারই তাঁবেদার!'

তার সাধ পূর্ণ হল দিন কয়েক পরেই।

সমুদ্রে ঢেউ কেটে এগিয়ে আসছে একখানা বাণিজ্যপোত।

বোম্বেটে জাহাজের কৃষ্ণপতাকা দেখেও তার লোকজনরা দমল না, লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কালোদেড়েও তো তাই চায়—মারামারি, রক্তারক্তি, খুনোখুনি! কাপ্তেন হর্নিগোল্ডকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সায় দিতে হল।

বোম্বেটে-জাহাজ থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কামানের সারি এবং সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল বন্দুকগুলোও! মড় মড় করে ভেঙে পড়ল বাণিজ্যপোতের কয়েকখানা তক্তা এবং শোনা গেল আহতদের সকরুণ আর্তনাদ।

দুই জাহাজ পাশাপাশি হতেই কান-ফাটানো ভৈরব গর্জন করে মহাকায় কালোদেড়ে মূর্তিমান অভিশাপের মতো লাফ দিয়ে পড়ল বাণিজ্যপোতের উপরে এবং শূন্যে বন-বন করে ঘুরতে লাগল তার রক্তলোভী, শাণিত ও বৃহৎ তরবারি! যারা বাধা দিতে এল তাদের কেউ প্রাণে বাঁচল না।

নিজের জাহাজে দাঁড়িয়ে কাপ্তেন হর্নিগোল্ড আশা করেছিলেন শত্রুবেষ্টিত কালোদেড়ে এ-যাত্রা আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। একথাও ভেবেছিলেন, নিজেই পিস্তল ছুড়ে পথের কাঁটা দূর করবেন—কিন্তু হায়, পিস্তলের গুলি অতদূরে পৌঁছোবে বলে মনে হল না।

ব্যর্থ হল হর্নিগোল্ডের আশা! শোনা গেল কালোদেড়ের ষণ্ড-কণ্ঠের সঙ্গে অন্যান্য বোম্বেটেদের হই-হুল্লোড়, জয়ধ্বনি! বাণিজ্যপোত অধিকৃত এবং তার লোক-লশকর হত আহত বা বন্দি!

বন্দি যাত্রীদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কালোদেড়ে নির্দয় হুকুম দিলে, 'ওদের সমুদ্রে ফেলে দে, ওরা মাছেদের উপবাস ভঙ্গ করুক!'

যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগল গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে কালোদেড়ে

বললে, 'এইবারে বন্দি নাবিকদের ব্যবস্থা কর! যারা আমাদের দলে যোগ দিতে না চাইবে, তারাও হবে মাছেদের খোরাক! আহত শত্রুগুলোকেও ওই সঙ্গে জলে ফেলে দে!'

চিৎকার ও হাহাকার কোনও-কিছুতেই কান না পেতে বোম্বেটেরা কালোদেড়ের হুকুম তামিল করতে লাগল।

কালোদেড়ে চেঁচিয়ে হর্নিগোল্ডকে ডেকে বললে, 'শুনুন কাপ্তেন! এ জাহাজখানা এখন আমাদের!'

হর্নিগোল্ড বললেন, 'আমাদের নয় বাপু, খালি তোমার! আজ থেকে তুমি হলে কাপ্তেন টিচ!'

'কাপ্তেনে'র পদে উন্নীত হয়ে কালোদেড়ের ওষ্ঠাধরের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে সে সন্তুষ্ট হল না। এখানা হচ্ছে মাত্র 'স্লুপ' (এক মাস্তুলের ছোটো জাহাজ), সে চায় বহু বড়ো বড়ো জাহাজের বহর চালনা করতে। হর্নিগোল্ডের জাহাজখানাও 'স্লুপ' শ্রেণিভুক্ত।

কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর আবার নতুন শিকারের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা।

দুই দিনের মধ্যেই জুটল এক পরম লোভনীয় শিকার—একখানা মস্ত বড়ো ফরাসি জাহাজ!

চোখে-কানে ভালো করে কিছু দেখবার ও শোনবার আগেই বোম্বেটেদের জাহাজ দুখানা তিরবেগে তার দুই পাশে গিয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি বৃষ্টি করতে লাগল--ফরাসি জাহাজখানার অবস্থা হল টলোমলো, দলে দলে মাল্লা মৃত বা জখম হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপরই দেখা গেল, এক রোমশ নরদানবের পিছনে পিছনে বোম্বেটেরা দলে দলে উঠছে আক্রান্ত জাহাজের পাটাতনের উপরে। তখনও যে-সব হতভাগ্য জীবন্ত ছিল তারাও জাহাজের পাটাতন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সশরীরে করলে পাতালপ্রবেশ!

কালোদেড়ে তৎক্ষণাৎ সেই নতুন ও প্রকাণ্ড জাহাজের নাম রাখলে—'প্রতিহিংসা!'

তারপর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে, 'ওহে নরকের খোকা হর্নিগোল্ড! তোমার ওই পুঁচকে খেলো জাহাজকে আমি এইখান থেকেই বিদায়ী সেলাম ঠুকছি! আমি নিজের পছন্দমাফিক জাহাজ পেয়েছি, তোমাকে এর মালপত্তরেরও ভাগ দেওয়া হবে না—হে হে হে হে, বুঝলে বাপু?'

কাপ্তেন হর্নিগোল্ড কোনও জবাব দিলেন না, নিজের জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে চললেন নিউ প্রভিডেন্সের দিকে। বোম্বেটেগিরিতে তাঁর ঘৃণা ধরে গিয়েছে, তিনি এই নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবসায় ছেড়ে দেবেন।

৫
পলাতক রণতরী

কালোদেড়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে দেরি লাগল না।

প্রথমেই তার কবলগত হল একখানা ইংরেজ জাহাজ—'গ্রেট অ্যালেন'।

তারপরেই প্রমাণিত হল কালোদেড়ে যে-সে সাধারণ বোম্বেটে নয়! সে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম সওদাগরি জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে হাতিয়ার হাঁকড়ায় না এবং রণতরীর সামনে পড়লেই চটপট চম্পট দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে না।

'স্কারবরো' হচ্ছে ইংরেজদের বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ, তার পাটাতনে সাজানো সারে সারে ভারী ভারী কামান এবং তার নৌসৈন্যদের প্রত্যেকেই বন্দুকের অধিকারী।

হঠাৎ 'স্কারবরো' গিয়ে হাজির বোম্বেটের 'প্রতিহিংসা'র সামনে।

যুদ্ধজাহাজের নায়ক বরাবরই দেখে এসেছেন, রণতরীর সম্মুখীন হলেই বোম্বেটেরা তাড়াতাড়ি জাহাজের সব পাল খাটিয়ে দিয়ে বাঘের সামনে ভীরু হরিণের মতো পালাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি আগে থাকতেই নিজের জাহাজের সব পাল তুলে দিয়ে কামান দাগতে দাগতে বেগে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, 'প্রতিহিংসা' পালাবার কোনও চেষ্টাই করলে না!

মুখভরা হাসি নিয়ে নিজের জাহাজের পাটাতনের উপরে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালোদেড়ে, তার বেণিবদ্ধ শ্মশ্রু দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুই স্কন্ধের উপরে নিক্ষিপ্ত, তার টুপিতে সংলগ্ন প্রজ্বলিত পলিতাগুলো অগ্নিসর্পশিশুর মতো জোর-হাওয়ায় দিকে দিকে ছিটকে পড়ে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে আগুনের হলকা!

বোম্বেটে গোলন্দাজরাও কামানে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল।

কালোদেড়ে বললে, 'আর একটু সবুর করো, এখনও কামান দাগার সময় হয়নি। ওদের আরও কাছে আসতে দাও।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল, দুই জাহাজের মাঝখানকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে! তারা প্রায় সামনাসামনি এসে পড়ল অবশেষে।

আচম্বিতে শূন্যে তরবারি চালনা করে কালোদেড়ে হুংকার দিয়ে হুকুম দিলে, 'সময় হয়েছে! কামান ছোড়ো!'

'প্রতিহিংসা'র সমস্ত কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

যুদ্ধজাহাজ 'স্কারবরো' প্রথম আক্রমণেই বেধড়ক মার খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়ল! বিপুল বিস্ময়ে নৌসেনানায়ক কোনওরকমে নিজের রণতরী সামলে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের মানরক্ষা করতে না পারলেও রক্ষা করলেন পৈতৃক প্রাণগুলো!

বোম্বেটে-জাহাজের পিছনকার সব চেয়ে উঁচু পাটাতনের উপরে দেখা গেল—গগনভেদী চিৎকারে দিগবিদিক কাঁপিয়ে বিরাটবপু কালোদেড়ে ইংরেজ নৌসেনাদের উপরে গালাগালি ও অভিশাপ বর্ষণ করছে এবং মাথার উপরে বনবনিয়ে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে কখনও লাফ মারছে শূন্যপথে ও কখনও মেতে উঠছে তাণ্ডব নৃত্যে।

৬
গৌরবের তুঙ্গশিখরে

ইংরেজ রণতরীকে হারিয়ে দেবার পর কালোদেড়ের খাতিরের সীমা রইল না। তার নাম শুনলেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে ভয়ে উড়ে যেতে চায় লোকের প্রাণপাখি! বিশেষত মালবাহী জাহাজি কাপ্তেনদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যার দেখা পেলে যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে পিটটান দেয় ইংল্যান্ডরাজের সশস্ত্র ও সসজ্জ রণতরী, তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে নিরস্ত্র ও নির্বল সওদাগরি জাহাজ কতটুকু বাধা দিতে পারে?

না, বাধা দিতে পারেনি সত্যসত্যই। আর এই সত্য বোঝা গেল কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। কারণ উপরি-উপরি কয়েকখানা জাহাজ বন্দি করে কালোদেড়ে হয়ে দাঁড়াল রীতিমতো এক নৌবহরের অধিকারী। যেসব জাহাজ উল্লেখযোগ্য মনে হল না, সেগুলোকে সে বিনাবাক্যব্যয়ে ডুবিয়ে দিলে

মহাসাগরের অতল পাতালে। সফল হল কালোদেড়ের বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—তার তাঁবে এখন এসেছে সত্যসত্যই নৌবহর! কোনও সওদাগরি জাহাজ আজ অস্ত্রবলে বলীয়ান হলেও তার সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারবে না!

বন্দি বা ধৃত জাহাজের অসংখ্য লোক প্রাণ দিলে বোম্বেটেদের বন্দুক বা অন্যান্য অস্ত্রের মুখে। তুলনায় তাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কিন্তু যারা মরল না এবং যারা জখম হয়েও বেঁচে রইল তাদের পরিণাম হল মর্মবিদারক। কালোদেড়ের নিদারুণ নির্দেশে সাগরে ঝাঁপ খেতে বাধ্য হয়ে তাদের প্রত্যেকেই লাভ করলে সজ্ঞানে সলিলসমাধি! ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করেও বাঁচোয়া নেই, কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াও ব্যর্থ—কালোদেড়ের পাষাণ-হৃদয়ে কেউ দেখেনি দয়া-মায়ার ছিটেফোঁটাও! তার মুখে শোনা যায় একই ধরনের উক্তি, 'ওদের জোর করে ছুড়ে ফেলে দে সমুদ্রে! হোক ওরা মাছেদের খোরাক—করুক ওরা হাঙরদের উদরপূরণ!'

সে সময় অসীম সাগরের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কত হাজার মানুষের তীব্র ক্রন্দনধ্বনি শুনে চমকিত হয়ে উঠেছিল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, কোথাও তার কোনও হিসাব লেখা নেই!

তার দুষ্কর্মের সাক্ষ্য হতে পারে এমন কোনও মানুষ বা জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কালোদেড়ের কাছে ছিল দস্তুরমতো নির্বুদ্ধিতার কাজ।

৭
কালোদেড়ের নতুন বউ

এক জাহাজের অধ্যক্ষকে বলে 'কাপ্তেন' এবং একাধিক জাহাজের অধ্যক্ষ 'কমোডোর' নামে পরিচিত। কালোদেড়ে গ্রহণ করলে উচ্চতর 'কমোডোর' উপাধি।

সে বললে, 'আহা, আজ আমার মা বেঁচে থাকলে পুত্রের গৌরবে হতেন গৌরবিনী!'

কিন্তু মা পরলোকে গেলেও ইহলোকে বসে এতটা গৌরব চুপচাপ ধাতস্থ করাও যায় না। অতএব সে নির্দেশ দিলে—'উৎসব কর!'

কালোদেড়ের বোম্বেটে-শাস্ত্রে উৎসবের অর্থ হচ্ছে নারকীয় কাণ্ড। সাগরের দিকে দিকে তার নৌবহরের গোলন্দাজরা সমস্ত কামান থেকে ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি করে দেখাতে লাগল বিরাট ও ভয়ংকর আগ্নেয় দৃশ্য!

দৈবগতিকে ও দুর্ভাগ্যক্রমে যারা তথাকথিত উৎসবের সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে এসে পড়ল, তারা যে কেউ ধনে-প্রাণে রক্ষা পেলে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। একে একে জলে ডুব মারলে চার-চারখানা লুণ্ঠিত জাহাজ।

তারপর নামে উৎসব শেষ হল বটে, কিন্তু জলপথে ছুটোছুটি করে জাহাজের পর জাহাজের উপরে হানা দিয়ে লুঠতরাজ, রক্তপাত ও নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড চলল অবিশ্রান্ত।

কালোদেড়ে ধনী যাত্রীদের কিন্তু প্রাণে মারত না, বন্দি করত। বন্দরে পৌঁছে আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠিয়ে প্রচুর টাকা মুক্তিমূল্য আদায় না করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত না। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে ধনী বন্দিদের জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুণ্ঠিত হয়ে উঠত গিয়ে কালোদেড়ের প্রশস্ত ভাণ্ডারে। এইভাবেও সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল।

ওই অঞ্চলে সমুদ্রের চারিদিকে আছে অসংখ্য ছোটো ছোটো দ্বীপ। সেইসব নামহীন দ্বীপে কোনও

মানুষ বাস করে না, তাদের কোথায় কী আছে তাও কেউ জানে না। প্রবাদ, এমনি কোনও অজানা দ্বীপে কালোদেড়ে এডওয়ার্ড টিচ তার বিপুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই গুপ্তধনের ঠিকানা কেউ আদায় করতে পারেনি।

কালোদেড়ে বলত, 'আমি আর শয়তান ছাড়া আমার গুপ্তধনের ঠিকানা আর কারুর জানা নেই।'

তার বসনভূষণও এখন জাহির করে প্রচুর জাঁকজমক। তার হাতের প্রত্যেক আঙুলে শোভা পায় হিরা-পান্না বসানো আংটি। তার গলায় দোলে অনেকগুলো সোনার হারের লহর। তার বুকের বন্ধনীতে ঝোলে এখন নতুন যে তিনজোড়া পিস্তল, তাদের নলচেগুলো রুপো দিয়ে গড়া এবং তাদের কুঁদোগুলো মূল্যবান প্রস্তর দিয়ে অলংকৃত।

কালোদেড়ের এক প্রধান সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিল ইস্রায়েল হ্যান্ডস। একদিন তাকে ডেকে সে চুপিচুপি বললে, 'আমাদের দল কি অতিরিক্ত ভারী হয়ে পড়েনি?'

—'নিশ্চয়! এত লোককে লাভের অংশ দিতে দিতে আমাদের নিজেদের আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।'

—'ঠিক ধরেছ হ্যান্ডস! তাহলে কৌশলে অংশীদারের দল হালকা করে ফেলা যাক!'

বিভিন্ন ওজর দেখিয়ে দুইবারে দুইদল লোককে বিভিন্ন বিজন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বাছা বাছা লোক নিয়ে কালোদেড়ে দূর সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—একবারও ভেবে দেখলে না যে, এতদিন বিশ্বস্ত ভাবে যারা তার হুকুম মেনে এসেছে, জনহীন অজানা দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়ে তাদের দুরবস্থা উঠবে কতখানি চরমে! পরে সে কেবল এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে হালকা দল নিয়ে কাজ করলে পকেট বেশি ভারী হয় বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হয় গুরুতর সমস্যা!

বৎসরকালব্যাপী লুটতরাজ ও নরমেধযজ্ঞের পর আটলান্টিক মহাসাগর ও তার তীরবর্তী দেশগুলো যখন হয়ে উঠেছে প্রায় অরাজক ও হত্যা-হাহাকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং সবাই যখন দুঃখে-শোকে-ক্রোধে একান্ত মরিয়া হয়ে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে একবাক্যে করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা, তখন সে একদিন অম্লানবদনে বললে, 'হ্যান্ডস, চলো নর্থ ক্যারোলিনার দিকে। দিন-রাত খালি জল আর জল দেখতে আমার আর ভালো লাগছে না!'

—'জল দেখা ছাড়া আর উপায় কী? স্থলে নামলেই তো আমাদের ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠের দোলনায় দুলতে হবে!'

—'কুছ পরোয়া নেই। আমরা ফাঁসির দোলনায় দুলব না,—রাজার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করব।'

হ্যান্ডস সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বলেন কী, কর্তা? মার্জনা ভিক্ষা? কে আমাদের মার্জনা করবে?'

—'গভর্নর চার্লস ইডেন আমাদের হাসিমুখে মার্জনা করবেন।'

—'বলেন কী, হাসিমুখে?'

—'হ্যাঁ। গভর্নর ইডেন বড়ো ভালো লোক হে। যুক্তি মানেন। আমার যুক্তি কী জানো ভায়া? উৎকোচ! ঘুষখোরকে বশ করা মোটেই কঠিন নয়।'

নর্থ ক্যারোলিনা হচ্ছে আমেরিকার আটলান্টিক সাগরতীরের একটি প্রদেশ। সেই প্রদেশের বাথ্ নগরে বাস করেন ইংল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি চার্লস ইডেন। কালোদেড়ের জাহাজ গিয়ে নোঙর ফেললে সেইখানেই।

মানুষ চিনতে ভুল করেনি কালোদেড়ে। গভর্নর ইডেন তার যুক্তি অকাট্য বলেই মেনে নিলেন। উচিতমতো উৎকোচ হজম করে তিনি কালোদেড়ের সমস্ত অপরাধ কেবল রাজার নামে ক্ষমাই

করলেন না, উপরন্তু তার সঙ্গে জমে উঠল তাঁর দস্তুরমতো দোস্তি—যাকে বলে দহরম-মহরম আর কী! সবাই অবাক! হতভম্ব!

বাথ্ শহরের একটি মেয়েকে দেখে কালোদেড়ের ভারী পছন্দ হল। তৎক্ষণাৎ সে করলে বিবাহের প্রস্তাব। কন্যাও নারাজ নয়। তখন সদাশয় গভর্নর বললেন, 'আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই শুভকার্য সম্পন্ন করব।'

এটি কালোদেড়ের ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বিবাহ তা ঠিক করে বলা যায় না। বিবাহে নিতবরের আসন গ্রহণ করলে গভর্নরের সেক্রেটারি টোরিয়াস নাইট! খুব ঘটা করে শুভকার্য সম্পন্ন হল বটে, তবে শহরের বনিয়াদি বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়েও উৎসবে যোগদান করলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে তাঁদের উপরেও নিলে একহাত! খুব জমকালো সাজপোশাক পরে সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় আর দারোয়ান ও খানসামাদের ডেকে বলে, 'তোমাদের মনিবকে গিয়ে খবর দাও, স্বয়ং শ্রীমতী টিচ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।'

দারোয়ান ও খানসামাদের ইতস্তত করতে দেখলেই কালোদেড়ে তার রত্নখচিত ও রুপোয় বাঁধানো পিস্তলগুলো গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ছুড়তে শুরু করে দেয়, দিকে দিকে বোঁ-বোঁ করে ছুটতে থাকে গরমা-গরম বুলেট এবং দারোয়ান ও খানসামারা হয় ভয়ে থরহরি কম্পমান! তারপরেই দরজা খুলতে ও গৃহস্বামীর আতিথ্যলাভ করতে বিলম্ব হয় না। কালোদেড়ে বারবার এইভাবে প্রমাণিত করলে সেই পুরাতন সত্যকথাটাই—জোর যার, মুল্লুক তার!

এখানে এসেও কিন্তু কালোদেড়ে নদী-পথে বোম্বেটেগিরি ছাড়ল না—বহু জাহাজ থেকে মালপত্তর ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হতে লাগল এবং বলা বাহুল্য যে, গোপনে তার লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন না স্বয়ং গভর্নরও!

জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ এলে গভর্নর ইডেন মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কাজে কিছুই করেন না। জাহাজের মালিকরা শেষটা এখানে হতাশ হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ভার্জিনিয়ার গভর্নর স্পট্‌স্‌উডের কাছে গিয়ে নিজেদের জরুরি নালিশ জানালেন।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গভর্নর স্পট্‌স্‌উড তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলেন যে কালোদেড়েকে গ্রেপ্তার বা বধ করতে পারবে, তাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের নৌবহরের দক্ষ যোদ্ধা লেফটেনান্ট রবার্ট মেনার্ডের উপরে হুকুম জারি হল, তিনি যেন অবিলম্বে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

গভর্নর ইডেনের সেক্রেটারি টোরিয়াসও কালোদেড়ের কাছ থেকে অল্পবিস্তর ঘুষ খেয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ নৌসেনাদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির কথা শুনেই সে প্রমাদ গুনে বোম্বেটের কাছে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিলে।

৮

শয়তানি ফুর্তি

কিন্তু খবর পেয়েও কালোদেড়ে কিছুমাত্র দমল না বা ভীত হল না। নিজের দলের সবাইকে ডেকে অবহেলা ভরে বললে, 'ওহে, শুনেছ? টোরিয়াস চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, রাজার সৈন্যরা নাকি

আমাদের শাস্তি দিতে আসছে! জাহান্নমে যাক রাজা! যারা আসতে চায় আসুক তারা! আমি তো জাঁকিয়ে বসে আছি নিজের আড্ডায়—সিংহের গহ্বরে ঢুকে ফেরুপাল কী করতে পারে?'

তখন সন্ধ্যাকাল। হ্যান্ডস ও আরও দুইজন বোম্বেটেকে নিয়ে কালোদেড়ে নিজের কামরার ভিতরে প্রবেশ করে খুব খুশিমুখে বললে, 'আবার লড়াই হবে—কী মজা রে, কী মজা! ঢালো মদ, প্রাণ ভরে পান করো—আজ আমাদের আনন্দের দিন! দেখা যাক, কে কত বেশি মদ খেতে পারে!'

একটা টেবিলের চারিদিক ঘিরে বসে চারজনে মিলে মদ্যপান শুরু করে দিলে। বাতির আলোতে খালি কালোদেড়ের গলার হার ও আঙুলের আংটিগুলো নয়, মুখের দাড়ি-গোঁফের ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে তার খুদে খুদে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল—এবং জাহির করছিল যেন কোনও নির্দয় কৌতুকের রহস্যময় ইশারা!

শয়তানের কাছে গিয়ে শয়তানি ছাড়া আর কী আশা করা যায়? বোধ করি সেই কারণেই প্রচুর মদ্যপান করেও জনৈক চালাক বোম্বেটে নেশায় ঝিমিয়ে পড়েনি—নিজের দৃষ্টিকে রেখেছিল অত্যন্ত জাগ্রত!

হঠাৎ সে দেখলে, কালোদেড়ের দুটো পিস্তলসুদ্ধ দুখানা হাত ধীরে ধীরে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল। সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওজর দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

অকস্মাৎ বিকট চিৎকার করে কালোদেড়ে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে বাতিটা এবং অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুড়লে তার পিস্তলদুটো! তারপরেই আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও ভয়াবহ আর্তনাদ এবং একটা ভারী দেহপতনের শব্দ!

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখা গেল, হ্যান্ডস দুই হাতে হাঁটু চেপে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং তার আহত হাঁটু থেকে হু হু করে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা!

একজন বোম্বেটে জিজ্ঞাসা করল, 'এর অর্থ কী?'

হা হা করে হাসতে হাসতে কালোদেড়ে বললে, 'এর অর্থ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-একজনকে শাস্তি না দিলে সবাই ভুলে যাবে যে, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?' তারপর সে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, 'চলে এসো হ্যান্ডস, চলে এসো—তোমার বিশেষ কিছু হয়নি বাপু! হাঁটুর উপরে একটা ছোটো ছ্যাঁদা বই তো নয়, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেই দু-দিনে সেরে যাবে—কী বলো হ্যান্ডস?'

কিন্তু হ্যান্ডস কিছুই বললে না, পরদিন সকালেই তাকে দোলায় তুলে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

৯
কালোদেড়ের প্রভাতি ভোজ

ওদিকে তরুণ নৌসেনাপতি লেফটেনান্ট মেনার্ড প্রস্তুত হচ্ছিলেন যুদ্ধের জন্যে।

বোম্বেটেদের জাহাজ তখন বাহির-সমুদ্রে ছিল না, একটা খাঁড়ির (স্থলভাগে প্রবিষ্ট সমুদ্রের অপ্রশস্ত অংশ) ভিতরে গিয়ে নোঙর ফেলে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মেনার্ড বুঝলেন, তাঁর অধীনে 'নাইম' ও 'পার্ল' নামে যে দুখানা প্রকাণ্ড রণতরী আছে, গভীর সাগরের আনাগোনার উপযোগী করে তারা গঠিত। একে তো খাঁড়ির জলপথ সংকীর্ণ, উপরন্তু চড়া পড়েছে তার যেখানে-সেখানে—বড়ো জাহাজ ঢুকলেই চড়ায় আটকে অচল ও অকেজো হয়ে পড়বে।

কালোদেড়ের চালাকি বুঝে নিয়ে রণকুশল মেনার্ড তার ফাঁদে ধরা পড়তে রাজি হলেন না। তিনি

'স্লুপ' বা এক-মাস্তুলের দুখানা অপেক্ষাকৃত ছোটো ও হালকা জাহাজ নির্বাচন করলেন—তারা অগভীর জলেও চলা-ফেরা করতে পারবে অনায়াসেই। তার উপরে তাদের আরও হালকা করবার জন্যে ভারী ভারী কামানগুলোও সরিয়ে ফেলা হল। পরিবর্তে আমদানি করা হল গাদি গাদি বন্দুক—বড়ো কামানের অভাব পূরণ করবে তাদের সংখ্যাধিক্যই।

খবর নিয়ে জানা গেল, বোম্বেটেদের দলে পঁচিশজনের বেশি লোক নেই, কারণ কালোদেড়ে অতিরিক্ত লাভের লোভে দল অতিশয় হালকা করে ফেলেছে। মেনার্ড সঙ্গে নিলেন প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য। পঞ্চাশজন বন্দুকধারীর সামনে দাঁড়ালে পঁচিশজনকে পড়তে হবে যার-পর-নাই বেকায়দায়—এই ছিল তাঁর ধ্রুবধারণা।

অপরাহ্ন কাল।

খাঁড়ির বাঁকের মুখে আচম্বিতে দেখা গেল, দুখানা জাহাজের মাস্তুলের চূড়া।

বোম্বেটে-জাহাজের প্রহরী চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'হুঁশিয়ার! দুখানা জাহাজ আসছে!'

লাফ মেরে পাটাতনের উপরে উঠে কালোদেড়ে এক নজরে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে বললে, 'হুঁ, রাজার অভিযান! কিন্তু আমার এখানে আসার মজাটা ওদের ভালো করেই টের পাইয়ে দেব! বাছারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি!' সে তখনও জানত না তার ফাঁদ আছে মেনার্ডের নখদর্পণে!

রাজার জাহাজ কাছে এসে পড়ল।

কালোদেড়ে হাঁকলে, 'কে তোমরা?'

মেনার্ড উত্তরে ধীর স্বরে বললেন, 'টের পাবে অবিলম্বেই।'

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালনা করে বুঝলেন যে, বোম্বেটেদের জাহাজখানা আকারে তাঁদের চেয়ে বিশেষ বড়ো না হলেও ওর মধ্যে নিশ্চয়ই গাদাগাদি করা আছে কামানের পর কামান। ওখানাও এমন হালকা ভাবে তৈরি যে এই বিপদসংকুল অগভীর জলেও অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন মেনার্ড। ওদের পোতপার্শ্বের কামানগুলোর দারুণ অগ্নিবৃষ্টিতে মুষড়ে পড়লে চলবে না, তাঁকে একেবারে বোম্বেটে-জাহাজের পাশাপাশি গিয়ে পড়ে মুষলধারে গুলিবৃষ্টি করে প্রথমেই শত্রুদের রীতিমতো অভিভূত করে ফেলতে হবে। সৈন্য ও বন্দুকের সংখ্যাধিক্যের উপরেই তাঁর প্রধান ভরসা।

কিন্তু জলে এখন ভাটার টান, সময়টা এখানকার যুদ্ধের পক্ষে উপযোগী নয়। জোয়ারের জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এই স্থির করে মেনার্ড আজকের মতো নোঙর ফেলবার হুকুম দিলেন।

সেদিন রাতে বারে বারে মাতাল কালোদেড়ে পাটাতনের উপরে ছুটে এসেছিল এবং ভয়ানক গলাবাজি করে জানিয়েছিল—'ওরে রাজার চাকরগুলো, কাল প্রভাতি খানার সময় তোদের সকলকেই হতে হবে আমার শখের জলখাবার!'

মেনার্ড একবার খেপে গিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, 'ওরে শুয়োর, শোন! তোর ওই নোংরা উকুনভরা কালো দাড়িতে পেরেক মেরে তোকে আমার জাহাজের গায়ে লটকে দেব—এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!'

রাজার জাহাজে নোঙর ফেলা হচ্ছে দেখে কালোদেড়ে আন্দাজে বুঝে নিলে যে, আপাতত বোম্বেটেরা নিরাপদ, কারণ সুচতুর শত্রুরা ভাটার সময়ে অগভীর জলে জাহাজ চালিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। সকালে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হবে।

সে একজন বোম্বেটেকে কাছে ডেকে এনে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার চোখের কাছে নাড়তে নাড়তে ফিস-ফিস করে বললে, 'ওরে মুখ্যু, ভালো করে শুনে রাখ! যদি দেখিস আমরা হেরে যাচ্ছি আর রাজার সেপাইরা আমাদের জাহাজের উপরে উঠে পড়েছে, তখনই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আমাদের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিবি! তারপর কী মজা হবে জানিস তো? দড়াম করে এক দুনিয়া-কাঁপানো ধুন্ধুমারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই মিলে সরাসরি গিয়ে নরক গুলজার করে তুলব! কী রে, পারবি তো?'

এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনে বোম্বেটে-বাবাজির আত্মা শুকিয়ে যাবার উপক্রম! মুখরক্ষা করবার জন্যে তবু সে কোনওরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কালোদেড়ে বললে, 'যা তবে! বারুদখানায় গিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক! কাল এসপার কি ওসপার!'

বোম্বেটে দুরু-দুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান করল।

চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্না ফুটল। মদে শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে কালোদেড়ে নিজের কামরার দিকে ছুটল এবং যেতে যেতে আর-একবার গর্জিত কণ্ঠে জানিয়ে দিয়ে গেল যে—'ওরে রাজার দাসানুদাসের দল! শুনে রাখ তোরা! রাত পোয়ালেই আমি তোদের হাড় খাব, মাস খাব আর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব—হা হা হা হা হা হা!'

১০

যুদ্ধজাহাজের দুর্দশা

উষার সিঁদুরমাখা আকাশ ঢেকে রাখতে পারলে না পাতলা কুয়াশার পর্দা। খাঁড়ির বুকে এসেছে জোর জোয়ার। জলে জেগেছে কলকল্ল করে কলহাস্য।

রাজার জাহাজ-জোড়া এগিয়ে আসছে ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মেনার্ড নিজের লোকজনদের ভরসা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলছিলেন, 'কোনও ভয় নেই—আগে চল, আগে চল ভাই! বোম্বেটেরা বড়ো জোরে একবার কি দুইবার কামান ছোড়বার ফুরসত পাবে, তার পরেই আমরা ছুটে গিয়ে হুড়মুড় করে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেখব তখন পঁচিশটা বন্দুক কেমন করে সামলায় পঞ্চাশটা বন্দুকের ঠেলা! আগে চল!'

এতক্ষণ পরে কালোদেড়ের মন দোলায়মান হল সন্দেহদোলায়! কুয়াশার ফিনফিনে পর্দা ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, রাজার জাহাজ দুখানা এগিয়ে আসছে,—ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঘনায়মান বিপদ! একেবারে শেষ-মুহূর্তেই সে আন্দাজ করতে পারলে, শত্রুরা দলে তার চেয়ে দুগুণ বেশি ভারী! সে স্থির করলে, জাহাজ নিয়ে খাঁড়ির ভিতরে আরও দুর্গম অংশে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে—'নোঙর তোলো, নোঙর তোলো!'

কিন্তু সময় নেই—সময় নেই! শত্রু যে শিয়রে! পালাবার পথ যে বন্ধ!

কালোদেড়ে কামান দেগে পথের বাধা দূর করতে চাইলে—হ্যাঁ, এই হচ্ছে বাঁচবার একমাত্র উপায়।

প্রচণ্ড চিৎকারে শোনা গেল তার চরম আদেশ—'কামান ছোড়ো, একসঙ্গে সব কামান ছোড়ো। আগুনের ঝড়ে উড়িয়ে দাও সামনের সব প্রতিবন্ধক!'

কর্ণভেদী বজ্রনাদ ধ্বনিত করে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস কেটে তীব্র বেগে ছুটে গেল সেই সর্বনাশা

অগ্নিপিণ্ডগুলো—কিন্তু হায় রে হায়, তারা রাজার জাহাজকে স্পর্শ করবার আগেই জলের ভিতরে ঝুপ ঝুপ করে পড়ে তলিয়ে গেল!

মেনার্ড বিপুল পুলকে বলে উঠলেন, 'গোলাগুলো গিয়েছে জলের জঠরে—আমরা অক্ষত! এইবারে গর্জন করুক আমাদের বন্দুকগুলো—তারা কেউ ব্যর্থ হবে না!'

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

রাগে পাগলের মতো হয়ে কালোদেড়ে দেখলে, তার দুজন গোলন্দাজ হাত-পা ছড়িয়ে মৃত্যু-ঘুমে এলিয়ে পড়ল এবং তার জাহাজখানাও চড়ায় আটকে অচল হল! কণ্ঠে তার ফুটতে লাগল প্যাঁচার মতো কর্কশ চিৎকার।

আবার গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! ওরে বাবা, গুলির ঝাঁক বনবনিয়ে ছুটছে কানের পাশ দিয়ে। কালোদেড়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল!

কিন্তু এ কী দৈব-বিড়ম্বনা! হঠাৎ স্রোতের টানে পড়ে রাজার জাহাজ দুখানার মুখ গেল ঘুরে এবং কালোদেড়েও ছাড়লে না এই দুর্লভ সুযোগ।

তৎক্ষণাৎ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বজ্র-কণ্ঠে সে গর্জে উঠল—'আবার কামান ছোড়ো, আবার কামান ছোড়ো!'

আবার জাগল কামানগুলোর ভৈরব হুংকার! এবারে তারা ব্যর্থ হল না এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়লে না বোম্বেটেদের বন্দুকও!

তারপর মনে হল সেখানে সৃষ্ট হয়েছে অভাবিত এক শব্দময় মহানরক! ফটাফট ফেটে গেল রাজার জাহাজ দুখানার নানা জায়গা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের মাস্তুল, মৃত্যুন্মুখ যোদ্ধাদের চিৎকার ছুটে গেল দিকে দিকে! নৌসেনাদের উনত্রিশজনের মৃতদেহ পড়ে রইল পাটাতনের যেখানে-সেখানে।

বিকট উল্লাসে চেঁচিয়ে কালোদেড়ে বলে উঠল, 'এবার ওদের পেয়েছি হাতের মুঠোর মধ্যে। আবার ছোড়ো কামান-বন্দুক! ডুবিয়ে দাও জাহাজ দুখানা! মড়াগুলোর সঙ্গে জীবন্তরা মেটাক মাছেদের ক্ষুধা!'

লেফটেনান্ট মেনার্ড দিকে দিকে ছুটোছুটি করে নিজের দলের হতভম্ব লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। এবং ইতিমধ্যে দুইপক্ষের জাহাজ পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ল।

মেনার্ড ভাবলেন একবার যদি সদলবলে ওদের জাহাজে লাফিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আর কোনও ভাবনাই থাকে না! কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝে ফেললেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়!

দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে দেখে কালোদেড়ে নতুন হুকুম জারি করলে—'নিয়ে এসো হাত-বোমা! সবাই হাত-বোমা ছোড়ো!'

নতুন বিপদের সম্ভাবনা দেখে মেনার্ড নিজের সৈন্যদের ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলায় গিয়ে গাঢাকা দাও!'

দুই পক্ষের জাহাজে জাহাজে লেগে গেল বিষম ঠোকাঠুকি—শোনা যেতে লাগল মড়মড়িয়ে কাঠভাঙার শব্দ!

দুম, দুম, দুম! বোমার পর বোমা ফাটার বেজায় আওয়াজ, ধুমধড়াক্কা! রাজার জাহাজ দুখানার পাটাতন ভগ্ন-চূর্ণ, ধূমায়িত, অগ্ন্যুৎপাতে ভয়াবহ! চোখের সামনে যেন মারাত্মক আতশবাজির খেলা দেখতে দেখতে বিকট উল্লাসে কালোদেড়ে অট্টহাস্য করতে লাগল।

১১

কালোদেড়ে কালগ্রাসে

কালোদেড়ের রোমশ, মদমত্ত ও অমানুষিক দেহ তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে মেনার্ডের 'রেঞ্জার' নামক জাহাজের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলে অন্যান্য বোম্বেটেরাও!

হুহুংকারে শোনা গেল তার হিংস্র কণ্ঠে—'সংহার! সংহার! হা রে রে রে! শুরু হোক প্রলয়কাণ্ড!'

আচম্বিতে পাটাতনের দরজা ঠেলে কৃপাণ তুলে মেনার্ড ও তাঁর সৈন্যদের আবির্ভাব! ব্যাপারটা এতটা অভাবিত যে বোম্বেটেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত! কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেদের হতভম্ব ভাব সামলে নিয়ে তারা সবেগে আক্রমণ করলে—লেগে গেল হাতাহাতি লড়াই! খড়্গো খড়্গো হত্যা-ঝঞ্ঝনা! আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্রুম-ধ্রাম! যোদ্ধাদের গর্বিত বাক্যাড়ম্বর!

তারপরেই অন্য জাহাজ থেকেও মেনার্ডের আরও সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগদান করে বোম্বেটেদের অবস্থা করে তুললে শোচনীয়। জাহাজের নীচে জলস্রোত, জাহাজের উপরে রক্তস্রোত!

কালোদেড়ে তখনও ভয় পেলে না—তার একহাতে তরবারি, আর-একহাতে পিস্তল! মৃতদের পায়ে মাড়িয়ে এবং জীবিতদের ঠেলে সে যেন প্রলয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে মেনার্ডের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহগর্জনে বলে উঠল, 'আরে রে ঘৃণ্য জীব! নরকে যাবার সময় তোকেও আমি ছেড়ে যাব না!' বৃহৎ তার রক্তস্নাত কৃপাণ, তাকে ঠেকাতে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেনার্ডের তরবারি!

আর রক্ষা নেই! উন্মত্তের মতো অট্টহাসি হেসে ও দীপ্ত নেত্রে অগ্নিবর্ষণ করে কালোদেড়ের ভীমবাহু আবার তুললে তার সাংঘাতিক অস্ত্র—কিন্তু পরমুহূর্তে একজন নৌসৈন্য ছুটে এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথার উপরে করলে প্রচণ্ড আঘাত!

পাটাতনের উপরে ধড়াম করে আছড়ে পড়ল বোম্বেটে-সর্দার! মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরলে নৌসৈন্যের দল এবং তরবারি, ছোরা ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সবাই অশ্রান্ত ও নিষ্ঠুর ভাবে বিরাট দেহের উপরে করতে লাগল প্রবল আঘাতের পর আঘাত!

কিন্তু কী অসাধারণ তার সহ্যক্ষমতা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, সেইসব মারাত্মক আঘাতের পরেও সে কাবু হতে চাইলে না, উলটে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার শেষ পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করলে মেনার্ডের দিকে! ওই পর্যন্ত! তার জীবনীশক্তি তখন একেবারে ফুরিয়ে এসেছে, পিস্তল ছোড়বার আগেই সে আবার ধপাস করে পড়ে গেল এবং তার সর্বাঙ্গে জাগল অন্তিম শিহরন! সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে সে প্রাণত্যাগ করলে।

তার কালো দাড়ি তখন রক্তরাঙা, সর্বাঙ্গও রক্তভীষণ! গুনে দেখা গেল, তার দেহের পঁচিশ জায়গায় রয়েছে পঁচিশটা প্রাণনাশক আঘাতের চিহ্ন!

যুবক যোদ্ধা মেনার্ড নিহত বোম্বেটে-সর্দারের প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ময়-প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে। তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছে তার বন্য সাহস!

কিন্তু অভিভূত হলেও মেনার্ড নিজের প্রতিজ্ঞা ভুললেন না। একজন সৈনিককে ডেকে বললেন, 'বোম্বেটে-সর্দারের মুণ্ডটা কেটে জাহাজের গায়ে ঝুলিয়ে দাও।'

বলা বাহুল্য, সর্দারের পতনের পর হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল বাকি বোম্বেটেরাও।

এই ভয়ঙ্কর বোম্বেটে দলকে দমন করে লেফটেনান্ট মেনার্ড ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ছত্রপতির ছত্রভঙ্গ

পূর্বাভাষ

ছত্রপতি কে? যিনি সম্রাট, বা রাজচক্রবর্তী, বা মহারাজাধিরাজ।

সম্রাট হর্ষবর্ধন যে নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ' বলে মনে করতেন, তার প্রমাণস্বরূপ তাঁর স্বাক্ষর অদ্যাবধি বর্তমান আছে।

ঢাল নেই তরোয়াল নেই, তবু নিধিরাম নিজেকে 'সর্দার' মনে করত বলে একটা ঠাট্টার কথা শুনি। ওই নিধিরামের মতো একালের কোনও কোনও খেতাবি ধনীও নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ' বলে প্রচার করতে লজ্জিত হন না। অভিধানকেও ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

ভারতের প্রথম ছত্রপতি কে?

প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যে কেউ যেন রামায়ণ বা মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য হলেও ইতিহাস নয়। তাদের মধ্যে ইতিহাসের মাল-মশলা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

সাল ও তারিখ না পেলে এবং সত্য ও প্রামাণিক তথ্যের দ্বারা বিশেষজ্ঞরা বিচার না করলে ইতিহাস রচিত হয় না। প্রাচীন হিন্দুরা সাল-তারিখ নিয়ে মাথা ঘামায়নি আদৌ। নিরঙ্কুশ কবির কল্পনাও তাদের কাছে ইতিহাস বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীকেই সাধারণত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলে ধরা হয়। ওই সময়ের অল্পস্বল্প যা জানা গেছে তার উপর নির্ভর করে বলা চলে যে, ষোলোটি রাজ্য নিয়ে আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতবর্ষ গঠিত হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যে নয়, আর্যাবর্তে যিনি প্রধান হতে পারতেন, তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বা সম্রাট বা ছত্রপতি বলে স্বীকার করা হত। দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তকে আলাদা করে রেখেছিল প্রধানত বিন্ধ্য শৈলশ্রেণি।

কিন্তু তখনও ভারতে কেউ ছত্রপতি বা সম্রাট বলে পরিচিত হননি।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে বা বৌদ্ধ জাতকে আর্যাবর্তের একাধিক শক্তিশালী নরপতির সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের কেউ 'ছত্রপতি' বলে মানত না। প্রাদেশিক রাজার দল পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, ছত্রপতি হবার শক্তি বা অবসর তাঁদের ছিল না।

সত্যিকথা বলতে কী, তখনও ভারতে যথার্থ ঐতিহাসিক যুগ আসেনি।

গ্রিক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর ভারত আক্রমণের ফলেই খুলে যায় এখানে ইতিহাসের বদ্ধ দ্বার। এ হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। পঞ্চনদের সেন্যরা রণক্ষেত্রে পরাজিত হল বটে, কিন্তু আর একদিক দিয়ে ভারতের হল পরম লাভ। সে নিজেকে খুঁজে পেলে ইতিহাসের আলোকে।

ভারতের প্রত্যন্ত দেশে আলেকজান্ডারের শিবিরে যখন যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব চলছে, সেই সময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এক পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ ভারতীয় যুবক—তিনি গ্রিক নরপতির সঙ্গে দেখা করতে চান।

যথাসময়ে দেখা হল। আলোকজান্ডার শুধোলেন, 'কে তুমি?'

উত্তর হল, 'আমি মৌর্যবংশীয় এক রাজপুত্র, নাম চন্দ্রগুপ্ত।'

—'আমার কাছে কী দরকার?'

—'আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

—'কীরকম সাহায্য?'

ছত্রপতির ছত্রভঙ্গ

—'ভারতের প্রধান নরপতি হচ্ছেন মগধের অধীশ্বর মহাপদ্ম নন্দ। তাঁকে জয় করতে না পারলে ভারত জয় করা অসম্ভব। তিনি ভীষণ অত্যাচারী, তাঁরই জন্যে আমি আজ নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছি। প্রজারাও তাঁকে ঘৃণা করে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায়। আমি, সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে, তাঁকে আক্রমণ করবার সমস্ত অন্ধিসন্ধি বলে দিতে এসেছি।'

বুদ্ধিমান আলেকজান্ডার বুঝলেন, এই সুচতুর যুবক তাঁর সাহায্যে মগধ রাজ্য জয় করতে চায়। তিনি বললেন, 'আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে না। আমি নিজেই মগধ রাজ্য জয় করতে পারব।'

হতাশ হয়ে চন্দ্রগুপ্ত ফিরে এলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি গ্রিক ফৌজের অনেক বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে ভুললে না।

ভারতের প্রথম ছত্রপতি

কিন্তু গ্রিক দিগ্বিজয়ীকে মগধ রাজ্য জয় না করেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হল।

কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করবার পর আলেকজান্ডার রাজা পুরুকে হারিয়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী হলেও পুরুকে একজন প্রাদেশিক রাজা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। সুবৃহৎ মগধ রাজ্য অধিকার না করা পর্যন্ত ভারত-বিজেতা রূপে গৌরব অর্জন করা সম্ভব নয় (মগধ বলতে তখন বোঝাত উত্তর ও দক্ষিণ বিহার, বেনারস, কোশল ও অঙ্গ রাজ্য নিয়ে গঠিত বিপুল এক দেশ)।

অতএব আলেকজান্ডার মগধের দিকে সৈন্য চালনা করতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু সমস্ত গ্রিক সৈন্য—এমনকি সেনাপতিরাও একেবারে বেঁকে দাঁড়াল—কারণ তারা খবর পেয়েছিল যে, মহাপদ্ম নন্দের অধীনে আছে আশি হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার রথারোহী (তার মানে ষোলো হাজার যোদ্ধা—কারণ প্রত্যেক রথের উপরে থাকত দুইজন করে যোদ্ধা), এবং ছয় হাজার গজারোহী (অর্থাৎ আঠারো হাজার যোদ্ধা—কারণ প্রত্যেক হস্তীর উপরে থাকত তিন জন করে যোদ্ধা) সৈনিক।

আলেকজান্ডার বহু চেষ্টার পরেও তাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করতে না পেরে অবশেষে হতাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। গ্রিক ঐতিহাসিকেরই মতে, সে প্রত্যাবর্তন পলায়নেরই নামমাত্র—তাঁর ভারত জয় করা আর হল না।

আলেকজান্ডারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না বটে, কিন্তু সফল হল চন্দ্রগুপ্তের স্বপ্ন।

তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিপুল এক বাহিনী গঠন করে মহাপদ্ম নন্দকে পরাজিত ও নিহত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করলেন (৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। তাঁর অধীনে মগধের সৈন্যবল আরও বেড়ে উঠল---ত্রিশ লক্ষ অশ্বারোহী, ছয় লক্ষ পদাতিক, আরোহী সুদ্ধ নয় হাজার রণহস্তী এবং অসংখ্য রথ।

তারপর তিনি সমস্ত গ্রিকদের তাড়িয়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ পুনরাধিকার করলেন। ভারত বিদেশিদের নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত!

তখন আলেকজান্ডার আর ইহলোকে বিদ্যমান নেই। তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলিউকস ফিরে-ফিরতি পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করতে এসে বীর্যবন্ত চন্দ্রগুপ্তের কাছে খালি হেরেই গেলেন না, উপরন্তু বাধ্য হয়ে ভারতের বাইরেকার আরও কয়েকটি দেশ ছেড়ে দিয়ে নিজের কন্যাকেও তাঁর হাতে সম্প্রদান করলেন।

মাত্র আঠারো বৎসরের মধ্যে প্রায় অসম্ভবকেও সম্ভব করে চন্দ্রগুপ্ত যে বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন তার একদিকে ছিল বঙ্গোপসাগর এবং অন্যদিকে বইত আরব সাগর। চন্দ্রগুপ্তই ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বা ছত্রপতি।

আর্যাবর্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করে চন্দ্রগুপ্ত মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করে পুত্র বিন্দুসারের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রায়োপবেশনে বা অনশনে প্রাণত্যাগ করেন (২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। কথিত আছে পরে তিনি জৈনধর্ম অবলম্বন করেছিলেন।

সেলিউকসকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে ভারতের সীমা যতদূর বাড়াতে পেরেছিলেন, ইংরেজরা নিজেদের চূড়ান্ত গৌরবের যুগেও তা পারেনি। বিদেশি ঐতিহাসিকরা বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করা চলে।

যুবরাজ বিন্দুসার যখন সম্রাট হয়ে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিলেন দক্ষিণ দিক পর্যন্ত, তখন বোঝা যাচ্ছে তিনিও ছিলেন একজন বড়ো যোদ্ধা। তাঁর পুত্র মহামতি অশোক শান্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে অতুলনীয় হয়ে আছেন। এঁরাও ছিলেন ছত্রপতি, কিন্তু পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী হয়ে সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য হাতে না পেলে তাঁরা এতটা বড়ো হতে পারতেন না বলেই মনে হয়। কাজেই চন্দ্রগুপ্তের পর আর কোনও মৌর্য রাজার কথা না বললেও চলবে।

ছত্রপতি অশোকের পরেই মৌর্য বংশের প্রাধান্য লুপ্ত হয়। আর একজন ছত্রপতির জন্যে বহু কাল অপেক্ষা করবার পর (১২০ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন কুশান রাজবংশীয় সম্রাট কণিষ্ক। কিন্তু তাঁর কথা এখানে বলব না, কারণ তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করলেও বিজাতীয় শক ছিলেন।

কণিষ্কের অপঘাত-মৃত্যুর পর (১৬০ খ্রিঃ) আরও কিছুকাল পর্যন্ত শক সম্রাটেরা রাজত্ব করেন (২২০ খ্রিঃ)। তারপরেই তাঁদের প্রভুত্ব লুপ্ত হয় এবং নেমে আসে ঘনীভূত অন্ধকারের যবনিকা—তা ভেদ করে কিছুই দেখা যায় না। তারপর চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমেই দেখা যায় মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁকে প্রাদেশিক রাজা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

সূর্যোদয়ের ছত্রপতি

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের পর সমুজ্জ্বল সূর্যোদয়! প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর রাজদণ্ড ধারণ করলেন তাঁরই পুত্র সমুদ্রগুপ্ত—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাঁর নাম দিয়েছেন 'ভারতীয় নেপোলিয়ন'।

সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর পতাকার সামনে মস্তক নত করতে বাধ্য হয়। আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতে রাজত্ব করতেন তখন প্রধান নয়জন মহারাজা। সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের প্রত্যেককেই পরাজিত করেন এবং তার ফলে তাঁর রাজ্য পরিণত হয় সাম্রাজ্যে—সম্রাট অশোকের পর এত বড়ো সাম্রাজ্যের অধিকারী হননি আর কোনও ভারতীয় নরপতি—তার পশ্চিম দিকে ছিল আরব সাগর এবং পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর।

কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তবু তরবারি কোষবদ্ধ করলেন না, সসৈন্যে যাত্রা করলেন দাক্ষিণাত্যের দিকে। তারপর দেশের পর দেশ জয় করে দাক্ষিণাত্য উজাড় করে কল্পনাতীত ধনরত্ন নিয়ে আবার দেশে ফিরে এলেন এবং দিগ্বিজয়ী রূপে পৌরাণিক অশ্বমেধ যজ্ঞের পুনরানুষ্ঠান করলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের উপরে নিজের জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁকে দুই বৎসরের মধ্যে দুই থেকে তিন হাজার মাইল অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। সম্ভবত সমগ্র ভারতে যুদ্ধজয়ী হয়ে সমুদ্রগুপ্ত স্বদেশে ফিরে আসেন তিন শত পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এবং আর্যাবর্তের পৌরাণিক সম্রাটদের মতো ছত্রপতি রূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি বলেছেন, তিনি গানে এবং বাজনায় এবং কবিতা রচনায় সুনিপুণ ছিলেন। উপরন্তু তাঁর ছন্দসম্বন্ধীয় রচনাও আছে অনেকগুলি। তাঁর একটি দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় তাতে দেখি, সমুদ্রগুপ্তের পরনে হাত-কাটা ও হাঁটুর উপর পর্যন্ত বিস্তৃত পোশাক। অনেকটা একেলে চেয়ারের মতন আসনে উপবিষ্ট হয়ে তিনি বীণাবাদনে নিযুক্ত। বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে শাস্ত্র, সংগীত ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করে তিনি প্রভূত আনন্দ লাভ করতেন। বেশ বোঝা যায়, যুদ্ধের সঙ্গে কাব্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক প্রতিভাধর পুরুষ। এমন সর্বোত্তম প্রতিভার অধিকারী দিগ্বিজয়ী পৃথিবীর আর কোনও দেশে দেখা যায়নি।

সমুদ্রগুপ্তের পরলোক গমনের পর তাঁর পুত্র গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে সিংহাসনে বসে বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন এবং তিনিই হচ্ছেন চলতি ভারতীয় কথা ও কাহিনিতে প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনিও ছিলেন যোদ্ধা, ভারত থেকে শক প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত করে দেন। কিন্তু ছত্রপতির সম্মান লাভ করবার যোগ্য হলেও তাঁর বা গুপ্তবংশীয় আর কোনও সম্রাটের কীর্তি নিয়ে এখানে আলোচনা করব না, কারণ বিন্দুসার ও অশোকের মতো তাঁরাও সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

প্রায় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত আর্যাবর্তে গুপ্তবংশের প্রভুত্ব বজায় থাকে। ওই সময়েই রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ভারত কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্য নানা ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছিল। তারপরেই এখানে উপদ্রব আরম্ভ করে বিভীষণ ও নৃশংস হুন অত্যাচারীর দল। ভারত তখন আবার ছোটো-বড়ো নানা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে আর কেহই ছত্রপতি উপাধি অর্জন করবার অধিকারী হননি। তারপর সপ্তম শতাব্দীর প্রথম মুখেই দেখতে পাই আর একজন এমন বীরপুরুষকে, যিনি আর্যাবর্তের উপরে আপন বিজয়পতাকা উত্তোলন করে আবার ছত্রপতি আখ্যালাভের যোগ্য হতে পেরেছিলেন।

হিন্দুযুগের শেষ ছত্রপতি

তাঁর নাম হর্ষবর্ধন—তাঁর নিজের স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান আছে। তা দেখলে জানা যায়, নিজেকে তিনি 'মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ' বলে পরিচিত করতেন। হর্ষবর্ধনের আগে তাঁর বড়োভাই থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপরেই তিনি খবর পান যে তাঁর ভগ্নীপতি রাজা গ্রহবর্মণ মৌখারি মালবরাজের হস্তে নিহত হয়েছেন এবং তাঁর সহোদরা রাজ্যশ্রীকেও তিনি বন্দিনী করেছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা করে মালবরাজকে পরাজিত ও নিহত করলেন বটে, কিন্তু তারপরেই তিনি নিজেও

মধ্যবঙ্গের অধিপতি শশাঙ্কের হস্তে মারা পড়লেন এবং সেই অবসরে রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

রাজ্যবর্ধনের ছোটোভাই হর্ষবর্ধন তখন নানাদিকে খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে দেশে ফিরে আসেন এবং অবশেষে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ছয় শত ছয় খ্রিস্টাব্দে। বুদ্ধিমতী ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে হর্ষবর্ধন রাজ্যচালনা করতে থাকেন।

কিন্তু থানেশ্বরের সংকীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে হর্ষবর্ধনের চিত্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না, তাঁর মানসচক্ষে তখন জাগতে লাগল একই ছত্রের ছায়ায় সারা আর্যাবর্তকে এনে ছত্রপতি হবার সমুজ্জ্বল স্বপ্ন। এই সময়ে তাঁর ফৌজে ছিল পাঁচ হাজার গজারোহী, বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য। চিরাচরিত রীতি না মেনে ফৌজ থেকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে তিনি রথারোহী সেনাদের বাদ দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতে এবং দেশের পর দেশ হস্তগত করে অবশেষে হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরাপথের উপরে উড়িয়ে দিলেন নিজের বিজয় পতাকা। তাঁর সৈন্যসংখ্যাও যথেষ্ট বেড়ে উঠল। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলেন—ভারতবর্ষে আর কোনও বিক্রমশালী রাজার অস্তিত্ব তাঁর পক্ষে অসহনীয়। দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান নরপতি ছিলেন চালুক্যবংশের দ্বিতীয় পুলকেসিন। তিনি আগে থাকতেই সাবধান হয়ে আট-ঘাট বেঁধে বসেছিলেন, সে বাধা এড়িয়ে দক্ষিণ দিকে আর এগুতে না পেরে হর্ষবর্ধন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন (৬২০ খ্রিঃ)।

তারপর তাঁর শেষ যুদ্ধ হচ্ছে গাঞ্জামের বিরুদ্ধে। সাঁইত্রিশ বৎসর ধরে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে অবশেষে হর্ষবর্ধন তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। তারপর সম্রাট অশোকের অনুকরণে শান্তির মন্ত্র পাঠ করতে করতে তাঁর বাকি জীবনের কয়েকটা বৎসর কেটে গেল।

সমুদ্রগুপ্তের মতো হর্ষবর্ধনও ছিলেন যোদ্ধা হয়েও উচ্চশ্রেণির কবি। সমুদ্রগুপ্তের কোনও রচনা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু হর্ষবর্ধনের 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনখানি নাটকীয় রচনা আজও সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। কবি বাণ ছিলেন তাঁর সভাকবি।

কিন্তু শান্তির মন্ত্র পাঠ করেও হত্যাকারীর কবল থেকে হর্ষবর্ধন আত্মরক্ষা করতে পারেননি। তিনি নিহত হন ৬৪৬ কি ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

হর্ষবর্ধনের প্রায় দেড় শতাব্দীর পর বঙ্গবীর ধর্মপাল বিপুল সাম্রাজ্য গঠন করে ছত্রপতি রূপে সুদীর্ঘ চৌষট্টি বৎসর কাল রাজদণ্ড ধারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মে তিনি হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন বৌদ্ধ এবং সেইজন্যেই তাঁর কাহিনি এখানে বলা হল না। তবু প্রসঙ্গসূত্রে বলতে পারি, বাংলার এই বীর সন্তানের সাম্রাজ্যে বিস্তৃত ছিল বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে দিল্লি ও পাঞ্জাবের জলন্ধর এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য গিরিশ্রেণির উপত্যকা পর্যন্ত। ধর্মপাল ও তাঁর বংশধররা সাড়ে চার শতাব্দী ধরে রাজ্যচালনা করে বঙ্গদেশকে ভারতের অন্যতম প্রধান দেশ বলে পরিচিত ক রেছিলেন, এ তথ্যও উল্লেখযোগ্য।

পালবংশের পর আর কোনও স্বদেশি ও হিন্দু রাজবংশ আর্যাবর্তের উপরে একছত্র অধিকার স্থাপন করতে পারেনি।

নামে আর্যাবর্ত, কিন্তু সেখানে আর্যদের প্রভুত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল—কেবল বিতাড়িত শক ও হুনের দল রাজস্থানে আশ্রয় নিয়ে, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজপুত বলে প্রচার করে বহুকাল পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

আর্যাবর্তের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুলোভী বোলতার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আরব, তুর্কি, পারসি,

আফগান ও মোগল প্রভৃতি। মোগলেরা ও আফগানদের অনেকেই হিন্দুদের বুকে বসে ভারতকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করলে, কিন্তু তারপর ইউরোপ থেকে যারা আসতে আরম্ভ করলে তাদের বিদেশি লুণ্ঠনকারী দস্যু ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

প্রথমে এল পর্তুগিজরা, তারপর ওলন্দাজরা, তারপর ফরাসিরা। কিন্তু সর্বশেষে ইংরেজরা ছলে-বলে-কৌশলে সর্বগ্রাস করে গোটা ভারতবর্ষকে বিরাট এক গোলামখানায় পরিণত করলে।

কিন্তু সেটা কি সম্ভবপর হত? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, না। কেন, এইবারে তাই বলছি।

ঔরংজীবের রাজত্বকালে যখন মোগলদের গৌরবসূর্য নিস্তেজ হবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পায়নি, যখন দুর্ধর্ষ আফগান ও রাজপুতদেরও অনেকেই মোগলের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, সেই সময়েই সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে দাক্ষিণাত্যের আর-একজন হিন্দু বীর ভারতের অনেক অংশকে স্বাধিকারে এনে নিজেকে ছত্রপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরলোকগমনের পর আর কেউ এই মহান অবদানের গৌরব রক্ষা করতে পারেনি। বিধর্মীর অধীন ভারতবর্ষে তখন আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যকে কেউ আর আলাদা করে দেখত না।

দাক্ষিণাত্যে ছত্রপতির আত্মপ্রকাশ

তাঁর নাম শিবাজী। তাঁর প্রতিজ্ঞা ও জীবন-ব্রত ছিল, স্বাধীন হিন্দু ভারতবর্ষের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করা।

ঔরংজীব শিবাজীকে বশীভূত করবার জন্যে নিজের শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের প্রেরণ করেছিলেন—কিন্তু কেহই তাঁকে বাগে আনতে পারেননি। এমনকি ভারতবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ দিলির খাঁকে পর্যন্ত তাঁর হাতে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। শিবাজীকে বন্দি করে স্বয়ং ঔরংজীবও তাঁকে ধরে রাখতে পারেননি।

শিবাজীকে একসঙ্গে শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্য, বিজাপুর, পর্তুগিজ ও ইংরেজ প্রভৃতির সঙ্গে একা লড়তে হয়েছিল, তবু তিনি শেষ পর্যন্ত দুই শত চল্লিশটি দুর্গ দখল করে এবং বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে প্রকাণ্ড এক রাজ্য গঠন করতে ও সাত কোটি টাকা বার্ষিক আয়ের অধিকারী হতে পেরেছিলেন—তার উপরে ছিল তাঁর দ্বারা সঞ্চিত বিপুল অর্থ।

শিবাজীর রাজ্য বিস্তৃত ছিল উত্তর দিকে ধমরপুর থেকে দক্ষিণে বোম্বাই প্রদেশের গঙ্গাবতী নদীতট পর্যন্ত। পূর্ব দিকে তার সীমার মধ্যে গণ্য হত ভাগলানা, নাসিক ও পুনা প্রদেশ, সমগ্র সাতারা ও কোলহাপুর প্রদেশের অধিকাংশ। শেষের দিকে তিনি পশ্চিম কর্ণাটকের বেলগম থেকে মাদ্রাজের তুঙ্গভদ্রা নদীতীরবর্তী দেশ পর্যন্ত নিজের অধীনে আনতে পেরেছিলেন। মাত্র বাহান্ন বৎসর কয়েক মাস বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু (কারুর কারুর মতে বিষ খাইয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়) না হলে তিনি যে আরও কত দেশ নিজের দখলে আনতে পারতেন সেটা আজ কল্পনাও করা যায় না।

তাঁর ফৌজে ছিল পঁচাশি হাজার অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য। এবং তাঁর কামানের সংখ্যা ছিল দুই শত। অষ্টপ্রধান বা আটজন মন্ত্রীর (এঁদের মধ্যে মুখ্যপ্রধানকে পেশোয়া বলে ডাকা হত) সাহায্যে তিনি শাসনকার্য চালনা করতেন।

শিবাজী উপলব্ধি করলেন যথানিয়ম অনুসারে অভিষেক না হলে এবং মুকুট না পরলে কেউ তাঁকে মহারাজা বলে মানতে চাইবে না।

শিবাজীকে পেয়ে হিন্দুদের মনেও আশা জেগেছিল যে আবার হিন্দু গৌরবের পুনরুত্থান হবে এবং তারা লাভ করবে স্বরাজ ও নূতন ছত্রপতি।

ছত্রপতি উপাধি ও রাজমুকুট ধারণ করে শিবাজী গুরু রামদাসস্বামী ও মাতা জিজাবাইয়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। পতি পরিত্যক্তা জিজাবাইয়ের সেদিন কী আনন্দ, মৃত্যুর মাত্র বারো দিন আগে তিনি দেখে যেতে পারলেন যে, তাঁর আদরের পুত্র কত শতাব্দীর পর অধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ভারতের প্রথম দিগ্বিজয়ী ও ছত্রপতি!

অভিষেক মহোৎসবে শিবাজী মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করেছিলেন। সারা ভারতের নানা দেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে যেসব ব্রাহ্মণ পত্নী ও সন্তানসন্ততি নিয়ে রায়গড়ের উৎসবক্ষেত্রে এসে হাজির হন, তাঁদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। চার মাস ধরে তাঁরা নূতন হিন্দু-ছত্রপতির আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। সবসুদ্ধ নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ! অভিষেকের জন্যে খরচ হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—এ যুগের হিসাবে তখনকার পঞ্চাশ লক্ষের মূল্য কী অসামান্য হয়ে উঠবে তা অনুমান করতে গেলে বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়!

বহুশতাব্দীব্যাপী ঘৃণ্য অধীনতার অভিশাপ বহন করে সারা ভারতবর্ষ যখন প্রায় জীবন্মৃত হয়ে পড়েছিল, সেই সময়েই সর্বপ্রথমে ছত্রপতি শিবাজী আত্মপ্রকাশ করেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদূতের মতো। সমগ্র ভারতের দেশে দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে জপমন্ত্রের মতো। আধুনিক যুগেও কেউ তাঁকে ভোলেনি।

সুদূর বঙ্গদেশও তাঁকে নিতান্ত আপন বলে মনে করেছে, তাই 'স্বদেশি' আন্দোলনের সময়েও তাঁর কাছে প্রেরণা লাভ করে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন—

'মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী!
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।'

ছত্রপতির স্বপ্নভঙ্গ

শিবাজী যে সাম্রাজ্যের প্রাথমিক কাজ শেষ করে গিয়েছিলেন তাঁর বংশধরেরা যদি তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন, তাহলে কোথায় থাকত মোগল ও ইংরেজের প্রতাপ—আজ হয়তো ভারতের নীলাকাশের তলায় বাতাসের তালে তালে সগৌরবে উড়ত শিবাজী পরিকল্পিত গৈরিক পতাকা!

কিন্তু তা হয়নি। শিবাজীর দুই পুত্র—শম্ভুজী ও রাজারাম—সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা পিতার প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন! তাঁরা ছিলেন শিবাজীর অযোগ্য সন্তান।

গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী হয়ে সমুদ্রগুপ্ত পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্যকে

পরিণত করেছিলেন এক বিরাট সাম্রাজ্যে। তেমন যুদ্ধপ্রতিভা, বুদ্ধি ও শক্তি শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের কারুর ছিল না, তাই ছত্রপতি শিবাজীর প্রসাদে অমন এক সুপরিচালিত ও সুবৃহৎ রাজ্য ও বিপুল বাহিনী হাতে পেয়েও চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া তাঁরা আর কিছুই করতে পারেননি। শম্ভুজী তো মোগলের হাতে বন্দি হয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে নিষ্কৃতিলাভ করেননি।

তারপর রাজ্যচালনার ভার পড়ে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীদের উপরে। তাঁরা তখন সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁদের মনীষা, কূটনীতি ও সামরিক শক্তি শিবাজীর সৃষ্ট রাজ্যকে ক্রমেই আকার বাড়িয়ে ভারতের মধ্যে প্রধান করে তুললে।

তারপর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া বালাজীর অধীনে মারাঠিদের গৌরব উঠল উন্নতির চরম শিখরে—পেশোয়া বালাজী রাও তাঁর সেনাপতি সদাশিব রাওয়ের সাহায্যে দিল্লি অধিকার করলেন এবং বাদশাহ দ্বিতীয় সাজাহানকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ঘোষণা করলেন—অতঃপর সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হলেন আলি গহর বা দ্বিতীয় শা আলম।

সারা ভারতে জাগ্রত হল অভাবিত বিস্ময়। হিন্দুর কবলগত রাজধানী দিল্লি! সকলে ভাবতে লাগল—আজও নামমাত্র সার হয়ে বাদশাহ বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু যে প্রবল শক্তি সম্রাটকে সিংহাসনে ওঠাতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সে স্বয়ং প্রভু হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতীয় জনসাধারণ স্বপ্নে দেখতে লাগল, আবার এক নূতন হিন্দু ছত্রপতির ছবি।

কিন্তু সে দিবাস্বপ্ন ভেঙে যেতে বিলম্ব হল না। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আহাম্মদ শা আবদালি শেষ বারের মতো ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠিদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করলেন।

কিন্তু এটা সম্ভবপর হত না যদি পেশোয়া বালাজী রাও স্বয়ং সশরীরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর অবর্তমানে প্রধান প্রধান সেনাপতিরা সাংঘাতিক আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধজয়ের যে কোনও আশাকেই নির্মূল করে দিয়েছিল।

হিন্দুদের সেদিনকার দুর্ভাগ্য স্মরণ করলে মন শিউরে না উঠে পারে না।

কেবল যে বাইশ হাজার স্ত্রী-পুরুষ (মারাঠিদের শিবিরে বহু নারীও ছিল) আফগানদের হাতে বন্দি হল তা নয়, যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত হল বিরাট এক মারাঠি শবস্থানে। আটাশ হাজার মারাঠির মৃতদেহে পানিপথের রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়ে গেল। তার উপরে শিবিরে শিবিরেও পাওয়া গেল কত হাজার মৃতদেহ তার সংখ্যা কেউ জানে না। পানিপথ শহরেও আশ্রয় নিতে গিয়ে এক দিনেই মারা পড়ে প্রায় নয় হাজার মারাঠি। বিজেতাদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে যেসব রাস্তা ও জঙ্গল দিয়ে মারাঠিরা পলায়ন করেছিল সেসবও ছেয়ে গেল শবদেহে শবদেহে।

প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্রে বারংবার মৃত্যুকে স্মরণ করেও যখন মৃত্যুকে লাভ করলেন না, তখন তাঁর মনে এই দুর্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছিল, অতঃপর কেমন করে পুনায় ফিরে পেশোয়াকে তিনি মুখ দেখাবেন!

কিন্তু তাঁর বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নভূষণের দিকে আকৃষ্ট হয়ে একদল আফগান তেড়ে এসে গর্জন করে বললে, 'এই কাফের, যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাস, তাহলে এখনই আত্মসমর্পণ কর!'

কিন্তু পরাজিত সদাশিব নিজের প্রাণ বাঁচাতে চান না, তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না। আহত অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই শত্রুদলের মধ্যে অসিহস্তে সিংহবিক্রমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং একাই তিন-চারজন শত্রুর প্রাণবধ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

মারাঠার প্রত্যেক পরিবার থেকে কেউ না কেউ পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

কিন্তু তখনও মারাঠিদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ছত্রপতি শিবাজীর সঞ্জীবক আদর্শ তখনও জাতির মধ্যে একনায়কত্বের আশা লুপ্ত হতে দেয়নি। কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই মারাঠিরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারা আবার ভারতের রাজধানী দিল্লি আক্রমণ ও অধিকার করলে এবং আবার নির্বাসিত বাদশাহ্ শা আলমকে সঙ্গে করে এনে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল (১৭৭১ খ্রিঃ)।

কিন্তু সে হচ্ছে নেববার আগে প্রদীপের শিখা জ্বলজ্বল করে ওঠার মতো। ব্রিটিশ সিংহ তখন পলাশির যুদ্ধ জিতে শক্তিসঞ্চয় করে প্রবল হয়ে উঠেছে। কিছুদিন যেতে না যেতেই যোদ্ধা ও রাজনৈতিক লর্ড ওয়েলেসলি আবার মারাঠিদের রণক্ষেত্রে অনায়াসে পরাস্ত করে তাদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন।

তারপর বহুদিন আমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ব্রিটিশ সিংহ অবশেষে শ্বেতদ্বীপে নিজের ডেরায় পালিয়ে গিয়েছে। ভারত এখন স্বাধীন।

আজ প্রজাতন্ত্রের জয়জয়কার। কেউ আর এখানে ছত্রপতি হতে চায় না, কারণ একনায়কত্বের যুগ বিগত।

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন

প্রস্তাবনা

গোলদিঘির কাছাকাছি ছোটো একটা গলি।

একখানা বাড়ি, তার সামনের দিকে তলায় আছে একটি কেতাবের দোকান। পাশের শুঁড়িপথ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে, সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠে সামনেই পাওয়া যায় মাঝারি একখানা ঘর। দরজা দিয়ে পুরু পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেই মনে জাগে এক অভাবিত বিস্ময়। মেঝের উপর পাতা এমন পুরু ও নরম কার্পেট যে, তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালে পা-দুটো বসে যায় নীচের দিকে। চারদিকের দেওয়ালে বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা কয়েকখানা ছবি, দামি ফ্রেমে বাঁধানো। ঠিক মাঝখানে রঙিন ইতালিয়ান মার্বেলের একটি বড়ো গোলটেবিল। টেবিলের চারপাশে খানকয় গদি-আঁটা ঝকঝকে চেয়ার। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুখানা করে সোফা এবং একখানা করে কৌচ। তার উপরে সাজানো নরম নরম 'কুশন'গুলো নীরবে অতিথিদের জানাচ্ছে যেন সাদর আহ্বান। পশ্চিম দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড মূল্যবান 'অর্গ্যান'। তার উপরে 'পোর্সিলেন'-এর আধারে সাজানো মরশুমি ফুলের ঝাড়। প্রবেশ পথের উপরে দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়ি ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দুখানা তরবারি। কড়িকাঠ থেকে ঘরের মাঝখানে ঝুলছে মস্ত বড়ো একটা বৈদ্যুতিক বাতির ঝাড়। দেখলেই বোঝা যায় ঘরের মালিকের রুচি ও ঐশ্বর্যের অভাব নেই।

গোলটেবিলটার একধারে বসে আছে দুইজন এবং আর-একদিকে বসে আছে আর-একজন লোক। ধরনধারণ দেখলে মনে হয় শেষোক্ত ব্যক্তিই বাড়ির কর্তা।

টেবিলের উপরে রয়েছে একটি 'ডিকান্টার' ও তিনটি মদের গেলাস। কথা কইতে কইতে মাঝে মাঝে তারা দিচ্ছিল গেলাসে চুমুক।

কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা দৃশ্য। কালো রঙের রুমাল দিয়ে তিনজনেরই মুখ ঢাকা।

দুইজন লোকের একজন বললে, 'আমাদের কী করতে হবে এখনও শুনতে পেলুম না।' তার কণ্ঠস্বরে অধীরতার আভাস।

আর-একজন বললে, তেমনি অধীর স্বরেই বললে, 'আর এই ছেলেখেলার অর্থও তো বুঝতে পারছি না। রুমাল দিয়ে আমরা মুখ-চোখ ঢেকে আছি। যে মোটরে করে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে তার জানলাগুলোও ঢেকে রাখা হয়েছিল পর্দা দিয়ে—যাতে আমরা বুঝতে না পারি কোথায় আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে!'

যাকে কর্তা বলে মনে হয়, সেই লোকটি প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'এখনই সবই শুনতে পাবেন।' তারপরেই হাততালি দিলে দুইবার।

পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একজন লোক। তার হাতে একটা সিগারেটের কৌটো এবং একটা চুরুটের বাক্স। মৌন মুখে এগিয়ে এসে সে টেবিলের উপরে রেখে দিলে সেই কৌটো ও বাক্সটা। তারপর ধীরে ধীরে শুধোলে, 'কী কর্তা?'

কর্তা বললে, 'তুমি আর-সবাইকে নিয়ে এখনই বাড়ি থেকে চলে যাও। বাড়িতে যেন কেউ না থাকে। রাত ঠিক সাড়ে নয়টার সময় বাড়ির সামনে গাড়ি-টাড়ি প্রস্তুত রাখা চাই।'

—'যে আজ্ঞে' বলে লোকটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে 'কর্তা' নামে পরিচিত লোকটি

বললে, 'বাড়ির ভিতরে আর-কোনও বাইরের লোক নেই। এইবারে আমি আপনাদের কৌতূহল নিবারণ করব।'

আরও কাছে সরে এসে বসল অন্য দুই মূর্তি।

এক ঘণ্টা পরে হাতের চুরুটটা ভস্মাধারে নিক্ষেপ করে কর্তা বললে, 'মশাই, এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। গুপ্তধন যে কোথায় আছে তা আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তবে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি একেবারেই নিশ্চিত। কেবল মাঝখানে আছে একটি স্ত্রীলোক। তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'স্ত্রীলোক নিয়ে আমি কোনও দিনই মাথা ঘামাই না।'

তৃতীয় ব্যক্তি বললে, 'কিন্তু আমাদের একান্ত ভাবেই নির্ভর করতে হবে আপনার উপরেই।'

কর্তা বললে, 'তা ছাড়া আপনাদের আর কোনও উপায়ও নেই। আমি যা বলব, আপনাদের অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে হবে। হয়তো আপনারা ভাবছেন, গুপ্তধন পেলে পর শেষ পর্যন্ত আমি আপনাদের ঠকিয়ে সরে পড়ব। হয়তো তা সম্ভবপর, হয়তো তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই ঝুঁকিটা আপনারা নিতে রাজি আছেন কি?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'তা যদি বলেন, তবে শেষ পর্যন্ত আমরাও তো আপনাকে ঠকিয়ে সরে পড়তে পারি?'

—'না মশাই, না।' কর্তার কণ্ঠে ফুটল একটা হাস্যধ্বনি—একসঙ্গে তা মৃদু ও কঠিন। তারপর সে আবার বললে, 'না মশাই, না, আপনারা তা পারেন না। আপনাদের দুজনের নাড়ি-নক্ষত্র আছে আমার নখদর্পণে, কিন্তু আমার কোনও পরিচয়ই আপনারা জানেন না!'

অপর দুই ব্যক্তি সচমকে উঠে দাঁড়াল—যেন এখনই তারা কর্তার উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। হঠাৎ নিজের পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কর্তা চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসল। অন্য-দুই ব্যক্তি আবার আসন গ্রহণ করলে।

কর্তা মৃদু ও কঠিন স্বরে তেমনি হাস্য করে বললে, 'আপনাদের আর কোনও প্রশ্ন আছে কি?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'হ্যাঁ। আপনি যে কৃপাপরবশ হয়ে গুপ্তধনের অংশ দেবার জন্যে আমাদের ডেকে এনেছেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আসল কথাটা কী বলুন দেখি?'

—'ঠিক। এমন প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। আপনাদের ডেকে আনবার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, একলা আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল হবে না, আমার সাহায্যকারীর দরকার। দ্বিতীয় কারণ, যে কোনও ছিঁচকে চোরকে নিয়ে আমার কাজ চলবে না। আমি চাই এমন দুইজন লোক, যারা শিক্ষিত অথচ হিতাহিত জ্ঞানের ধার ধারে না। আরও কয়েকটি গৌণ কারণ আছে, কিন্তু আপাতত তা উল্লেখ করবার দরকার নেই।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'উত্তম। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি।'

তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে কর্তা বললে, 'আর আপনি?'

সে বললে, 'আমিও রাজি।'

কর্তা বললে, 'আপনাদের ধন্যবাদ। তাহলে আপাতত এই পর্যন্ত—ঘড়িতে ঠিক নয়টা। বাড়ির

বাইরেই আপনাদের দুজনের জন্যে দুখানা 'মোটর-কার' অপেক্ষা করছে। আপনারা এখন যে যার বাসায় গিয়ে উঠতে পারেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সকলেরই মুখ ঢাকা। কিন্তু উপায় নেই, এখনই আত্মপ্রকাশ করলে ভবিষ্যতে আমাদের অসুবিধা হতে পারে। অতএব আজ বিদায়, নমস্কার।'

কর্তা আবার দিলে দুইবার হাততালি। ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল দুজন লোক। পরনে তাদের মোটরচালকের পোশাক।

কর্তা বললে, 'এই দুই ভদ্রলোককে এঁদের ঠিকানায় পৌঁছে দাও।'

তারা চলে গেলে পর কর্তা দাঁড়িয়ে উঠে আবার একটা নতুন সিগার ধরালে।

মোটরচালকের পোশাক পরা আর এক ব্যক্তি ঘরের ভিতরে ঢুকে সেলাম করে বললে, 'হুজুর, ওরা চলে গিয়েছে। এখন আপনিও তো বাড়িতে যাবেন?'

মুখের উপর থেকে আবরণটা খুলে ফেলে কর্তা বললে, 'হ্যাঁ তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো গে, আমি এখনই যাচ্ছি।'

লোকটা চলে গেল। কর্তা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট-খানেক। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে কী দেখে হঠাৎ সে চমকে উঠল। হেঁট হয়ে জিনিসটা সে তুলে নিলে। একখানা পকেটবুক। সেখানা খুলেই তার দৃষ্টি আবার হয়ে উঠল সচকিত। সে নিজের মনেই বললে, 'তাহলে এখানে নিশ্চয়ই বাইরের কোনও লোক এসেছিল!' পাশেই রয়েছে আর-একটা ঘরের দরজা। পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বার করে এগিয়ে গিয়ে সে দরজা খুলে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'কে এখানে আছ? একটু নড়লেই এখনই গুলি করে মেরে ফেলব।'

বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা টর্চ বার করে তার সমুজ্জ্বল আলোকরেখা ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করেই সে তাড়াতাড়ি সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'একী ব্যাপার!'

সেখানে মেঝের উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে রয়েছে একটা মনুষ্য-মূর্তি।

প্রথম
গোবিন্দদাসের গুপ্তধন

পুলিশ কমিশনার শ্রীসুধাকান্ত চৌধুরি কী একখানা কাগজ পড়তে পড়তে রেখে দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলেন।

একজন উর্দিপরা লোক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। কমিশনার বললেন, 'বসন্তবাবুকে একবার আমার এখানে আসতে বলো।'

বসন্তকুমার রায় হচ্ছেন গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী কমিশনার। একটু পরেই তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'খবর কী?'

সুধাকান্ত বললেন, 'তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই।'

বসন্ত নীরসকণ্ঠে বললেন, 'কাজের ভার? আমি তো এইমাত্র ভাবছিলুম, এক মাসের জন্যে ছুটির দরখাস্ত করব।'

সুধাকান্ত বললেন, 'আপাতত ছুটির কথা ভুলে যাও। তোমাকে একটা জরুরি সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

—'জরুরি সমস্যা! সেই সাদা সওয়ারের মামলা নয় তো?'

—'ঠিক তাই। একাজে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর নেই।'

বসন্ত দুই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সাদা সওয়ারের নিকুচি করেছে। তাকে নিয়ে প্রেততত্ত্ববিদরা যত খুশি মাথা ঘামাতে পারে, কিন্তু আমি কেন? আমি তো ভূতের রোজা নই!'

—'বসন্ত, যা শুনছি, এ হচ্ছে একটা নিরেট শরীরী ভূত। হাতকড়ি পরাতে গেলে হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারবে না। তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে তোমাকেই। রাধাপুর কোথায় জানো তো?'

—'জানি। কলকাতার খুব কাছেই। অথচ বন্য জায়গা।'

—'কিন্তু সেখান থেকে তুমি অনায়াসেই টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।'

—'এ সম্বন্ধে আপনি আরও কিছু খবর রাখেন?'

—'রাখি। তুমি গোবিন্দদাসকে ভোলোনি তো?'

বসন্ত নীরবে ভাবতে লাগলেন। গোবিন্দদাস, তার আরও কয়েকটি ছদ্মনামের সঙ্গে পুলিশ পরিচিত আছে। তারা বংশানুক্রমে খ্রিস্টান। তার স্বর্গীয় পিতা ছিলেন ধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড, কিন্তু অমন পিতার পুত্র হয়েও গোবিন্দদাস নাম কিনেছে প্রতারক রূপে। সরকারি আবগারি বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে সে দেশের নানা জায়গায় গোপনে কোকেন ও আফিম প্রভৃতি সরবরাহ করত। এদেশে এমন আর কেউ ছিল না, তার সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে। প্রাণপণ চেষ্টার পরেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি, তার মৃত্যু হয়েছে গত বৎসরে।

সুধাকান্ত বললেন, 'সকলেই জানে গোবিন্দদাস ছিল একজন ধনকুবের। কিন্তু তার মৃত্যুর পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গোবিন্দদাসের নামে ব্যাংকে জমা আছে মাত্র কয়েক হাজার টাকা।'

বসন্ত বললেন, 'আশ্চর্য নয়। এ শ্রেণির অপরাধীরা দুই হাতে টাকা রোজগার করে, আবার দুই হাতেই তা উড়িয়ে দিতে পারে।'

—'তা পারে। কিন্তু গোবিন্দদাস এ দলের লোক ছিল না।'

বসন্ত হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আপনি আমাকে রাধাপুরে যেতে বলছিলেন না? আমার মনে পড়েছে, রাধাপুরে গোবিন্দদাসের একখানা বাড়ি আছে।'

সুধাকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক! সেই রাধাপুরেই শুরু হয়েছে সাদা সওয়ারের উৎপাত। লোকে বলে, সেখানে কোনও এক জায়গায় গোবিন্দদাস তার গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গিয়েছে। তোমার কি মনে হয় না, সাদা সওয়ারের এই আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সেই গুপ্তধনের কোনও সম্পর্ক আছে?'

বসন্ত কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'গোবিন্দদাসের একটি মেয়ে আছে না?'

—'ঠিক নিজের মেয়ে নয়। গোবিন্দদাস এক বিধবাকে বিবাহ করেছিল। তার প্রথম পক্ষের স্বামীর ঔরসে এই মেয়ের জন্ম হয়। অবশ্য গোবিন্দদাস তাকে নিজের মেয়ের মতোই সযত্নে লালন-পালন করেছিল।'

—'সেই মেয়েটির কথা আপনি কি কিছু জানেন?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। তোমাকেই তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমার সন্দেহ হয়, সেই মেয়েটি তার পিতার গুপ্তধনের কোনও-না-কোনও খবর রাখে। খুব শীঘ্রই হয়তো সাদা সওয়ারের মনেও জাগবে এই সন্দেহ। তখন তার দৃষ্টি পড়বে ওই মেয়েটির দিকেই। কিন্তু তার আগেই আমি তোমাকে ঘটনাস্থলে হাজির থাকতে বলি। তোমার কর্তব্য বুঝেছ তো?'

—'বুঝেছি। কিন্তু সাদা সওয়ারকে আপনি এর সঙ্গে জড়িত করতে চাইছেন কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকেই আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাব। যদি দরকার মনে করো তাহলে তুমি শোহনলালকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো। শোহনলালের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে তো?'

—'হয়েছে। সে ভুল করে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। লোকটিকে চালাক-চতুর বলে মনে হয়। দু-দিনেই আমার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছে।'

সুধাকান্ত বললেন, 'তাহলে তাকেও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

—'না।'

—'উত্তম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাদা সওয়ারের রহস্যটা আবিষ্কার করতে তোমার বেশি দেরি লাগবে না।'

—'হ্যাঁ। যদি তার ছায়ামূর্তির মাঝখানে কায়ার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে আমাকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না কিছুতেই।' এই বলে বসন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয়
চন্দ্রকান্ত চন্দ্র

চৌরঙ্গি অঞ্চলে একখানা লম্বা-চওড়া দোকানঘর। শহরের ধনী ও শৌখিন ব্যক্তিরা দামি আসবাব-পত্তরের আবশ্যক হলে সেখানে পদার্পণ করেন। সেই দোকানের মালিক হচ্ছে শ্রীচন্দ্রকান্ত চন্দ্র। বয়সে সে প্রৌঢ়, রীতিমতো জাঁদরেলের মতো চেহারা। পরনে সাহেবি পোশাক, যদিও তার গায়ের রং দেখলে কাফ্রিরা তাকে স্বজাতীয় বলে সন্দেহ করতে পারে!

দোকানের পিছন দিকে তার নিজস্ব কামরা—অর্থাৎ আফিসঘর। আধুনিক কেতায় সাজানো আফিসঘর। টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, টাইপরাইটার এবং সেই সঙ্গে একটি তরুণী সেক্রেটারি, কিছুরই অভাব নেই।

কিন্তু পুলিশ তাকে সন্দেহ করে। কেন যে সন্দেহ করে, সে-সম্বন্ধে পুলিশেরও পরিষ্কার ধারণা নেই। কিন্তু তারা মনে মনে বিশ্বাস করে, চন্দ্রকান্তের এই দোকান এবং আফিস হচ্ছে একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। এর আড়ালে বসে তলে তলে সে-যে কী করে, তা জানবার জন্যে পুলিশের যথেষ্ট আগ্রহের অভাব নেই।

সেদিন বৈকালে চন্দ্রকান্ত মুখে মুখে একখানা ব্যাবসা সংক্রান্ত পত্র রচনা করে যাচ্ছিল এবং টেবিলের অপর প্রান্তে বসে তা লিখে নিচ্ছিল তার সেক্রেটারি। সে হচ্ছে তরুণী এবং রূপসী। তার নাম রত্না। লেখা শেষ করে রত্না শুধোলে, 'আমি কি এখনই চিঠিখানা 'টাইপ' করে আনব?'

হর্নের ডাঁটিওয়ালা চশমার ভিতর দিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে চন্দ্রকান্ত বললে, 'বিশেষ তাড়া নেই, চিঠিখানা কাল 'টাইপ' করলেও চলবে।'

রত্না বললে, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কাল থেকে সাত দিন আমাকে ছুটি দিয়েছেন। আমি এখনই এখানা 'টাইপ' করে আনছি।' বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

চন্দ্রকান্ত হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত ধরে বললে, 'প্রিয় রত্না, একটু দাঁড়াও। তুমি যে সুন্দরী, একথা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই। আমি ইচ্ছা করি না এই ভাবে চাকরি করে তুমি নিজের জীবনটা কাটিয়ে দাও। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, চাকরি ছেড়ে তুমি আরও অনেক কিছুই করতে পারো।'

রত্না গম্ভীর ভাবে বললে, 'আমি যা করছি তাই আমার ভালো। এসব কথা ভেবে আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

—'তুমি সাত দিনের ছুটি নিয়েছ, নয়? তুমি রাধাপুরে থাকো? ওখানে আমারও একখানা বাগানবাড়ি আছে। আমারও সেখানে যাবার ইচ্ছে হয়, কেবল কাজের ভিড়ে পারি না।'

টান মেরে চন্দ্রকান্তের মুষ্টির ভিতর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রত্না বললে, 'আপনার কোথায় বাগান আছে আর কোথায় যেতে ইচ্ছে হয়, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

চন্দ্রকান্ত কর্কশ স্বরে বললে, 'মনিবের সঙ্গে ভালো করে কথা কইতে শেখো।'

রত্না শান্ত সুরে বললে, 'মনিবের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয়, আমি তা ভালো করেই জানি।'

চন্দ্রকান্ত গলার আওয়াজ আবার নরম করে বললে, 'প্রিয় রত্না, আমার উপরে রাগ কোরো না। আমি তোমাকে সত্য সত্যই ভালোবাসি।'

রত্না হাতের চিঠিখানা ছিঁড়ে দুই খণ্ড করে ফেললে। তারপর সেই কাগজের টুকরো দুটো দূরে নিক্ষেপ করে বললে, 'আপনি নতুন কোনও সেক্রেটারি নিযুক্ত করবেন। নমস্কার, আমি চললুম।'

চন্দ্রকান্ত এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রত্নাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে, তার গণ্ডদেশের উপরে গিয়ে পড়ল চন্দ্রকান্তের উত্তপ্ত নিশ্বাস। সে নিম্নকণ্ঠে প্রায় গর্জে উঠেই বললে, 'এমন ভাবে তুমি এখান থেকে সরে পড়তে পারবে না। নিজেকে তুমি কী মনে করো? তোমার বাবা আবগারি বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে অনেক কাণ্ডই করেছে! সেই বাপেরই তো মেয়ে তুমি? না, তুমি ঠিক তার নিজের মেয়ে নও, তোমার আপন বাপ ছিল তোমার মায়ের আগেরকার স্বামী। আমি তোমাকে এখানে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছি তাই, নইলে—'

চন্দ্রকান্তকে সজোরে এক ধাক্কা মেরে রত্না নিজেকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলে। তারপর তার গণ্ডদেশে সশব্দে এক চপেটাঘাত করে সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, 'লম্পট!' বলেই দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত বাস করত গঙ্গার ধারের একখানা বাড়িতে।

সেই দিন রাত্রে আহারাদির পর সে বসে বসে ধূমপান করছে এবং মনে মনে ভাবছে: আসছে কাল আমিও গিয়ে হাজির হব রাধাপুরে। সেখানে আমার অনেক কাজ। গোবিন্দদাসের গুপ্তধন! সাদা

সওয়ার! গোবিন্দদাসের কন্যা রত্না! মনে হচ্ছে, এসবের ভিতরেই একটা কোনও গূঢ় সম্পর্ক আছে। সুতরাং ভবিষ্যতে রাধাপুরে উপস্থিত না হলে আমার চলবে না।

তার চিন্তায় বাধা পড়ল। ভৃত্য ঘরে ঢুকে তার হাতে দিলে একখানা খাম।

খামের ভিতরে ছিল বাংলা টাইপ রাইটারে লেখা একখানা পত্র।

চন্দ্রকান্ত নিষ্পলক নেত্রে পাঠ করলে

'চন্দ্রকান্ত, তুমি বোধহয় রাধাপুরে আসতে চাও? আসতে পারো—কিন্তু সাবধান, তোমার ওই অপবিত্র হাত দিয়ে আর কোনওদিন রত্নাদেবীকে স্পর্শ কোরো না। যদি করো, তাহলে কী হবে জানো? রাধাপুরের মাটির উপরেই পড়ে থাকবে তোমার নিশ্চল মৃতদেহ।'

পত্রপাঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভিতরে বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে চন্দ্রকান্ত উঠে গেল কলের পুতুলের মতন। 'রিসিভার'টা হাতে নিয়েই শুনলে এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

সেই কণ্ঠস্বর বললে, 'কে, চন্দ্রকান্ত নাকি? তোমার ছুটির দরকার হয়েছে। কাল সকালে উঠেই রাধাপুরে চলে যাও। তারপর তোমাকে কী করতে হবে, তা আমিও জানি আর তুমিও জানো। বুঝেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমার আর যা বক্তব্য আছে, পরে যথাসময়েই শুনতে পাবে। 'ফোন' ছেড়ে দাও।'

চন্দ্রকান্ত কম্পিত হস্তে সদ্যপ্রাপ্ত পত্রখানা আবার বিস্ফারিত চক্ষের সামনে ধরে পাঠ করতে লাগল। তার সমস্ত দেহ পাথরের মূর্তির মতো আড়ষ্ট!

তৃতীয়

সাদা সওয়ার ও গুপ্তধন

শোহনলাল জাভার পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা এবং জাতেও সে বাঙালি নয় বটে, তবে ভারতেই তার জন্ম। এবং সে ঠিক বাঙালির মতোই অনর্গল কথা কইতে পারে বাংলা ভাষায়। বিশেষ কোনও অপরাধীর সন্ধানে তাকে আসতে হয়েছে কলকাতায়।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এমন বাংলা শিখলে কেমন করে?'

শোহন হেসে বললে, 'প্রথম জীবনে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত কেটে গিয়েছে আমার বাংলা দেশেই। লেখাপড়াও শিখেছিলুম আমি এইখানেই। কাজেই বাংলা হয়ে পড়েছে আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতো।'

কেবল তাই নয়, নিজের মোটর নিজের হাতেই চালাতে চালাতে শোহনলাল রাধাপুর সম্বন্ধেও অনেক প্রাচীন তথ্যের সন্ধান দিয়ে বসন্তকে রীতিমতো বিস্মিত করে তুললে। বাংলা দেশের লোক হয়েও বসন্ত এসব কথা জানতেন না।

শোহনলাল বললে, 'আমরা যাচ্ছি সাদা সওয়ারকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু সাদা সওয়ারের উৎপত্তি কোথায় জানেন?'

—'না।'

—'কিংবদন্তি বলে, চারশো বছর আগে এ অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম রাধারমণ রায়। রাধাপুরের নামকরণ হয়েছে তাঁরই নামানুসারে। রাজা রাধারমণ একবার তাঁর কোনও প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ছাউনি ফেলে তিনি যখন শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় গুপ্তচরের মুখে হঠাৎ খবর পেলেন, তাঁর রানি অবিশ্বাসিনী। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর প্রণয়ীর আলিঙ্গনে আত্মদান করেছেন। সংবাদ শুনেই রাজা রাধারমণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন! শত্রুর কথা ভুলে তিনি তৎক্ষণাৎ এক দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাধাপুরে ফিরে আসেন, তারপর প্রণয়ীর সঙ্গে রানিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেন। অতঃপর এক রক্তাক্ত দৃশ্যের অভিনয় হয়। তরবারির আঘাতে রানি ও তার প্রণয়ীর মুণ্ডচ্ছেদ করে রাজা আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরে যান, আর সেই যুদ্ধেই তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তারপর একে একে বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়। সমৃদ্ধিশালী রাধাপুর ক্রমে একখানা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। যেখানে রাজবাড়ি ছিল, আজও সেখানে গেলে দেখা যায় একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ! স্থানীয় বাসিন্দারা বলে, আজও গভীর রাত্রে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখা যায় অশ্বারোহী রাজা রাধারমণের ছায়ামূর্তি। রাধাপুরের এখানে ওখানে আজকাল যে সাদা সওয়ারের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো সে আমাদেরই মতো দেহী মানুষ, বুদ্ধিমানের মতো এই প্রাচীন কিংবদন্তিকে নিজের কাজে লাগাতে চায়। এখন সেই কাজটা যে কী, সেইটেই আমাদের স্থির করতে হবে।'

বসন্ত বললেন, 'গোবিন্দদাসের গুপ্তধন আবিষ্কার করবার জন্যেই যে সাদা সওয়ারের এখানে আবির্ভাব হয়েছে সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। সকলেরই বিশ্বাস, রাধাপুরেরই কোনও এক জায়গায় গোবিন্দদাস তার গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এ গুপ্তধন বেওয়ারিস নয়, তার মালিক হচ্ছে গোবিন্দদাসের কন্যা রত্না।'

—'গোবিন্দদাস কি উইল করে রত্নাকে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছে?'

—'না। গোবিন্দদাস হঠাৎ মারা পড়ে, উইল করবার সুযোগ পায়নি। তার পরিবারের মধ্যে এখন বেঁচে আছে কেবল রত্না।'

শোহনলাল বললে, 'সাদা সওয়ার সম্বন্ধে আর কিছু আপনি জানতে পেরেছেন কি?'

বসন্ত বললেন, 'বিশেষ কিছুই নয়। একদিন সকালে গাঁয়ের দুজন লোককে মাঠের উপরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। জ্ঞান হলে পর তারা বলে, গ্রামান্তর থেকে তারা যখন পুরোনো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে আসছিল, তখন একটা উঁচু জমির উপরে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়। ব্যাপার কী জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে তারা সেইদিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু দুজনেই অতর্কিতে মাথার উপর প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সেইখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। গাঁয়ের চৌকিদারের মুখেও শোনা গিয়েছে আর একটা কাহিনি। এক রাত্রে সে রোঁদে বেরিয়ে মাঠের দিক থেকে ফিরে আসছিল, হঠাৎ দেখতে পায় ধ্বংসস্তূপের উচ্চভূমির উপরে আছে এক অশ্বারোহীর মূর্তি। সে পায়ে পায়ে সেইদিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই অশ্বারোহী তার দিকে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে থাকে। চৌকিদার বলে, সেই ঘোড়সওয়ারকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সে একটা ঝোপের ভিতরে আত্মগোপন করে। কিন্তু শোহনলাল, আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। খুব সম্ভব ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে সে ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল আর ভাবছিল যে, কেউ যেন তাকে আবিষ্কার করতে না পারে। সে যা হোক, চৌকিদার দিব্যি গেলে বলেছে যে, ঝোপের কাছে এসেই

সাদা সওয়ার চিৎকার করে বলে, 'দূর হ হতভাগা, কালকের সূর্যোদয় যদি দেখতে চাস আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়িয়ে থাকিসনি।' বলেই চাবুক তুলে তাকে প্রচণ্ড এক আঘাত করে। সত্য-মিথ্যা জানি না, কিন্তু পরদিনে সকলেই দেখেছে, চৌকিদারের পিঠের উপরে রয়েছে, চাবুকের একটা সুদীর্ঘ রক্তাক্ত দাগ। তারপর সাদা সওয়ারের দেখা পাওয়া গেছে অনেক রাত্রেই, কিন্তু এই দুই ক্ষেত্র ভিন্ন সে আর কোথাও নিজের হাতের চিহ্ন রেখে যায়নি।'

বসন্ত ও শোহনলালের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাধাপুরের থানাসংলগ্ন এক বাড়িতে।

রাধাপুরে গোবিন্দদাসের যে বাড়ি ছিল, তার নাম 'তপোবন'। বসন্ত খবর নিয়ে জানতে পারলেন, আজ সাত দিন হল রত্না কলকাতা থেকে সেই বাড়িতে ফিরে এসেছে।

পরদিন প্রভাতেই বসন্ত 'তপোবনে' গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড জমির মাঝখানে একখানা দোতলা বাড়ি। বাড়িখানা খুব বড়ো না হলেও অত্যন্ত সুদৃশ্য। জমির ভিতরে নানা জাতের ফলের গাছ। কিছুকাল আগে সেখানে সাজানো ফুলের বাগান ছিল, এখনও বজায় আছে তার অল্পবিস্তর অস্তিত্ব। এবং দূর থেকেই দেখা গেল একটা বড়ো পুষ্করিণীর জল ঝলমল করে উঠছে সোনালি সূর্যকিরণে।

বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একখানা দামি 'ডেমলার' মোটরগাড়ি। ডেমলার গাড়ি এখানে সুলভ নয়, তাই বসন্তের মনে পড়ল, কালকে কলকাতা থেকে আসবার সময় ঠিক এই রকমই একখানা ডেমলার গাড়ি তাঁদের গাড়িকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল।

বসন্তের ডাকাডাকি শুনে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ভৃত্যের মতন দেখতে একটি লোক। তিনি রত্নার সঙ্গে দেখা করতে চান শুনে সে বললে, 'দিদিমণি এখন আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।'

বসন্ত বললেন, 'বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল একটি তরুণ যুবক। সে একবার নীরবে জিজ্ঞাসু চোখে বসন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর হন হন করে পা চালিয়ে সেই ডেমলার গাড়ির উপরে গিয়ে উঠল।

তারপরেই দরজার কাছে দেখা গেল একটি তরুণীকে। তাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলে।

বসন্ত শুধোলেন, 'আপনার নামই কি রত্নাদেবী?'

অতি মিষ্ট, অতি শিষ্ট হাসি হেসে তরুণী বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নিজের পরিচয় আমাকে নিজেই দিতে হবে। আমার নাম বসন্তকুমার রায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি একজন পুলিশ কর্মচারী। আপনার সঙ্গে আমি দু-চারটে কথা কইতেই চাই।'

রত্না হাস্যজড়িত মুখে তাঁকে নিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি বোধহয় সাদা সওয়ারের বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ, একরকম তাই-ই বটে। ব্যাপারটা কী জানেন? কী বলে যে আমি আরম্ভ করব, বুঝতে পারছি না। আমার প্রশ্ন শুনলে হয়তো আপনি খুশি হবেন না। রত্নাদেবী, আমি জানতে এসেছি—' বলতে বলতে বসন্ত থেমে গেলেন।

রত্না হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললে, 'আপনি বোধহয় আমার বাবার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে চান?'

তার স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বসন্তের খুব ভালো লাগল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার বাবা হয়তো কোনও গুপ্তধন রেখে যাননি, কিন্তু সকলের বিশ্বাস, তিনি রেখে গিয়েছেন। আমি যতদূর জানি, সেই গুপ্তধনের লোভেই এখানে সাদা সওয়ারের আবির্ভাব হয়েছে।'

রত্না বললে, 'বাবার গুপ্তধন? আমি আজ পর্যন্ত তার একটি আধলাও চোখে দেখিনি। সেইজন্যেই প্রাণধারণের জন্যে আমাকে লোকের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়েছে।' সে হাসতে হাসতেই কথাগুলি বললে বটে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা খানিকটা চমকিত করে তুললে বসন্তকে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই তিক্ততার কারণ কী? তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাসত্ব? তার মানে আপনি কোথাও চাকরি নিয়েছেন? কোথায়?'

—'চৌরঙ্গির চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের কাছে। আপনি কি তাঁকে জানেন?'

চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের কোনও কোনও কথা বসন্তের নোটবুকে লেখা আছে বই কি! তাকে তিনি এখনও হাতেনাতে ধরতে পারেননি বটে, তবে সে যে কী চিজ তা জানতে তাঁর আর বাকি নেই। কিন্তু সে-কথা চেপে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি সাদা সওয়ারকে কখনও দেখেছেন?'

—'আমার বাড়ির জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমি তাকে দু-বার দেখেছি। কিন্তু ভালো করে কিছুই বুঝতে পারিনি, কারণ সে ছিল অনেক দূরে। তবে আমার ইচ্ছে আছে, এক রাত্রে চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দেখে আসব, কে সে?'

বসন্ত হেসে উঠে বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করব। যতদিন না এই রহস্য পরিষ্কার হয়, ততদিন আপনাকে থাকতে হবে এই বাড়ির ভিতরেই। রাত্রে আপনি বাড়ির বাইরে বেরুলেই আমার লোক যাবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে।'

রত্না ঘাড় নেড়ে বললে, 'বেশ। কিন্তু আপনি কে বসন্তবাবু? ডিটেকটিভ, না সাধারণ পুলিশের লোক?'

—'ধরে নিন, আমি যা হয় একটা কিছু।'

—'পুলিশ বোধহয় ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না?'

বসন্ত বললেন, 'পুলিশের অভিধানে ভূত-প্রেত বলে কোনও শব্দ নেই। এই সাদা সওয়ার যে কে, আমাকে তা জানতে হবেই। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না, কিন্তু কাল সকালে আমি আবার এখানে আসতে পারি কি? আমার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন, তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপাতত আমাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' বলে তিনি আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

রত্নাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই আপনি কাল আসবেন! আপনি যেদিন খুশি আসতে পারেন। আপনার বন্ধুও সঙ্গে এলে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার যে কী উপকার হবে, আমি তা বুঝতে পারছি না। আপনি যে কেন এখানে এসেছেন তাও আমি জানি না!'

বসন্ত বললেন, 'আমি জানাতে এসেছি যে, রাত্রে আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, —হ্যাঁ, ভালো কথা! আপনার বাবার গুপ্তধনের কথা আপনি কিছু জানেন কি? ইচ্ছা যদি করেন তাহলে আমার এ প্রশ্নের উত্তর না দিতেও পারেন।'

রত্না আরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সগর্বে বললে, 'আমি তার একটা আধলাও কখনও স্পর্শ করিনি। তা করবার আগে আমার যেন অনাহারে মৃত্যু হয়। আমি জানি, বাবা কী উপায়ে সেই অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সে অর্থ অস্পৃশ্য—যার ধর্মজ্ঞান আছে, সে তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। আমি যে

বাবার সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী একথা আমার অজানা নেই। কিন্তু সেটাকা আমি চাই না। যদিও মাঝে মাঝে আমার লোভ হয়, কিন্তু সে লোভ আমি দমন করতে পারি।'

বসন্ত বললেন, 'তাহলে আপনি সব জানেন?'

সোজা বসন্তের চোখের উপরে নিজের চোখ রেখে রত্না বললে, 'হ্যাঁ, জানি। মৃত্যুর আগে বাবা আমাকে বলে গিয়েছিলেন, কোথায় তাঁর সব টাকা লুকানো আছে! আমি যদি ইচ্ছা করি, আজই লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি!'

চতুর্থ
নারীকণ্ঠে আর্তনাদ

পরদিনের প্রভাতে বাগানের ঘাস জমির মাঝখানে একখানা বেতের চেয়ারে বসে রত্না তার প্রাতরাশ গ্রহণ করলে। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সামনের বেতের টেবিলের উপরে সেটাকে রেখে দিলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলে, ফটক পার হয়ে বাগানের ভিতরে ঢুকছে একখানা লাল ডেমলার গাড়ি।

তার মুখ দেখলে মনে হয়, এই বিশেষ গাড়িখানা দেখে সে খুশি হয়েছে।

গাড়ির মালিকই গ্রহণ করেছিল চালকের আসন। মেশিন বন্ধ করে ছোটো একটি লাফ মেরে সে নীচে নেমে পড়ল। বয়সে যুবক, গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর। একহারা, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ দেহ!

হাস্যমুখে রত্নার দিকে আসতে আসতে সে বললে, 'প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেছে দেখছি যে।'

রত্না বললে, 'ভারী তো প্রাতরাশ! বেগুনি, আলুর বড়া আর চা! কিন্তু সেকথা যাক। আজকে আবার আপনার আবির্ভাবের কারণটা জানতে পারি কি?'

যুবক বললে, 'কোনও কারণ নেই—'শুধু অকারণ পুলকেই'! কিন্তু রত্নাদেবী, গোড়াতেই আমার উত্তপ্ত উৎসাহকে আপনি এমন শীতল করে দিতে চাইছেন কেন? আমি এলে কি আপনি বিরক্ত হন? আমি কি চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের চেয়েও ভয়াবহ ব্যক্তি?'

সচকিত স্বরে রত্না বললে, 'চন্দ্রবাবুকে আমি যে ভয়াবহ ব্যক্তি বলে মনে করি, একথা কে আপনাকে বললে?'

—'আপনি নিজেই।'

—'কখনও না। শ্যামলবাবু, আপনি মনগড়া কথা বলছেন।'

শ্যামল বললে, 'এটা ঠিক আমার মনগড়া কথা নয়। কালই আপনার মুখে শুনলুম, আপনি চাকরি করতেন চন্দ্রকান্তের কাছে। চন্দ্রকান্ত যে দুনিয়ায় শয়তান-প্রেরিত একটি দূত, এটা আমার অজানা নেই। আপনিও সেকথা অস্বীকার করলেন না, বরং তার পরেই বেশ রাগত স্বরেই জানালেন যে, আপনি তার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন। একথা শোনবার পরে যেকোনও নাবালকই কি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারে না?'

রত্না জবাব দেবার কথা খুঁজে না পেয়ে অন্য কথা পাড়লে। বললে, 'কাল এখানে পুলিশ এসেছিল, তা জানেন?'

শ্যামল বলে উঠল, 'ওহো, তাই নাকি? কাল আমি আপনার কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বাইরে যাই, তখন এখানে একটি ছোট্ট মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম বটে।'

—'ছোট্ট মানুষ!'

—'আহা, ওটা হচ্ছে ব্যঙ্গোক্তি। সেই ছোট্ট মানুষটি মাথায় উঁচু হবেন বোধহয় ছয় ফুট দু ইঞ্চি। আর তাঁর বুকের মাপও হয়তো পঞ্চাশ ইঞ্চির কাছাকাছি যাবে। কেমন, আপনি তাঁরই কথা বলছেন তো?'

—'হ্যাঁ। তাঁর নাম বসন্তকুমার রায়।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে কৃত্রিম ভয়ের ভাব দেখিয়ে শ্যামল বললে, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! বসন্তকুমার রায়? কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার'? লোকে বলে, তাঁর মতো তালেবর গোয়েন্দা নাকি বাংলা দেশে আর নেই।'

রত্না বললে, 'আমার কিন্তু লোকটিকে ভালোই লাগল।'

—'ওরকম ভালো-লাগা ভালো কথা নয়, প্রত্যেক পুলিশই হচ্ছে দুষ্টের ধাড়ি! আপনি বোধহয় জানেন না, পুলিশের লোক পাগল হয়ে গেলে পর তার শাশুড়ির কান কামড়ে দেয়? আমি আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার যদি বসন্তবাবুকে ভালো লাগে, তাহলে সবুজ হয়ে যাবে আমার গায়ের রং। কেন বুঝতে পেরেছেন কি? হিংসার রং হচ্ছে সবুজ।'

রত্না কোনও রকমে হাসি চেপে বললে, 'যান শ্যামলবাবু, আপনি যা-তা বাজে বকতে শুরু করে দিয়েছেন!'

—'বলেন কী, আমি বাজে বকছি নাকি? উত্তম! তাহলে কাজের কথা শুনতে আজ্ঞা হোক।' শ্যামল তার পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে কোনও সংবাদপত্র থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাগজ বার করলে। তারপর কাগজখানা সামনে ধরে উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতে লাগল

'অতীতের মানুষ বর্তমানে ঠিক মানুষ নয়, মানুষের ছায়া! ছায়া, অর্থাৎ ছায়ামূর্তি, অর্থাৎ প্রেতাত্মা! আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন কি, রাধাপুরের সাদা সওয়ার আবার অশ্বারোহী হইয়া নৈশ ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছে? দৈবক্রমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই রামনাম স্মরণ করিয়া পথিকরা চম্পট না দিয়া পারে না। কারণ, সেই সাদা সওয়ার নাকি স্ত্রী-হত্যাকারী এবং অপঘাতে মৃত রাধাপুরের রাজা রাধারমণ রায়ের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে। আধুনিক নহে, চারি শত বৎসরের প্রাচীন প্রেতাত্মা! যাঁহারা প্রেত মানেন না, আর এক কারণে রাধাপুরের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। ওখানে যক্ষ আছে কি না জানি না, কিন্তু যক্ষের ধন অর্থাৎ গুপ্তধন আছে বলিয়া অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। এই বিশ্বাস সত্য কি না তাহা জানিবার জন্য পুলিশের টনক নাকি রীতিমতো নড়িয়া উঠিয়াছে। আপাতত ইহার অধিক খবর আমরা দিতে পারিলাম না।'

পাঠ শেষ করে শ্যামল বললে, 'বুঝতেই পারছেন রত্নাদেবী, আপনার পিতার গুপ্তধনের কথা নিয়ে অনেকেই এখন আলোচনা করছে।'

চমকে উঠে রত্না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?'

শ্যামল সহজ স্বরেই বললে, 'কিছু না, কিছু না! তবে গুপ্তধন উপলক্ষ করে যদি এখানে কোনও উপদ্রবও শুরু হয়, তাহলে আমি আপনাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারি।'

শ্যামলের কথার উত্তরে রত্না কিছু বলবার আগেই বাগানের ভিতরে এসে ঢুকল আর একখানা

মোটর। গাড়ির ভিতর থেকে নামল দুইজন লোক—দুইজনই বিপুলবপু। একজন হচ্ছেন বসন্ত আর একজন শোহনলাল।

বসন্ত কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'রত্নাদেবী, ইনিই হচ্ছেন আমার বন্ধু শোহনলালবাবু। জাভা দ্বীপের নাম শুনেছেন তো? ভারত থেকে সেখানে গিয়ে ইনি পুলিশ বিভাগে কাজ নিয়েছেন। আমাদেরই মতো বাংলাতেও কথা বলতে পারেন।' বলেই তিনি শ্যামলের দিকে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত।

রত্না বললে, 'ইনি হচ্ছেন আমার পুরাতন বন্ধু শ্রীশ্যামলকুমার সেন!'

রত্না বললে মিথ্যা কথা। কেন বললে তা সে নিজেই জানে না, কারণ শ্যামলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগেই।

বসন্ত বললেন, 'রত্নাদেবী, আপনার ভার দেখছি আমাদেরই নিতে হবে। সাদা সওয়ারকে কাল রাত্রেও দেখা গিয়েছে। এসব ভালো লক্ষণ নয়। আমি আজ থেকেই এই বাড়ির উপরে পাহারা দেবার জন্যে একজন পুলিশের লোক নিযুক্ত করেছি। আশা করি, এজন্যে আপনার কোনও আপত্তি হবে না?'

—'আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু—'

—'কিন্তু-টিন্তু নয় রত্নাদেবী। আপনার কোনও বিপদ হলে বড়োসাহেবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকেই।'

রত্না বললে, 'কিন্তু এত হাঙ্গামা না করলেও চলত।'

শোহনলাল বললে, 'না রত্নাদেবী, সাবধানের মার নেই। জাভা থেকে আমি কলকাতায় এসেছি এক বিপজ্জনক অপরাধীর সন্ধানে। তলেতলে এখবরও পেয়েছি যে, সে তার দলের লোকজনদের নিয়ে রাধাপুরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের লোভে। তারা জানে, গুপ্তধন যে কোথায় আছে এটা আপনার অজানা নেই। সুতরাং আপনি যেকোনও মুহূর্তেই ভীষণ বিপদে পড়তে পারেন।'

রত্না কোনও জবাব না দিয়ে যেন কী ভাবতে লাগল।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'রত্নাদেবী, আপনার প্রতিবেশীদের কথা আমায় কিছু বলতে পারেন?'

রত্না বললে, 'প্রতিবেশীদের কথা আমি ভালো করে কিছুই জানি না। কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শ্যামলবাবু। তিনি তো আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর একজন হচ্ছেন ভুবনবাবু—ভুবনচন্দ্র বিশ্বাস। এখানে নতুন এসেছেন, আমার বাগান থেকে উত্তর দিকে তাকালেই দূরে তাঁর বাড়ি দেখতে পাবেন। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয়নি, তবে শুনেছি তাঁর বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কেউ নেই।'

—'তারপর?'

—'আর-একজন ভদ্রলোক এখানে কিছুকাল থেকে বাস করছেন, আমি তাঁকে চিনি। তাঁর নাম হচ্ছে বিনয়বাবু—রেভারেন্ড বিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা বোধহয় জানেন, আমরা বংশানুক্রমে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। মাইল খানেক দূরে এখানে একটা পল্লি আছে, তার অধিকাংশ বাসিন্দাই খ্রিস্টান। তাঁদের উপাসনার জন্যে ছোটো একটি গির্জাও আছে। বিনয়বাবু সেই গির্জাসংলগ্ন বাড়িতেই বাস করেন। আর কারুর কথা আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না।'

বসন্ত বললেন, 'বেশ, আপাতত আমার আর বেশি কিছু জানবার দরকার নেই। রত্নাদেবী, এখানে

পাহারা দেবার জন্যে আমি পুলিশের যে লোকটিকে রেখে যাচ্ছি, তার নাম হচ্ছে সুবোধ। তার জন্যে আপনাকে কিছুই মাথা ঘামাতে হবে না।'

—'কিন্তু তিনি থাকবেন কোথায়? তার জন্যে আমার বাড়ির একখানা ঘর ছেড়ে দেব কি?'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়! যতদিন না সাদা সওয়ারের ঘোড়দৌড় বন্ধ হয়, সুবোধ দিবারাত্র বাস করবে উদার নীল আকাশের তলায়। নমস্কার রত্নাদেবী, এখন আমরা উঠলুম।'

বসন্ত শোহনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তারপর নিজেই গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'শোহনবাবু, একটা বিষয় আপনি ভেবে দেখেছেন কি?'

—'কোন বিষয়?'

—'এই সাদা সওয়ারের বিষয়? তার নাম সাদা সওয়ার হল কেন?'

—'হয় তার ঘোড়ার রং সাদা, নয়তো সে পরে থাকে সাদা পোশাক।'

—'কিন্তু এই সাদা রংটা কি তার পক্ষে বিপজ্জনক নয়? অন্ধকার রাত্রেও সাদা রং তফাত থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যাপারটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। আমি এই তথাকথিত প্রেতাত্মাকে স্বচক্ষে দেখতে চাই।'

সেই রাত্রে!

ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বেজে গেল, তবু বসন্তের চোখে এল না ঘুম। তাঁর মনের মধ্যে জাগতে লাগল নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত। যেন আজ একটা কিছু ঘটবেই। বিরক্ত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে তিনি খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পরিষ্কার রাত্রি, আকাশে উঠেছে অপরিপূর্ণ চন্দ্র। তার ম্লান কিরণে চারিদিক হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট ভৌতিক জগতের মতো রহস্যময়।

বসন্ত নিজের মনে মনেই বললেন, 'এমন রাত্রে ভূতের দেখা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

ঠিক তারপরেই তিনি দেখতে পেলেন সাদা সওয়ারকে।

খানিক দূরে আলো-আঁধারির মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, 'তপোবন'—রত্নাদেবীর বাড়ি। আরও খানিক তফাতে দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট একটা জঙ্গল, তার উপরে তালকুঞ্জের মুকুট।

তারই সামনে দেখা গেল সাদা সওয়ারকে। বোঝা গেল, তার গায়ের জামাটাই কেবল সাদা, কারণ, তার দেহের নিম্নার্ধ এবং ঘোড়াটাকে মনে হচ্ছিল যেন কালির রঙে আঁকা।

বসন্ত দৌড়ে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে রাত্রে ব্যবহার্য দূরবিনটা বার করে আনলেন। সাদা সওয়ার যে মুখে মুখোশের মতো একটা কিছু পরে আছে, এ ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি করা গেল না। বসন্ত বুঝলেন, দূর থেকে আর কোনও তথ্য আবিষ্কার করা চলবে না। তিনি তাড়াতাড়ি আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা জামা ও 'ক্রেপ-সোলের' জুতো পরে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন। তারপর সদর দরজা খুলে রাস্তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তখন আর দেখা যাচ্ছিল না সাদা সওয়ারকে। কিন্তু সে যে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে তপোবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এটা তিনি উপর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন।

তিনিও অগ্রসর হলেন তপোবনের দিকে এবং মনে মনে বললেন,—আজ একটা কিছু ঘটবে বলে আমার মন প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু যা ঘটবার উপক্রম হয়েছে, সেটা মনে হচ্ছে যেন কোনও রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো। এখন দেখতে হবে এর পরিশিষ্টটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কিছুদূরে এগিয়েই তিনি আবার চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে মনে বললেন, আমি বোধহয় সময় নষ্ট করছি। একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাবে, সেটা আগে থাকতে জানা না থাকলে পদব্রজে তার অনুসরণ করার কোনওই মানে হয় না।

তাঁর কর্ণ সচকিত হয়ে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

স্তব্ধ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে ভেসে এল নারীকণ্ঠের এক আর্ত চিৎকার! চিৎকারটা জেগে উঠেই আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। সমাধিভূমির নীরবতার ভিতর দিয়ে কেটে গেল কিছুক্ষণ। এবং তারপর আবার সেই আর্ত চিৎকার এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই উপরি উপরি দুই-দুইবার রিভলভারের শব্দ!

বসন্ত তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং মাটির উপরে কান পেতে শুনতে পেলেন, দ্রুতগতিতে ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ!

একলাফে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলেন, রাজা রাধারমণ রায়ের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপরে উচ্চ স্তূপের দিকে দ্রুত ধাবমান সাদা সওয়ারকে। সে অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। বসন্তের মনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে এইসব চিন্তা খেলে গেল—নারীকণ্ঠে আর্তনাদ করলে কে? রিভলভার ছুড়লে কে? সাদা সওয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল কেন? এখন আমি কী করব—ছুটে যাব কি সাদা সওয়ারের পিছনে পিছনে?

ঝাপসা আলো বিতরণ করছিল চাঁদ, হঠাৎ তাও মিলিয়ে গেল একখানা চলন্ত মেঘের আবরণে। কিছুই দেখা যায় না নিবিড় অন্ধকারে। এখন সাদা সওয়ারকে আবিষ্কার করা একেবারেই অসম্ভব। নিরুপায় হয়ে তিনি আন্দাজে পায়ে পায়ে অগ্রসর হতে লাগলেন তপোবনের দিকে।

হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কার দ্রুত পদশব্দ। কে বেগে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। তাড়াতাড়ি তিনি রিভলভার বার করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁর খুব কাছে এসেই থেমে এল পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে কে কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। নড়েছ কী গুলি করেছি!'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বসন্ত। এ হচ্ছে সুবোধের কণ্ঠস্বর—তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারী সুবোধ।

পঞ্চম
মৃতদেহ

কোন নারী অমন করে আর্তনাদ করে উঠল? মনের ভিতরে আবার জাগল এই প্রশ্ন।

সুবোধ হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'স্যার, আপনি কি সাদা সওয়ারকে দেখেছেন? রিভলভার ছুড়লে কে?'

বসন্ত পকেট থেকে 'টর্চ' বার করে মাটির উপরে এখানে ওখানে আলোকপাত করতে লাগলেন। তারপর ফিরে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ওসব কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমাকে আমি কি ওই বাড়ির উপরে পাহারা দিতে বলিনি? দেখতে পাচ্ছ, পথের উপরে ঘোড়ার খুরের দাগ? প্রায় তোমার সামনে দিয়েই সাদা সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছে, আর তুমি কিনা বোকার মতো আমাকে প্রশ্ন করছ?'

অপ্রতিভ ভাবে সুবোধ বললে, 'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্যার! হঠাৎ কার চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়, তারপর আর একবার শুনি সেই চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে দু-বার রিভলভারের শব্দ।'

—'তারপর তুমি কী করলে?'

—'যেদিক থেকে রিভলভারের শব্দ এসেছিল সেইদিকে ছুটে গেলুম।'

বসন্ত বললেন, 'আমি আগে দেখতে চাই, রত্নাদেবী কেমন আছেন। এসো তুমি আমার সঙ্গে।' তিনি তপোবনের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—পিছনে পিছনে সুবোধ।

বসন্ত বললেন, 'রত্নাদেবীর ঘর কোনটা?'

সুবোধ দোতলার একটা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে। বসন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে 'টর্চে'র সাহায্যে বাড়ির দেওয়ালটা পরীক্ষা করে দেখলেন, দোতলার ছাদের উপর থেকে একটা বৃষ্টির জল নিকাশের নল বাড়ির নীচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেই নলের পাশেই দেখা যাচ্ছে দোতলার ঘরের একটা খোলা জানলা। বসন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে সেই নলটা অবলম্বন করে দোতলার জানলার কাছে গিয়ে কার্নিশে পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জানলা দিয়ে উঁকি মারলেন ঘরের ভিতর দিকে।

স্তব্ধ ঘর, ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হঠাৎ বসন্তের ভয় হল, ঘরের ভিতরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে হয়তো কোনও রক্তাক্ত দৃশ্য। পরমুহূর্তে 'টর্চ'টা টিপে তার আলোকে তিনি দেখলেন, অর্ধোত্থিত অবস্থায় বালিশের উপরে হেলান দিয়ে আছে—রত্না।

বসন্ত বললেন, 'ক্ষমা করবেন, আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলুম।'

রত্না বললে, 'জানলার বাইরে মানুষের মূর্তি দেখে আমিও কম ভয় পাইনি। কিন্তু ব্যাপার কী?'

—'একটু আগেই সাদা সওয়ার এইখান দিয়ে গিয়েছে। কে দুই-দুইবার রিভলভার ছুড়েছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন।'

—'না বসন্তবাবু, আমার কোনওই বিপদ হয়নি।'

—'সুসংবাদ! তাহলে আবার আমি অদৃশ্য হলুম!'

বসন্ত নল বয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলেন, রত্নার কণ্ঠের কৌতুকহাস্য।

সুবোধ শুধোলে, 'কোনও দুর্ঘটনা হয়নি তো?'

—'না।' এমন গম্ভীর স্বরে বসন্ত 'না' বললেন যে, সুবোধ আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলে না।

পরের দিন সকালে বসে শোহনলালের সঙ্গে চা পান করতে করতে বসন্ত একটিও কথা কইলেন না।

হঠাৎ বাড়ির নীচেয় শোনা গেল একখানা মোটরের শব্দ। কে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'বসন্তবাবু আছেন?'

বসন্ত বাইরের বারান্দায় গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মোটরের উপরে বসে আছে—শ্যামল।

—'কী ব্যাপার?'

শ্যামল বললে, 'আমি আপনারই খোঁজে এসেছি। একবার আমার গাড়িতে এসে উঠবেন কি? পাদরি বিনয়বাবুর মুখে শুনতে পাবেন একটা অদ্ভুত গল্প। রহস্যময় কাণ্ডকারখানা!'

বসন্ত তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে নেমে শ্যামলের মোটরে গিয়ে বসলেন। মোটর বিনয়বাবুর গির্জাসংলগ্ন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মোটরের শব্দ পেয়ে বিনয়বাবু বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। বয়সে তিনি প্রৌঢ়, মুখে দাড়ি-গোঁফ, চক্ষের ভাব নিরভিমান।

শ্যামল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি কাল রাত্রে কী শুনেছেন, এঁর কাছে বলতে পারেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কাল রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসেনি। বাড়ির বারান্দায় আমি পায়চারি করছিলুম। তারপর হঠাৎ শুনতে পেলুম কোনও স্ত্রীলোকের চিৎকার। তারপর আরও একবার হল চিৎকার আর দুইবার রিভলভারের শব্দ।'

এসব বসন্তেরও অজানা নয়। তিনি শুধোলেন, 'তারপর?'

—'তারপর দেখতে পেলুম আমি সাদা সওয়ারকে। তপোবনের দিক থেকে সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে চলে গেল ওই পুরোনো ধ্বংসস্তূপটার দিকে।'

—'প্রথম আর দ্বিতীয় বারের চিৎকার শুনে আপনার কিছু মনে হয়েছিল কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। দুটো চিৎকার দু-রকম। প্রথম চিৎকার শুনে মনে হল, হঠাৎ কে যেন বিস্ময়ে চমকে উঠেছে। আর দ্বিতীয় চিৎকারটা হচ্ছে দস্তুরমতো আতঙ্কজনক।'

—'যে চিৎকার করেছিল, সে কে তা অনুমান করতে পেরেছেন?'

—'হ্যাঁ, সে নারী।'

—'কীরকম নারী? বৃদ্ধার আর তরুণীর কণ্ঠস্বর এক রকম হয় না।'

—'যে চিৎকার করেছিল, নিশ্চয়ই সে তরুণী।'

শ্যামলের দিকে ফিরে বসন্ত বললেন, 'শ্যামলবাবু, এখানে কাছাকাছি তরুণী বলতে তো আছেন কেবল রত্নাদেবী?'

শ্যামল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে কোনও কথা কইবার আগেই সেখানে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে হাজির হল গ্রামের এক চৌকিদার। সে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, 'হুজুর, খুন! একটা মানুষের লাশ পাওয়া গিয়েছে!'

বসন্ত বললেন, 'আমি এইরকমই কোনও খবর পাব বলে আশা করছিলুম। কে খুন হয়েছে?'

—'জানি না হুজুর! তাকে আমি চিনি না। ছিদামকে আপনি জানেন না, এখানে তার মুদির দোকান আছে। ভিন-গাঁ থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে কাল সে অনেক রাতে বাসায় ফিরে আসছিল। সোজা পথ না ধরে আসছিল আমবাগানের ভেতর দিয়ে, কারণ ওই-দিক দিয়ে এলে তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছোনো যায়। কিন্তু আমবাগানের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তার পায়ে ফুটে যায় একটা কাঁটা।'

অধীর কণ্ঠে ধমক দিয়ে বসন্ত বলে উঠলেন, 'কার পায়ে কাঁটা ফুটল কি ফুটল না, আমি শুনতে চাই না সেসব কথা। যা বলবে সোজাসুজি বলো।'

চৌকিদার থতমত খেয়ে বললে, 'হ্যাঁ হুজুর, তাই বলছি। ছিদামের পায়ে তো কাঁটা ফুটল, সে আর চলতেই পারে না। সেইখানে ছিল অন্নদাবুড়ির ভাঙা কুঁড়েঘর। বুড়ি মরে যাবার পর থেকে সেঘরে আর কেউ থাকে না। ছিদাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে—'

বসন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তোমার নিকুচি করেছে। ছিদাম খোঁড়াচ্ছিল কি না, আমি তা জানতে চাই না। সেই কুঁড়েঘরে গিয়ে সে ঢুকেছিল, এই বলতে চাও তো?'

হাত জোড় করে চৌকিদার বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! ছিদাম সেই ঘরে ঢুকে পায়ে কী ফুটেছে দেখবার জন্যে জ্বাললে একটা দেশলাইয়ের কাঠি। তারপর সে কী দেখলে, জানেন হুজুর?'

—'হ্যাঁ, সে দেখলে একটা লাশ, এই বলতে চাও তো?'

—'হ্যাঁ হুজুর, ঠিক ধরেছেন। সে দেখলে—'

চৌকিদারকে বাধা দিয়ে প্রায় গর্জন করে বসন্ত বললেন, 'আমিও সেই লাশটাকে দেখতে চাই। আর কোনও কথা না বলে এখনই আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো।'

আমবাগান। নড়বড়ে ভাঙা কুঁড়ে। মাটির উপরে চিত হয়ে পড়ে আছে একটা পুরুষের মৃতদেহ। তার দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে ভীষণ আতঙ্কের চিহ্ন। তার জামার বুক পকেটের উপরটা রক্তরাগে আরক্ত। এবং তার কণ্ঠদেশে একটা রক্তাক্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই।

তাকে চিনতে পারলেন বসন্ত। সে কখনও জেল খাটেনি বটে, তবে পুলিশ তাকে একজন বড়ো অপরাধী বলেই জানে। কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়েও আজ সে ফাঁকি দিতে পারলে না কোনও এক অজ্ঞাত হত্যাকারীর রিভলভারকে। সে হচ্ছে চন্দ্রকান্ত চন্দ্র।

ষষ্ঠ
বাদামি রঙের ঘোড়া

শোহনলাল ঘরের ভিতরে বসে একমনে সংবাদপত্র পাঠ করছিল।

এমন সময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে শ্যামল বললে, 'আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। শীঘ্র চলুন।'

—'কোথায়?'

—'আমবাগানে, ভাঙা কুঁড়েঘরে। কাল রাত্রে সেখানে একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে।'

শুনেই শোহনলাল আর দ্বিরুক্তি না করে শ্যামলের সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

বসন্ত একটা উঁচু ঢিপির উপরে একলা বসে সিগারেটের ধূমপান করছিলেন। শোহনলালকে দেখে মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আমি দেহটা পরীক্ষা করে দেখেছি। এইবারে আপনি আর একবার পরীক্ষা করে বলুন দেখি আপনার মতামত কী?'

শোহনলাল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দেহটাকে উলটে ফেলে মাটির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আততায়ীর প্রথম গুলিতেই এর মৃত্যু হয়েছে। তারপর আবার করা হয়েছে মড়ার উপরে দ্বিতীয় আঘাত!'

শ্যামল শুধোলে, 'কোনটা প্রথম আঘাত কেমন করে আপনি জানতে পারলেন?'

—'মাটির উপরের এই গর্তটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, রিভলভারের গুলি এর বক্ষ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে মাটির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। সুতরাং ভূপতিত অবস্থায় এর বুকের দিকে রিভলভার ছোড়া হয়েছিল। আর একটা গুলির দাগ রয়েছে এর কণ্ঠদেশের উপরে, কিন্তু এর গলার তলায় মাটির উপরে কোনও গর্ত নেই। সুতরাং লোকটা যখন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে গুলি করা হয়েছে তখনই।'

বসন্ত সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'ঠিক, আমারও ওই ধারণা। লোকটাকে চিনতে পারছেন কি?'

—'হ্যাঁ, চন্দ্রকান্ত। কিন্তু একে হত্যা করবার কারণ কী?'

—'কারণ থাকতে পারে অনেক। এইবারে বাইরে বেরিয়ে আসুন।'

কুটিরের পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বসন্ত বললেন, 'মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

নরম মাটির উপর রয়েছে অদ্ভুত এক রকম ছাপ। সেই ছাপগুলো লম্বায় বারো ও চওড়ায় চার ইঞ্চি।

কৌতূহলী স্বরে শোহনলাল বললে, 'কী ওগুলো?'

—'জুতোর তলায় কেউ ছোটো ছোটো দুখানা কাঠের তক্তা দড়ি দিয়ে বেঁধে এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। তিন দিন আগে এখানে বৃষ্টি পড়েছিল। সে জানত আমবাগানের ছায়ায় মাটি থাকবে ভিজে, আর সহজেই তার পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে। সেইজন্যেই সে এই অভিনব কৌশলটি অবলম্বন করেছিল। এখন আসুন।'

ছাপ ধরে সবাই এগিয়ে চলল। আমবাগান থেকে বেরিয়ে যেখানে শ্যামলের লাল গাড়িখানা অপেক্ষা করছিল, তারা যখন সেইখানে গিয়ে পড়ল, তখন বড়ো রাস্তার উপরে আর কোনওই ছাপ পাওয়া গেল না।

বসন্ত বললেন, 'যে দুখানা তক্তা দিয়ে তার পদচিহ্ন ঢেকে ফেলা হয়েছে, সে নিশ্চয়ই সে দুটো সঙ্গে করে নিয়েই এখান থেকে সরে পড়েছে।'

শোহনলাল বললে, 'খালি তো বলছেন, সে, সে আর সে! কিন্তু কে সে? সাদা সওয়ার?'

—'কেমন করে আমি তা জানব? দেখতেই পাচ্ছেন তো, এখানে রয়েছে দুই 'সেট' ছাপ। কেউ এখান থেকে আমবাগানের ভিতরে গিয়েছে, তারপরে কাজ সেরে আবার ফিরে এসেছে। হতে পারে সে সাদা সওয়ার, হয়তো তার ঘোড়াটাকে রাস্তার উপরে রেখে সে গিয়েছিল আমবাগানের ভিতরে। আবার হতে পারে সে অন্য কোনও লোক। তবে দুটো গুলিই যে চন্দ্রকান্তকে লক্ষ্য করে একজন লোকের দ্বারা ছোড়া হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু সে যে কে, তা আমি জানি না। কাল রাত্রে এখানে রত্নাদেবীর আবির্ভাব হয়েছে শুনলেও আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।'

সচকিত কণ্ঠে শোহনলাল বললে, 'তার মানে?'

বসন্ত বললেন, 'কাল রাত্রে এখানে কোনও তরুণীর আর্ত চিৎকার শোনা গিয়েছিল। তারপর গভীর রাত্রে রত্নাদেবীকে আমি জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। এটা বেশ অস্বাভাবিক নয় কি?'

শ্যামল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'এ হচ্ছে অত্যন্ত অন্যায় ইঙ্গিত।' তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত।

কয়েক সেকেন্ডের স্তব্ধতা। তারপর বসন্ত শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'উত্তেজিত হবেন না শ্যামলবাবু। এখানে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, আমি একটা ইঁদুরকেও ধরে ফাঁসি দিতে পারি।'

শ্যামল আর কিছু না বলে নিজের গাড়িতে চড়ে চলে গেল।

শোহনলালকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত আবার আমবাগানের ভিতরে ঢুকে মাটির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চারিধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এখানে ওখানে পাওয়া গেল কতকগুলো জুতোর দাগ। উঁচু-'হিল' মেয়েদের জুতোর দাগ। আরও কতকগুলো জুতোর দাগ পাওয়া গেল, পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, সেগুলো হচ্ছে চন্দ্রকান্তের পদচিহ্ন।

ঠিক সেই সময় গির্জাসংলগ্ন বাড়ির একটি ঘরে বসে শ্যামল কথা কইছিল বিনয়বাবুর সঙ্গে।

বিনয়বাবু প্রশ্ন করলেন, 'কী বললে, বসন্তবাবু সন্দেহ করেন রত্নাদেবীকে?'

শ্যামল বললে, 'হ্যাঁ, এটা ভাবলেও আমার রাগ হয়।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তুমি অধীর হয়ো না শ্যামল। এসব কথা নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাতে পারছি না, আমার হাতে অনেক কাজ আছে। তুমি এখন বাসায় যাও।'

শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সমস্ত দেখে-শুনে আমার কেমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সঙ্গীত, এখন আমি চাই সঙ্গীত! রত্নাদেবীর বৈঠকখানায় একটা পিয়ানো দেখেছি। চললুম আমি সেইখানে।'

শ্যামল চলে গেলে পরে বিনয়বাবু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর গাত্রোত্থান করে অগ্রসর হলেন বাড়ির ভিতর দিকে।

রান্নাঘরের পাশেই ভাঁড়ারঘর। সেই ঘরে ঢুকে একটা জালার ভিতর থেকে জই বার করে রাখতে লাগলেন মাঝারি আকারের একটা বালতির ভিতরে। তারপর বালতিটা তুলে নিয়ে তিনি বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সেখানে ছিল একটা 'গেরাজ'। মোটর রাখবার জন্যে ঘরখানা তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন শ্যামলকে।

পকেটের ভিতর থেকে চাবি বার করে তিনি 'গেরাজে'র দরজাটা খুলে ফেললেন। ভিতরে তখন শ্যামলের মোটর ছিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে গেলেন পিছনের দেওয়ালের দিকে। কাঠের দেওয়াল। তার মাঝামাঝি জায়গায় লাগানো আর-একটা কুলুপ। চাবি দিয়ে কুলুপ খুলে দুই হাতে দেওয়ালটা ধরে দু-দিকে টানতেই উপর দিকে দুখানা তক্তা দুই পাশে সরে গেল। তারপরেই দেখা গেল দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বাদামি রঙের খুব শক্তিশালী ঘোড়া।

বিনয়বাবু তার কণ্ঠদেশে আদর করে দু-তিনবার করাঘাত করলেন এবং তারপর বালতির জইগুলো ঘোড়ার সামনে রাখা একটা পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আবার সমস্ত বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন।

বিনয়বাবু ধীরে সুস্থে অগ্রসর হতে লাগলেন আমবাগানের দিকে—মাটির উপরে রেখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

আবার সেই ভাঙা কুঁড়েঘর। তিনি তার চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এলেন, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়। সেখানে মাটির উপরে রয়েছে মেয়েদের জুতোর দাগ। এবং সেইসঙ্গেই দেখা গেল একটা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন।

বিনয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে নিজের মনেই বললেন, 'বড়োই অন্যায়, বড়োই অন্যায়! এমন অসাবধানতা অমার্জনীয়।' তিনি সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারপর অতি সাবধানে মাটির উপর থেকে সেই খুরের দাগটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পুলিশের লোকেরা এ চিহ্নটা দেখতে পেয়েছে কি? বোধহয় পায়নি।'

পিয়ানোর উপরে সচল শ্যামলের দুই হাতের নিপুণ অঙ্গুলি করছিল সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি।

হঠাৎ পিয়ানোর উপরে এসে পড়ল কার ছায়া। শ্যামল মুখ ফিরিয়ে বললে, 'রত্না, তোমার জন্যে চা আর খাবার আনবার হুকুম দেব কি?'

রত্না বললে, 'আমার এখানে এসে আপনি দেবেন চা আর খাবার আনবার হুকুম? শ্যামলবাবু

এরকম কৌতুক পরিপাক করা সহজ নয়। আপনি আমাকে না জানিয়েই আমার বৈঠকখানায় এসে পিয়ানো বাজাতে শুরু করে দিয়েছেন কেন?'

চেয়ারসুদ্ধ ঘুরে বসে শ্যামল বললে, 'শোনো রত্না, আমি শ্যামলবাবু নই, তোমার কাছে আমি হচ্ছি শুধু শ্যামল।'

রত্না বললে, 'আপনার কাছে আমি শুধু রত্না নই, ভবিষ্যতে আমাকে রত্নাদেবী বলে ডাকলেই খুশি হব। একেবারেই এতটা ঘনিষ্ঠতা কেন? এক হপ্তা আগেও আপনাকে আমি চিনতুম না, আপনার নাম পর্যন্তও জানতুম না।'

শ্যামল বললে, 'তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে হয় আজ পঁচিশ বছর ধরে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করছি। এই আনন্দময় একটি সপ্তাহকেই আমার মনে হচ্ছে পঁচিশ বৎসরের মতো সুদীর্ঘ!'

রত্না বললে, 'আপনি কথা বন্ধ করুন, আবার বাজনা শুরু করুন। আপনার বাজনা আমার ভালো লাগছে।'

সকালের কাঁচা সোনালি রোদ জানলার ভিতর দিয়ে রত্নার মুখের উপরে এসে পড়েছিল। শ্যামলের মনে হল, রত্না হচ্ছে একটি পবিত্র ও শুভ্র হোমশিখা। সে আবার চেয়ারসুদ্ধ ঘুরে বসে বললে, 'তথাস্তু! তোমার আদেশে আবার আমি অবলম্বন করলুম আমার প্রিয়তম পিয়ানোকে।'

পিয়ানো আবার মুখর হয়ে উঠল। তার সপ্তগ্রামের ভিতর দিয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল যেন অপূর্ব সুর-সুরধুনির বিচিত্র ধারা। রত্না বুঝতে পারলে, শ্যামল হচ্ছে একজন অসাধারণ সঙ্গীত শিল্পী। সে অবাক হয়ে তার সঙ্গীতে তন্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দর প্রভাত, সুন্দর সূর্যালোক! চলো রত্না, আমরা একবার নীলাকাশের তলায় পদচালনা করে আসি।'

রত্না বললে, 'আপত্তি নেই।'

তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর গ্রাম্যপথ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল লক্ষ্যহীনের মতো।

ঠিক সেই সময়েই শোহনলালকে নিয়ে বসন্ত গিয়েছিলেন রত্নার প্রতিবেশী ভুবনচন্দ্র বিশ্বাসের বাসায়। ভুবনবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বসন্ত দেখতে পেলেন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে শ্যামল ও রত্না।

যতক্ষণ দেখা যায়, বসন্ত নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'নমস্কার ভুবনবাবু! আপনার সঙ্গে পরিচয় তো হল, এখন আমরা বিদায় হই।'

বাইরে এসে বসন্ত কোনও কথা কইলেন না। তাঁর মনের ভিতরে ক্রমাগত জেগে উঠছে শ্যামলের মুখ—যেন সে একটা মূর্তিমান সমস্যা!

প্রায় বাসার কাছ বরাবর এসে বসন্ত হঠাৎ নিজের উরুদেশে চপেটাঘাত করে বলে উঠলেন, 'মনে পড়েছে, এতক্ষণ পরে মনে পড়েছে!'

শোহনলাল সকৌতুকে বললে, 'কী মনে পড়েছে? আপনার গত জন্মের কাহিনি?'

—'আমার মনে পড়েছে শ্যামলের কথা। যেখানেই হোক, আগে আমি নিশ্চয়ই কোথাও ওই শ্যামলকে দেখেছি! প্রথম দিনে তাকে দেখেই আমার এই কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।'

বাসায় ফিরে এসেই বসন্ত কলকাতায় পুলিশ কমিশনারের কাছে প্রেরণ করলেন একটি জরুরি তারবার্তা।

সপ্তম

রাত্রির বিভীষিকা

রাধাপুরের বাসিন্দাদের কাছে ভুবনবাবু হচ্ছেন একটি রহস্যময় মানুষ। লোকে তাঁকে ছিটগ্রস্ত ও প্রায়-পাগল বলেই ধরে নিয়েছে।

এর কারণও আছে। তিনি প্রায় সারাদিনই নিজের বাড়ির ভিতরে বসে থাকেন। তিনি এখানে আসবার পর কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিল। তিনি কারুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু নিজেকে এমন আলাদা করে রেখে কথা কয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার আলাপ করবার জন্যে কারুরই আগ্রহ হয়নি।

বাড়ির একটি ঘরে আলমারির পর আলমারিতে সাজানো ছিল তাঁর নানা শ্রেণির পুস্তক। এবং আর-একটি ঘরে ছিল তাঁর রসায়নাগার। পুস্তক ও রসায়নাগারে পরীক্ষা নিয়েই কেটে যেত তাঁর অধিকাংশ সময়। সাধারণ লোকের আজেবাজে কথা শোনবার জন্যে তাঁর কোনওই কৌতূহল ছিল না। নিজের কাজের মধ্যেই তিনি থাকতেন সমাহিতের মতো।

তাঁর দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বয়সও পঞ্চাশের কম হবে না। সর্বদাই তাঁর মুখ হয়ে থাকত অত্যন্ত ভাবহীন, মুখ দেখে তাঁর মনের কথা কেউ আন্দাজ করতে পারত না।

যেদিন চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়, সেইদিনই ডাকপিয়ন তাঁর হাতে দিয়ে গেল একটি পার্সেল। পার্সেলের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ভিতরে কী আছে তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হল না।

চটে-জড়ানো একটি 'কার্ডবোর্ডের' বাক্সের ভিতর থেকে বেরুল একটা অটোম্যাটিক রিভলভার—নিষ্ঠুর তার নীল ইস্পাতের রং। সেইসঙ্গে ছিল পরিচিত হস্তাক্ষরের লেখা একখানা পত্র।

তিনি চিঠিখানা একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করলেন, তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেই পার্সেল ও 'কার্ডবোর্ডের' বাক্স প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তাঁর চক্ষের সামনেই সব ভস্মীভূত হয়ে গেল।

সেইদিনই মধ্যরাত্রে কালো পোশাক ও হাতে কালো দস্তানা পরে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাড়ির বাইরে। রিভলভারটা পকেটে নিয়ে যেতে ভুললেন না। অগ্রসর হলেন তপোবনের দিকে। সেখানে পৌঁছে বাগানের ভিতরে ঢুকে সন্তর্পণে পা ফেলে ঝোপের পর ঝোপের ভিতর দিয়ে এগুতে এগুতে তিনি শুনতে পেলেন দুই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর।

চন্দ্রকান্ত যেদিন নিহত হয়, সেইদিন থেকেই রত্নার বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে বসন্ত নিযুক্ত করেছেন আরও একজন লোককে। তার নাম মন্মথ।

একটা ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি মেরে ভুবন দেখতে পেলেন, খানিক তফাতে দুটো জ্বলন্ত সিগারেটের দীপ্তি—পুলিশের দুই প্রহরীই জাগ্রত!

শুনতে পেলেন, একজন বলছে, 'এ যেন ভূতুড়ে ব্যাপার! সব সময়েই তটস্থ হয়ে থাকতে হয়! গাছের একটা পাতা নড়ল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল তোমার বুক! প্রত্যেক ঝোপটাকেই যেন মনে হয় এক-একটা মানুষ!'

আর-একটা লোক দার্শনিকের মতো বললে, 'উপায় নেই, যে-পূজায় যে-মন্ত্র। তার চেয়ে তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, আমি একবার চারিদিকটা ঘুরে আসি।'

ভুবন দেখলেন একটা লোক গাছের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল এবং আর-এক ব্যক্তি আর-একদিকে চলে গেল ছায়ামূর্তির মতো!

বাগানের মাঝখানে বাড়ি। কোথাও কোনও সতর্ক দৃষ্টি জাগ্রত নেই দেখে এগুতে লাগলেন তিনি পায়ে পায়ে। চাঁদের আলো স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু দোতলায় রত্নাদেবীর ঘর কোনখানে সেটা আন্দাজ করতে তাঁর বিলম্ব হল না।

ভুবন পকেটের ভিতর থেকে রিভলভার বার করে রত্নার ঘরের দিকে হাত তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন!

গুড়ুম!

প্রথম গুলিতে ঝন ঝন শব্দে কাচের শার্সি ভেঙে পড়ল। তারপরেই শোনা গেল একটা চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক ব্যক্তির দ্রুত পদশব্দ!

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

—'ওখানে কে? মন্মথ?' চিৎকার করে উঠল সুবোধ।

—'মন্মথ, মন্মথ!'

—'এই যে, আমি এইদিকে।'

দুইজন গোয়েন্দাই পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। হাতে তাদের রিভলভার।

উপর থেকে নারীকণ্ঠে শোনা গেল—'সুবোধবাবু, সুবোধবাবু!'

সুবোধ বাড়ির দিকে ছুটে গিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, 'রত্নাদেবী, আপনি? আপনার গায়ে গুলি লাগেনি তো?'

—'না, আমার কিছু হয়নি। কিন্তু রিভলভার ছুড়ছে কে?'

—'কে যে ছুড়ছে জানি না, কিন্তু আমরা নই। আপনি ঘরের ভিতর দিকে সরে যান, আবার কেউ গুলি ছুড়লে আপনি আহত হতে পারেন।'

কিন্তু সেদিন আর কেউ গুলি ছুড়বে না। কারণ, সুবোধ মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে পেলে একটা উত্তপ্ত রিভলভার!

সে 'ম্যাগাজিন'টা বার করে দেখে বললে, 'কেউ তাড়াতাড়ি পালাবার সময় রিভলভারটা এখানে ফেলে গিয়েছে। চারবার গুলি ছোড়া হয়েছে। ভিতরে এখনও দুটো গুলি রয়েছে। তুমি কারুকে দেখতে পাওনি?'

মন্মথ বললে, 'বিশেষ কারুকে নয়। কেবল মনে হল যেন, একটা ছায়া সাঁৎ করে চলে গেল গাছের আড়ালে। চলো, ভালো করে খুঁজে দেখি।'

কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাগানের ভিতর আর কারুরই পাত্তা পাওয়া গেল না।

বসন্তের চোখে তখনও ঘুম আসেনি। সেই সময়ে রিভলভারের প্রথম আওয়াজটা শুনেই তিনি

চমকে উঠে খাটের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়েই শুনতে পেলেন আবার তিনবার রিভলভারের গর্জন।

তিনি দ্রুত ছুটতে লাগলেন তপোবনের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন আর-একজন লোকেরও দ্রুত পদশব্দ।

নিজের রিভলভারটা বার করে বসন্ত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওখানে?'

উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর হল—'আমি শ্যামল। রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে আসছি।'

দুজনেই একসঙ্গে ছুটতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যামলের একখানা হাত চেপে ধরে বসন্ত বললেন, 'পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?'

শ্যামল নির্দেশমতো তাকিয়ে দেখলে।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝাপসা। তবু ছায়ামূর্তির মতো দেখা গেল সাদা সওয়ারকে। তিরের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে সে দূরে—আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

অষ্টম
অদৃশ্য মৃত্যু

পরদিনের প্রভাতি চায়ের আসরে টেবিলের তিন দিকে বসেছিলেন বসন্ত, শোহনলাল ও শ্যামল।

বসন্ত বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই নিরেট বোকামি বলে মনে হচ্ছে। একটা তথাকথিত প্রেতাত্মা এখানে প্রধান নায়ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে যে কোনও অপরাধ করেছে, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি। একদিন এক নারীর চিৎকার শোনা গিয়েছে, আর মারা পড়েছে চন্দ্রকান্ত। তারপর কালকের রাত্রের ঘটনা। রত্নাদেবীর উদ্যানে হয়েছিল এক অনাহুত ভদ্রলোকের আবির্ভাব—সেই যে সাদা সওয়ার, একথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু সে প্রথম শ্রেণির গর্দভের মতো রত্নাদেবীর ঘরের জানলা লক্ষ্য করে উপর-উপরি চারবার ছুড়েছে রিভলভার। সে নিশ্চয়ই জানত, নীচে থেকে অমন করে গুলি ছুড়ে ঘরের কারুকেই হত্যা করা যাবে না। তারপর রত্নাদেবী যখন নিজেই জানলার সামনে এসে দেখা দেন, তখনও তার রিভলভারের ভিতরে দুটো গুলি অবশিষ্ট ছিল। তবু সে গুলি ছোড়েনি, বরং ইচ্ছা করেই আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছে তার রিভলভারটা। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, রত্নাদেবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তার ছিল না। তবু পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার ঝুঁকি নিয়ে এই পণ্ডশ্রম আর চার-চারটে বুলেট নষ্ট করা কেন? হয়তো সে নির্বোধ নয়। হয়তো সে নতুন কোনও চক্রান্তের আয়োজন করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই নতুন চক্রান্তটা কী?'

শ্যামল শুধোলে, 'এ সম্বন্ধে আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারেননি?'

—'হয়তো কোনও কোনও কথা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু সেই আন্দাজের উপরে নির্ভর করে আপাতত কিছুই করতে পারিনি।'

—'এই সাদা সওয়ার যে কে, সে কথা আপনি বলতে পারেন?'

—'হয়তো বলতে পারি, কিন্তু তাও বলবার সময় এখনও হয়নি।'

শ্যামল রাগত স্বরে বললে, 'আপনারা যদি এমন হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, তাহলে রত্নাদেবী

যে-কোনও দিন সমূহ বিপদে পড়তে পারেন, সেটা বুঝতে পারছেন কি?'

শোহনলাল বললে, 'ব্যস্ত হবেন না, শ্যামলবাবু। বসন্তবাবু এখন নিরুপায়। কারুকে গ্রেপ্তার করবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। ধরুন, সাদা সওয়ারের কথা। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ঘোড়ায় চড়ে সে নৈশভ্রমণ করে! এটা তার খুশি বা খেয়াল। এজন্যে কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। গ্রেপ্তার করলেও বিচারে সে মুক্তি পাবে আর সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা প্রহসন।'

বসন্ত গাত্রোত্থান করে বললেন, 'চলুন, আমরা রত্নাদেবীর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

রত্নাদেবী তার বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পাঠ করছিল। পদশব্দ শুনে সে মুখ তুলে দেখলে। তার ওষ্ঠাধরে ফুটল মৃদু হাস্য।

বসন্ত বললেন, 'নমস্কার, রত্নাদেবী। আপনি বহাল তবিয়তে আছেন দেখে খুশি হলুম।'

রত্না বললে, 'কাল রাত্রে আমি চমকে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু হয়নি। তবে রিভলভার নিয়ে এই ছেলেখেলা করার কারণটা আমি ধরতে পারছি না।'

—'আমারও ওই অবস্থা। আপনার বাড়িতে দুখানা অতিরিক্ত ঘর আছে কী?'

রত্না বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'তা আছে। কিন্তু আপনার ওই অদ্ভুত প্রশ্নের অর্থ কী?'

—'বিনা আমন্ত্রণেই শোহনলালকে নিয়ে আমিও আপনার বাড়িতে বাস করতে চাই। আজ থেকেই। কালকের রাত্রের ঘটনার পর আমার ভয় হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তেই আপনি বিপদে পড়তে পারেন। ঘটনাস্থলে সর্বদা উপস্থিত থাকলে আমরা ভালো করে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারব। আপনার মত কী?'

রত্না বললে, 'আমার কোনও আপত্তিই নেই। বরং আপনাদের কাছে পেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।'

বসন্ত বললেন, 'এইবারে আপনার বাবার গুপ্তধনের কথা। গুপ্তধন যে কোথায় আছে, আপনি তা জানেন। এইবারে তার একটা ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি?'

—'গুপ্তধন যেখানে আছে সেইখানেই থাক। আমি তা স্পর্শ করতে বা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই।'

রত্নার কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

বসন্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'উত্তম! কিন্তু আমরা আজ থেকেই যে আপনার অতিথি হব, এটা যেন ভুলে যাবেন না।'

বসন্তের সঙ্গে শোহনও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। শ্যামল কিন্তু সেইখানেই থেকে গেল।

ডাকঘরের সামনে হঠাৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভুবনবাবুর। তিনি হাস্যমুখে নমস্কার করে বললেন, 'এই যে, আপনারা তপোবন থেকে আসছেন বুঝি? কালকের গুলিবর্ষণের ব্যাপারটা আমারও কানে উঠেছে।'

মৃদুস্বরে বসন্ত বললেন, 'তাই নাকি?'

—'কেবল তাই নয়, কাল খুব কাছ থেকেই সাদা সওয়ারকে আমি দেখতে পেয়েছি।'

—'আপনি কিছু লক্ষ করতে পেরেছেন কি?'

—'হ্যাঁ, লক্ষ করেছি অদ্ভুত একটা ব্যাপার। তাকে এত কাছ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে,

তাড়াতাড়ি আমি বাড়িতে ছুটে আসি। অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক যুগে ভূত-প্রেত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু আমার চোখের সামনেই ঘটেছে একটা আজব ঘটনা। স্পষ্ট দেখলুম, সাদা সওয়ার হঠাৎ তার ঘোড়া থামিয়ে পথের উপরে নেমে পড়ল। কিন্তু তার পরমুহূর্তে যা হল, আপনারা হয়তো সেকথা বিশ্বাস করবেন না। সাদা সওয়ার মাটির উপরে পদার্পণ করেই একেবারে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।'

—'তারপর?'

—'আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এমন অলৌকিক কাণ্ড জীবনে আর কখনও দেখিনি। তারপর আবার এক অদ্ভুত দৃশ্য। সাদা সওয়ার আবার দেহধারণ করে একলাফে ঘোড়ার উপরে উঠে বসল, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল পথের মোড় ফিরে। কিন্তু তখনও দূর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছিলুম দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ।'

বসন্ত বললেন, 'আশ্চর্য কথা বটে। আচ্ছা, সাদা সওয়ার যেখানে ঘোড়ার উপর থেকে নেমেছিল, আমাদের সেইখানে নিয়ে চলুন তো!'

কিছুক্ষণ পদচালনার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভুবনবাবু বললেন, 'সে ঘোড়া থেকে নেমেছিল ঠিক এইখানেই!'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বসন্ত দেখতে পেলেন, পথের উপরে পড়ে রয়েছে একটা ঘোড়ার পায়ের নাল।

সেটা হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে বসন্ত বললেন, 'ঘোড়ার পায়ের নাল যে খুলে গিয়েছে, সাদা সওয়ার নিশ্চয়ই তা টের পেয়েছিল। তার ঘোড়া থেকে নামবার কারণটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু তার অন্তর্ধান আর পুনরাবির্ভাবের কোনও হদিসই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। সেদিন বসন্তের জীবন রক্ষা করলে তুচ্ছ একটি কারণ।

নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ কে তাঁকে গা ঠেলে জাগিয়ে দিলে।

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বসন্ত বললেন, 'কে এখানে?' সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে ঘরে আলোটা জ্বেলে দিলেন।

হঠাৎ আলোর ধাক্কায় চোখ মিটমিট করতে করতে মন্মথ বললে, 'বাইরে ঝোপের আড়ালে কে একজন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি সুবোধকে জাগিয়ে দিয়ে আপনাকে ডাকতে এসেছি।'

—'বেশ করেছ।' তাড়াতাড়ি তিনি জামা পরতে লাগলেন।

মন্মথ বললে, 'শোহনলালকেও জাগিয়ে দেব?'

—'দরকার নেই।' বলে বসন্ত দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মন্মথ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'এইদিকে আসুন, স্যার!'

দুজনে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়া তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। সুবোধ। সে বললে, 'ওই ঝোপটার ভিতরে এখনও কেউ লুকিয়ে আছে।'

আচমকা ঝোপটা দুলিয়ে একটা সাদা মতো কী বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ তুললে তার রিভলভার।

বসন্ত চট করে মন্মথের হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'থামো বাপু, থামো! ওটা হচ্ছে একটা গোরু। ভয় নেই, ও তোমাকে গুঁতোতে আসবে না।' বলেই মাটি থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে গোরুটার দিকে নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে টেনে লম্বা দিলে।

বসন্ত ফিরে বললেন, 'মন্মথ, এইবার বুঝি তোমার রাত জাগবার পালা?'

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আজ আর তোমাকে রাত জাগতে হবে না। ঘুম যখন ভেঙেছে, আমার চোখে আর ঘুম আসবে না। আমি এইখানেই বসে রইলুম। তুমি আমার ঘরে গিয়ে বাকি রাতটা ভালো করে ঘুমিয়ে নাও।'

কিন্তু বসন্তের পাহারা দেওয়া আর হল না, কারণ বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় দেখতে দেখতে তাঁর দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। তার কতক্ষণ পরে তা তিনি জানেন না, কিন্তু আবার কে তাঁর গা ধরে নাড়া দিতেই তিনি চোখ মেলে দেখলেন, চারিদিকে ধবধব করছে দিনের আলো!

একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বসন্ত বললেন, 'ওঃ, কী হুঁশিয়ার পাহারাওয়ালা আমি!' হনহন করে তিনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর নিজের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তখনও ভাঙেনি মন্মথের ঘুম। —'আজ কি সবাইকেই ঘুমে পেয়েছে।' এই বলে তিনি মন্মথের গা ধরে নাড়া দিতে দিতে বললেন, 'ওহে, উঠে পড়ো, বেলা হয়েছে! মন্মথ, মন্মথ!'

তবু কোনও সাড়া নেই। বসন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে মন্মথের জামার বোতাম খুলে তার বুকে হাত দিয়েই অত্যন্ত চমকে উঠলেন! তার হৃৎপিণ্ড স্থির। মন্মথ বেঁচে নেই!

প্রথমটা তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিতের মতো। তারপরই দেওয়ালের দিকে তাঁর দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। মন্মথের শয্যা পাতা ছিল দেওয়াল ঘেঁষে এবং তার মাথার পাশে দেওয়াল বয়ে নীচে নেমে এসেছে একটা রবারের নল। একটা 'ভেন্টিলেটারে'র ভিতর দিয়ে নলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে বাইরের দিকে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই দিককার জানলা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, নলের অন্য প্রান্তটা বাইরের দেওয়াল বয়ে প্রায় বাগানের মাটি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

ঘরের ভিতর দিকে ফিরে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বসন্ত অল্পক্ষণ কী চিন্তা করলেন। তাঁর মনে জাগল একটা সন্দেহ। তিনি হেঁট হয়ে পড়ে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি মেঝের ইঞ্চি কয়েক উপরে নিয়ে গেলেন। কাঠিটা তৎক্ষণাৎ নিবে গেল। আবার একটা কাঠি জ্বাললেন। কিন্তু তাও গেল নিবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'কার্বন মোনোক্সাইড গ্যাস দিয়ে বেচারা মন্মথকে পরলোকে পাঠানো হয়েছে। ভগবান সাক্ষী, একাজ যে করেছে, ফাঁসিকাঠে তাকে ঝুলতে হবেই।'

পরদিন সকালে রত্না যখন তাঁকে চা খেতে ডাকলে, বসন্ত তার কাছে কোনও কথা ভাঙলেন না। শোহনলাল থানায় গিয়েছিল, সেইজন্যে তাঁরা দুজনেই নীরবে চা পান করতে লাগলেন।

এমন সময় বাগান থেকে শোনা গেল শ্যামলের মোটরের সুপরিচিত ভেঁপুর আওয়াজ।

বসন্তের মুখের উপরে ঘনিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা কালো ছায়া। শ্যামল সম্বন্ধে তিনি পুলিশ কমিশনারের কাছে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, আজ সকালেই তার জবাব এসেছে। অদ্ভুত জীব এই শ্যামল। সে যে এখানকার ঘটনাগুলোর দিক দিয়ে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত আছে, সেবিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কোন ভূমিকায় সে অভিনয় করছে, সেইটেই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

শ্যামলের আবির্ভাবের আগেই বসন্ত চেয়ার ত্যাগ করে বললেন, 'রত্নাদেবী, আমি শোহনলালের গাড়ির 'হর্ন' শুনেছি। তিনি বোধহয় থানা থেকে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে আমার জরুরি পরামর্শ আছে। এখন আমি নিজের ঘরে চললুম।'

বসন্তের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলের প্রবেশ। সে ঘরে ঢুকেই প্রফুল্ল মুখে বলে উঠল, 'সুপ্রভাত, রত্না! আজকের এমন সুন্দর প্রভাতটা তুমি ঘরের কোণে বসে নষ্ট করছ কেন?'

—'করছি নাকি?'

—'করছ বই কি! তুমি কেবল ঘরের কোণেই বন্দি নও, আবার দু-দুটো গোয়েন্দা হয়েছে তোমার সঙ্গী! গোয়েন্দার নাম শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।'

—'কোন শ্রেণির লোক আমার সঙ্গী হবেন, সেটা কি আপনিই আমার জন্যে নির্বাচন করতে চান?'

—'আচ্ছা, ও-আলোচনা এখন থো করো। এখন আমি তোমাকে নিয়ে আমার গাড়িতে চড়ে খানিকটা বেড়িতে আসতে চাই। Querida Mia তোমার মত কী?'

সন্দিগ্ধ স্বরে রত্না বললে, 'Querida Mia? ও-কথার মানে কী? ওটা কোন দেশি কথা?'

—'কথাটা স্পেন দেশের। ওর মানে হচ্ছে, 'বেড়ালে খিদে বাড়ে'!'

—'বাবার লাইব্রেরিতে স্পেনীয় ভাষার অভিধান আছে!'

—'থাক গে। তা নিয়ে সময় নষ্ট করো না। চলো, বেড়িয়ে আসি।'

রত্না দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'বেশ, জামা-কাপড় বদলে এখনই আমি আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

মিনিট-দশেক সেইখানে চুপ করে বসে রইল শ্যামল। তারপর সাজ-পোশাক পরিবর্তন করে রত্না যখন ফিরে এল, অত্যন্ত গম্ভীর তার মুখ।

শ্যামলের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রত্না ধীরে ধীরে বললে, 'আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।'

ইতিমধ্যে এখানে আসবার আগে সে লাইব্রেরিতে ঢুকে স্পেনীয় অভিধান খুলে দেখে এসেছে 'Querida'র মানে হচ্ছে, 'প্রিয়তমা'।

—'শর্তটা কী, শুনি?'

—'আপনি আর কখনও আমাকে 'Querida' বলে ডাকবেন না।'

সকৌতুকে হাস্য করে শ্যামল বললে, 'তোমার যদি আপত্তি থাকে, নিশ্চয়ই ডাকব না। শান্তিস্থাপনের জন্যে আমি যে-কোনও শর্তে সই করতে প্রস্তুত। এখন চলো।'

রোদে কাঁচা সোনার আভাস, আকাশে নীলপদ্মের রং, বাতাসে মধুর স্নিগ্ধতা। তরুমর্মর ও পাখির গান শুনতে শুনতে এবং মাঠে মাঠে ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে গাড়িতে চড়ে তারা এগিয়ে চলল। তারপর রাজবাড়ির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল দুজনেই।

ধ্বংসাবশেষের পাশেই ছিল ছোটোখাটো একটা পাহাড়ের মতো উচ্চভূমি। সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে রত্না বললে, 'ওখানে আমি কখনও যাইনি।'

শ্যামল মৃদুস্বরে বললে, 'বেশ, চলো।' উচ্চভূমির টঙে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, দিকে দিকে বিচিত্র সবুজের সমারোহ।

রত্না উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'কী চমৎকার!'

শ্যামল কোনও কথাই বললে না।

রত্না বললে, 'আপনি হঠাৎ বোবা হয়ে গেলেন কেন?'

—'উপায় কী? আমার উপরে হুকুম হয়েছে, আমি Querida বলতে পারব না। তাহলে যাকে ভালোবাসি, তাকে আমি কী বলে ডাকব? তুমিই না-হয় সেটা আমাকে বলে দাও।'

রত্না মাথা নত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক মুখে।

শ্যামল বললে, 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি ভালোবাসি, আজ এই কথাটাই জোর করে বলতে চাই। কাল যদি আমাকে হঠাৎ এখান থেকে চলে যেতে হয়, তোমার সঙ্গে যদি আর কখনও আমার দেখাও না হয়, তাহলেও তুমি চিরদিনই আমার মনকে অধিকার করে থাকবে। এখন তুমি কথা কইছ না কেন? যা বললুম বুঝতে পেরেছ কি?'

খুব আস্তে রত্না বললে, 'হ্যাঁ।'

আচম্বিতে শ্যামলের দুই বাহু বেষ্টন করে ধরলে রত্নার দেহকে। তারপর তন্ময়দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে শ্যামল গাঢ়স্বরে ডাকলে, 'রত্না!'

রত্না তখনও কিছু বললে না এবং নিজেকেও তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলে না। তারপর, শ্যামল করলে তার মুখচুম্বন। তার ললাটে, তার কপোলে, তার ওষ্ঠাধরে এসে পড়ল চুম্বনের পর চুম্বন।

রত্না তখনও কোনও আপত্তি করলে না বটে, কিন্তু শ্যামলের হাত ছাড়িয়ে একটু তফাতে গিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'এইখানে ঘাসের উপরে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

শ্যামল তার কথামতো সেইখানে উপবেশন করলে।

কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে রত্না বললে, 'এখানা হচ্ছে একখানা টেলিগ্রাম। বসন্তবাবু এখানা পাঠ করে ছিঁড়ে 'ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে'র ভিতরে ফেলে দিয়েছিলেন। এক খণ্ড কাগজ উড়ে ঘরের মেঝের উপরে গিয়ে পড়েছিল, তাতে আপনার নাম দেখে আমি সেখানা কুড়িয়ে নিই। তারপর অন্য খণ্ডগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে সমস্ত টেলিগ্রামখানা আমি পাঠ করি।'

শ্যামল সেখানা নিয়ে পাঠ করলে। টেলিগ্রামখানা লেখা ছিল ইংরেজিতে, তার বাংলা অনুবাদ এই :

শ্যামলকুমার সেনের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। বোম্বাই পুলিশ তাকে খুব চেনে। রাহাজানি ও বিষ দিয়ে নরহত্যা প্রভৃতির মামলায় সে জড়িত হয়েছিল। বোম্বাইয়ে সে এক বৎসর জেল খেটেছে। আপাতত তার বিরুদ্ধে তুমি কোনও কাজ-কোরো না। তার গতিবিধি লক্ষ করো। তোমার কথামতো তাকে গ্রেপ্তার করবার 'ওয়ারেন্ট' পাঠাচ্ছি বটে, কিন্তু এখন তাকে গ্রেপ্তার কোরো না।

—সুধাকান্ত চৌধুরি

রত্না কাতরকণ্ঠে বললে, 'শ্যামলবাবু! এসব অভিযোগ নিশ্চয়ই সত্য নয়?'

শ্যামল স্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'সত্য।'

—'আপনি এক বছর জেল খেটেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।'

—'রাহাজানি, নরহত্যা?'

—'হয়তো তাই।'

রত্নার মাথা ঘুরতে লাগল, তার সারা দেহ অবশ হয়ে এল। সে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, শ্যামল তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাকে ধরে ফেললে।

শ্যামলের হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে রত্না তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'আপনি রাহাজানি করেছেন, আপনি খুন করেছেন, আপনি জেল খেটেছেন, হা ভগবান! মানুষ চেনা এতই কঠিন?'

শ্যামল রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'রত্না! অপেক্ষা করো। আমার উপরে অবিচার কোরো না।'

—'এইসব ভয়ানক কথা জানবার পরও আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?'

—'হ্যাঁ।'

—'তারপর আপনি এখানে এসেছেন, গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন—কিন্তু কেন, কেন, কেন?'

শ্যামল প্রায় ভগ্নস্বরে বললে, 'আপাতত আমার কথাকেই বিশ্বাস করতে হবে। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারব না—বললেও তুমি বুঝতে পারবে না।' তারপর হঠাৎ থেমে শান্তকণ্ঠে বললে, 'এখন চলো, বেলা হয়েছে, গাড়িতে উঠবে এসো।'

—'না। আপনার সঙ্গে আমি যাব না।'

—'পাগলামি কোরো না, চলো।'

—'না, না, না! চলে যান আপনি এখান থেকে।'

—'শোনো—'

—'আপনি এখনই যদি এখান থেকে চলে না যান, তাহলে একলাই আমি বিদায় হচ্ছি।'

শ্যামল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রান্তস্বরে বললে, 'বেশ, তাহলে আমিই যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবে, আমি থাকব চিরদিনই তোমার অনুগত।' বলেই সে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপদে নেমে গেল উচ্চভূমির উপর থেকে। তারপর নিজের মোটরে গিয়ে উঠে গাড়ি দিলে চালিয়ে। নিজের মনেই বললে, 'এখান থেকে এখনও আমি চলে যেতে পারব না, এখনও আমার চলে যাবার সময় হয়নি। যা করতে এসেছি তা না করে এখান থেকে কিছুতেই আমি নড়তে পারব না। আমাকে বিচার করবেন, স্বয়ং ভগবান! অন্তত আর এক সপ্তাহ আমাকে রাধাপুরেই বাস করতে হবে, তার ভিতরেই ভগবান নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হবেন।'

আর এক সপ্তাহ! কিন্তু এই সপ্তাহ যে কী ভীষণ বিপজ্জনক, শ্যামল মনে মনে সেটা উপলব্ধি করতে পারলে।

নবম

রত্না হরণ

—'শোহনলালবাবু, এখানে চুপ করে একলাটি বসে বসে কী করছেন?' প্রশ্ন করলেন বসন্ত।

—'প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি।'

ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসন্ত সিগারেটে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়ে একরাশি ধূম্র উদ্‌গিরণ করলেন। তারপর ঊর্ধ্বোত্থিত ধূম্রকুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন, না মস্তিষ্কচালনা করছেন? ঠিক কী ভাবছেন বলুন দেখি?'

শোহনলাল একটু বিরক্ত ভাবে বললে, 'বসন্তবাবু আপনি নিশ্চয়ই নিজেকে সুচতুর বলে ভাবেন।'

বসন্ত কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই! একথা কি আপনিও জানেন না?'

—'আমার জানা-অজানার উপরে কিছুই নির্ভর করছে না। কিন্তু বলুন দেখি, ওই সেকেলে ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে আমাদের বর্তমান মামলাটার সম্পর্ক কী?'

—'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

—'এ প্রশ্ন ওঠে বই কি। গভীর রাত্রে সাদা সওয়ারকে ওই ধ্বংসস্তূপের উপরে দেখা যায় কেন? এত জায়গা থাকতে সেখানেই বা তার আবির্ভাব হয় কেন? সেখানে গিয়ে সে কী করে, সে কী করতে পারে?'

—'সে মাটি খুঁড়ে দেখে।'

—'কী করে জানলেন আপনি?'

—'ওই ধ্বংসস্তূপটা আমি নিজে পরীক্ষা করে এসেছি। স্বচক্ষে দেখেছি জায়গায় জায়গায় নতুন মাটি খোঁড়ার চিহ্ন।'

—'কেন সে মাটি খোঁড়ে?'

—'গুপ্তধন আবিষ্কার করবার জন্যে।'

—'এত জায়গা থাকতে ওই ধ্বংসস্তূপই বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কেন?'

—'হয়তো এটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। এখানকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস, 'তপোবনে'র ভিতর থেকে ওই ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ আছে, এসব সেকেলে জনশ্রুতি আমরা আমলে আনতে না পারি, কিন্তু সাদা সওয়ার আমাদের দলের লোক নয়।'

শোহনলাল আর কিছু না বলে একটি সিগারেট ধরালে। দুইজনে ধূমপান করতে লাগল মৌনমুখে।

হঠাৎ শোহনলাল বলে উঠল, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!'

ইজিচেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বসন্ত বললেন, 'মানে?'

শোহনলাল নীরবে সুদূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সেখান থেকে দূরে দেখা যাচ্ছিল ধ্বংসস্তূপের উচ্চভূমিটা। তার উপরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুই মূর্তি—একজন পুরুষ ও একজন নারী!

বসন্ত বললেন, 'স্বর্গীয় দৃশ্যই বটে। ওই দৃশ্যের নট-নটী হচ্ছে শ্যামল আর রত্না। কিন্তু শোহনলালবাবু, ওই শ্যামলকে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি।'

—'কেন!'

—'কেন? বোলতা দেখলে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে কেন? সে জানে, একটু অসাবধান হলেই তাকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর দেহের কোথায় হবে যে সে যন্ত্রণা, মানুষ তা আগে থাকতে জানতে পারে না।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। আপাতত মুখ বন্ধ করুন। আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে দিন।'

বসন্ত ইজিচেয়ারে পা-দানের উপরে দুটো পা তুলে দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনও দিকে না তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন নিমীলিত নেত্রে।

পুলিশ কমিশনারের আদেশ তাঁর ভালো লাগেনি। শ্যামলের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যে তাঁর উপরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে নাকি এখন গ্রেপ্তার করা চলবে না।

শ্যামলের মুখ পরিচিত হলেও তিনি আগে তাকে চিনতে পারেননি। পুলিশ কমিশনারের টেলিগ্রাম পাবার পর এখন সব কথা তাঁর মনে পড়ছে। শ্যামল হচ্ছে একজন অসাধারণ অপরাধী। কয়েক বৎসর আগে গুন্ডাদের সর্দার আলগু রিভলভারের গুলিতে মারা পড়ে এবং সকলেই একবাক্যে বলেছিল, সে হচ্ছে শ্যামলের কীর্তি। এ সম্বন্ধে পুলিশ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতেও বাকি রাখেনি। শ্যামল সকলের মুখের উপরে হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, 'আপনারা হচ্ছেন বাক্যবাগীশের দল, কেবল বড়ো বড়ো ফাঁকা বুলি কপচাতেই শিখেছেন। আগে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করুন, তারপর আমার সঙ্গে কথা কইতে আসবেন।' পুলিশকে হার মেনে বোবার মতো চলে আসতে হয়।

আলি বলে আর একটা বদমাইশ ছিল, পথে পথে সে রাহাজানি করে বেড়াত। বার দুয়েক তার বিরুদ্ধে খুনের মামলাও রুজু হয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে সে খালাস পেয়েছে। একদিন আলিরও মৃতদেহ পাওয়া যায় মধ্য কলকাতার একটা সরু গলির ভিতরে। তার বুকে ছিল ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগেই তাকে দেখা গিয়েছিল শ্যামলের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দারা মত প্রকাশ করে, আলি মারা পড়েছে শ্যামলেরই হাতে। সেবারেও তাকে থানায় ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিন্তু ওই পর্যন্ত! তাকে গ্রেপ্তার করা চলে, তার বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি। আজ রাধাপুরে হয়েছে সেই শ্যামলেরই আবির্ভাব। সে যে এখানে এসেছে গোবিন্দদাসের গুপ্তধনের লোভেই, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

বসন্ত ভাবতে লাগলেন, এখন কী করা যায়?

শোহনলাল হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক কথা! তাকে গ্রেপ্তারই করুন।'

অত্যন্ত চমকে উঠে বসন্ত বললেন, 'কাকে?'

—'শ্যামলকে!'

—'আপনি কি অন্তর্যামী?'

—'উঁহু, আমি একজন সামান্য গোয়েন্দা মাত্র, দেখলুম আপনি মাঝে মাঝে একবার শক্ত হয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করছেন, তারপর আবার কতকটা শান্ত হয়ে মাথা নাড়ছেন। বুঝলুম আপনার মন সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান। আরও দেখলুম, আপনি থেকে থেকে বারবার ঘরের দরজার দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। যেন আপনি এখানে আর কারুকে দেখবার প্রত্যাশায় আছেন। কিন্তু এখানে আর কে আসতে পারে? হয় রত্নাদেবী, নয় শ্যামল। আন্দাজে আমি ওই দুজনের ভিতরে একজনকে নির্বাচন করে নিয়েছি। পদ্ধতিটা আধুনিক নয়—এটা হচ্ছে প্রাচীন শার্লক হোমসের পদ্ধতি।'

বসন্ত চিন্তিতমুখে বললেন, 'শোহনবাবু, শ্যামলকে নিয়ে আমায় রীতিমতো মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আপনি জানেন না, সে কী রকম বিপজ্জনক লোক।'

ঠিক সেই সময় দেখা গেল, ফটক দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করছে আর এক মূর্তি।

শোহনলাল বললে, 'এই যে, পাদরি বিনয়বাবু আসছেন!'

বসন্ত বললেন, 'শ্যামলের মুখে শুনেছি, বিনয়বাবুর সাধ উনি শখের গোয়েন্দা হবেন।'

শোহন বললে, 'পাদরি হবে গোয়েন্দা, আবার গোয়েন্দা হবে পাদরি? আজব কথা বটে।'

বিনয়বাবু ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন, তারপর একমুখ হেসে বললেন, 'এমন চমৎকার দিনেও আপনারা কেবল অপরাধতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তো?'

বসন্ত বললেন, 'একরকম তাইই বটে। আসুন স্যার, বসুন। শুনলুম, আপনি নাকি শখের গোয়েন্দা হতে চান?'

—'এটা একটা বাজে খেয়াল বসন্তবাবু! পাদরিদেরও সত্যিকার জীবন দেখবার সাধ হয় না কি?'

বসন্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'অপরাধের ভিতরে সত্যিকার জীবন পাওয়া যায় না। অপরাধ একটা ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

—'আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত পুলিশ কর্মচারী। কিন্তু আপনি কি সাদা সওয়ারের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমাণই আবিষ্কার করতে পারেননি? আমি তো জানি, প্রমাণ আছে আপনার কাছেই।'

—'কী রকম?'

—'আপনি তো সাদা সওয়ারের ঘোড়ার পায়ের একটা নাল হস্তগত করেছেন?'

—'করেছি বটে। কিন্তু সেটা কোন ঘোড়ার খুরের নাল, একথা কেমন করে প্রমাণিত হবে?'

—'খুব সহজেই। ভুবনবাবুর মুখেই শুনেছি, সাদা সওয়ার কাল রাত্রে পথের যেখানে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিল, এ নালটা পাওয়া গিয়েছে ঠিক সেইখানেই।'

—'হতে পারে। কিন্তু সাদা সওয়ার যে ওই নালটা খোঁজবার জন্যেই ঘোড়া থেকে নেমেছিল, এটা কিছুতেই জোর করে বলা যায় না! তার উপরে এইটুকুই খালি জানা গিয়েছে যে, সাদা সওয়ার কেবল রাত্রেই ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। সেটা অপরাধ নয়। তাকে হাতে-নাতে কোনও বেআইনি কাজ করতে দেখেছে, আজ পর্যন্ত এমন একজন সাক্ষীও পাওয়া যায়নি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যাক গে সাদা সওয়ারের কথা। গির্জাসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আমি এখন এসেছি রত্নাদেবীর কাছে। তিনি বাড়িতে আছেন তো?'

বসন্ত বললেন, 'রত্নাদেবী খুব সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।' বলেই তিনি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাই তো, বেলা বারোটা বাজে! আমরা মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে অপেক্ষা করছি, কিন্তু রত্নাদেবী এখনও এলেন না কেন?'

শোহনলাল সকৌতুকে বললে, 'ওঠা-নামা প্রেমের তুফানে! সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, প্রেমিক-প্রেমিকারা তা আন্দাজও করতে পারে না। তাই তাঁরা এখনও ফিরে আসেননি—হয়তো তাঁরা ফিরে আসবেন বৈকালে চা পানের সময়ে!'

বিনয়বাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'তাঁরা মানে?'

—'তাঁরা মানে, রত্নাদেবী আর শ্যামলবাবু। তাঁরা আজ দুজনেই একসঙ্গে একাত্মা হয়ে আছেন।'

বিনয়বাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'রত্নাদেবী আর শ্যামলবাবু? প্রায় দুই ঘণ্টা আগে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শ্যামলবাবু একলাই বাড়িতে ফিরে এসেছেন।'

বসন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি ঠিক দেখেছেন তো?'

—'নিশ্চয়! শ্যামলবাবু এখন তাঁর নিজের বাসায় ভিতরেই আছেন।'

শোহনলালও সচমকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বসন্তবাবু, ব্যাপারটা কিছুই তো বুঝতে পারছি না। শ্যামলবাবু নিজের বাসায়, কিন্তু রত্নাদেবী এখনও অদৃশ্য! ভগবান জানেন, তিনি এখন কোথায়?'

বসন্ত দ্রুতপদে গাড়িবারান্দার কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'সুবোধ, সুবোধ!'

সুবোধ তখন গাছতলায় চেয়ারের উপরে বসে একখানা খবরের কাগজ পাঠ করছিল। বসন্তের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তটস্থ হয়ে বললে, 'আজ্ঞে স্যার, আমাকে ডাকছেন?'

—'হ্যাঁ। তুমি এখানে হুঁশিয়ার হয়ে অপেক্ষা করো। যদি তুমি রত্নাদেবীকে দ্যাখো,—তাঁর সামনে চোখ-কানকে সজাগ রেখে বসে থাকবে। তিনি যদি আর কোথাও যেতে চান, যেতে দেবে না। দরকার হলে তাঁকে গ্রেপ্তারও করতে পারো!'

সুবোধ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আজ্ঞে স্যার, রত্নাদেবী কি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন স্যার?'

ব্যঙ্গের স্বরে বসন্ত বললেন, 'না, তিনি অদৃশ্য হবেন কেন? তিনি তো তোমার সামনেই মূর্তিমান হয়ে বসে আছেন! নির্বোধ গর্দভ! যদি বুদ্ধিমানের মতো কথা কইতে না পারো, বোবা হয়ে থাকো! যা বলি শোনো। তোমার কাছে রিভলভার আছে?'

—'আছে স্যার, আছে।'

—'দরকার হলে তুমি রিভলভারও ব্যবহার করতে পারো। আসুন শোহনবাবু, আপনার গাড়ি চালান।'

মোটর সোজা ছুটে গিয়ে হাজির হল রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে। পাশেই পাহাড়ের মতো সেই উচ্চভূমিটা। বসন্ত ও শোহনলাল একেবারে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু সেখানে রত্নার কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না। সেখান থেকে নজর চলে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত। বসন্ত দূরবিন দিয়ে চারিদিক পরীক্ষা করলেন, কিন্তু পরীক্ষার ফল হল না সন্তোষজনক। ধ্বংসাবশেষের ভিতর ঢুকেও তাঁরা তন্নতন্ন করে খুঁজতে বাকি রাখলেন না। কিন্তু সমস্ত সন্ধানই ব্যর্থ হল।

বসন্ত প্রায় গর্জন করে বললেন, 'আজ আমি একটা কিছু করবই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে আছে শ্যামলেরই চক্রান্ত!'

দশম

ভুবনবাবুর ত্রিভুবন ত্যাগ

শ্যামলের বাড়ির সামনে বসন্তকে নামিয়ে দিয়ে শোহনলাল আবার তার বাসায় ফিরে গেল।

গায়ে একটা রঙিন ফুল-কাটা 'কিমনো' পরে শ্যামল বসেছিল একখানা আরাম-আসনে। তার ওষ্ঠাধরে তামাকের পাইপ ও কোলের উপরে একখানা খোলা কেতাব। হঠাৎ ঘরের দরজার কাছে বসন্তের আবির্ভাব দেখে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব।

শ্যামল বললে, 'মেঘ না চাইতে জল কেন?'

বসন্ত বললেন, 'কিন্তু মেঘের উদয় হয়েছে, সুতরাং বৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট।'

—'কিন্তু ব্যাপারটা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'ব্যাপারটা হচ্ছে এই! আমি এসেছি একটি মহিলার সন্ধানে! তাঁর মধ্যাহ্নভোজনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত!'

অবহেলাভরে শ্যামল বললে, 'তাই নাকি? মহিলাটি কে, শুনি?'

—'রত্নাদেবী। তাঁকে নিয়ে আজ সকালে আপনি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

—'তাই নাকি?'

বসন্তের মেজাজ তখন রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। তিনি কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই! তিনি কোথায় আছেন, আপনি তা জানেন।'

—'ও, তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমি যতক্ষণ তাঁর দেখা না পাই, ততক্ষণ এখান থেকে এক পা নড়ব না।'

—'তাহলে আমার এখানে আপনাকে বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে দিনের পর দিন।'

বসন্ত হঠাৎ এগিয়ে এসে শ্যামলের এক হাত ধরে সজোরে টান মেরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

শ্যামল পাইপটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তার ডান হাতখানা আলতো ভাবে রাখলে বসন্তের হাতের কব্জির উপরে। সঙ্গে সঙ্গেই বসন্তের বাহুর ভিতর দিয়ে বয়ে গেল একটা তীব্র যন্ত্রণা স্রোত এবং তিনি কয়েক পা পিছনে হটে এসে দাঁড়ালেন আচ্ছন্নের মতন।

শ্যামল শান্তকণ্ঠেই বললে, 'অমন করে আমার হাত ধরা আপনার উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনও করবেন না। মনে রাখবেন, আমি জাপানি যুযুৎসুর সব প্যাঁচই জানি।'

দুজনে দাঁড়িয়ে রইল দুজনের চোখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে।

বসন্ত হচ্ছেন শৌখিন মুষ্টিযুদ্ধে একজন বিখ্যাত পালোয়ান। দেহের ওজনে শ্যামলের চেয়ে তিনি বোধহয় আড়াইগুণ বেশি ভারী হবেন। ভয় তিনি কারুকেই করেন না, কিন্তু আপাতত এখানে হাতাহাতির দ্বারা কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

তিনি বললেন, 'আমি এখানে হাতাহাতি করতে আসিনি—যদিও দরকার হলে আমি তা করতে নারাজ নই।'

—'কিন্তু আপনি আমাকে কী করতে বলেন?'

—'রত্নাদেবী কোথায় আছেন, আপনাকে তা বলতে হবে।'

—'আর যদি আমি তা না বলি?'

—'আপনাকে বলতে বাধ্য করার উপায় আমার হাতে আছে।'

শ্যামল সকৌতুকে হেসে উঠল। তারপর পাশের টেবিলের উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে বসন্তের হাতে দিয়ে বললে, 'ভবিষ্যতে একটু হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবেন।'

কাগজখানা হচ্ছে পুলিশ কমিশনারের সেই টেলিগ্রাম। তার দিকে তাকিয়ে দেখেই বসন্তের মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'ও, বুঝেছি। এইজন্যেই অমন বেপরোয়ার মতন কথা বলছেন?'

আবার হেসে উঠে শ্যামল বললে, 'ধরুন, তাই। আপনার কাছে আমার নামে একটা 'ওয়ারেন্ট' আছে বটে, কিন্তু আপনি এখনও তা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ, আমার

বিরুদ্ধে আপনি কোনও প্রমাণই পাননি। আমি স্পষ্টকথার মানুষ। তাই স্পষ্ট ভাষাতেই বলছি, রাধাপুরে আমি এসেছি গুপ্তধনের লোভেই। যতদিন তা না পাই, আমাকে এইখানেই বাস করতে হবে। রত্নাদেবী এখন কোথায়, আমি সত্যসত্যই তা জানি না। বাসায় গিয়ে হয়তো আপনি দেখতে পাবেন, এতক্ষণে তিনি আবার ফিরে এসেছেন। রত্নাদেবীর উপরে কড়া পাহারা রাখুন। গুপ্তধন কোথায় আছে, সেটা তাঁর অজানা নেই। লোভে পড়ে কেউ তাঁকে হরণ করতে পারে। আমার এই উপদেশমতো আপনি কাজ করবেন কি?'

ব্যঙ্গের স্বরে বসন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ! আমি এখন যাচ্ছি বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে আসতে পারি।'

--'অনায়াসেই আসতে পারেন। কিন্তু এসেও কোনও ফল হবে না। আপনার হাতে আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই নেই।' শ্যামল আবার আরাম-আসনে বসে পড়ল প্রশান্তমুখে। তারপর সামনে দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে পাইপের ধূমপান করতে লাগল।

বসন্ত বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ তাঁরই হয়েছে পরাজয়। বাসার দিকে ফিরে আসতে আসতে তিনি মনে মনে বারবার প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হোক, শ্যামলকে উচিতমতো শিক্ষা না দিয়ে কিছুতেই তিনি ছাড়বেন না।

তপোবনের ভিতরে প্রবেশ করে দূর থেকেই সবিস্ময়ে তিনি দেখতে পেলেন, একতলায় বাইরেকার দালানে দুখানা চেয়ারের উপরে সামনাসামনি বসে আছে শোহনলাল এবং রত্না।

রত্নার দৃষ্টি যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো। কিন্তু বসন্তকে দেখে তার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল ম্লান হাসির রেখা।

শোহন বললে, 'মিনিট-খানেক হল রত্নাদেবী ফিরে এসেছেন। আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

বসন্ত শুধোলেন, 'আপনার কোনও বিপদ হয়নি তো?'

রত্না মৃদুকণ্ঠে বললে, 'বিপদে পড়েছিলুম বটে, কিন্তু রক্ষা পেয়েছি আশ্চর্যভাবে।'

—'কেউ কি আপনাকে আক্রমণ করেছিল!'

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

—'কে সে?'

—'জানি না। তার মুখে ছিল মুখোশ।'

শোহনলাল বললে, 'এসব জিজ্ঞাসাবাদ এখন বন্ধ রাখাই উচিত। সূর্যাস্তের সময় এসেছে, কিন্তু এখনও আমরা সবাই উপবাসী।'

বসন্ত বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আহারাদির পরেও অন্তত রত্নাদেবীর কিছুক্ষণের বিশ্রাম দরকার। তারপর, ওঁর মুখ থেকেই আমরা সব কথা শুনতে পাব।'

* *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। গোবিন্দদাসের লাইব্রেরিঘরে বসে বসন্ত ও শোহনলাল অপেক্ষা করছিলেন রত্নাদেবীর জন্যে।

একটু পরেই রত্না নীচে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসন্ত মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটির মনের জোর আছে বটে। এর শান্ত মুখে আর দুশ্চিন্তার কোনও চিহ্নই নেই। এর মধ্যেই নিজেকে একেবারে সামলে নিয়েছে। প্রকাশ্যে বললেন, 'রত্নাদেবী, এইবারে আপনার মুখে সমস্ত কথাই আমরা শুনতে চাই।'

বাধো বাধো গলায় রত্না বললে, 'বসন্তবাবু, আমার বেশি কিছুই বলবার নেই। সকালে শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমি ওই উচ্চভূমিটার উপরে গিয়ে উঠেছিলুম। তারপর—তারপর—তারপর তিনি একলাই নিজের বাসায় চলে যান। আমি আরও কিছুক্ষণ সেইখানে বসে রইলুম। তারপর—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একজন ভৃত্য। বললে, 'ভুবনবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

রত্না বললে, 'তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।'

ঘরের দরজার কাছে এসেই রত্নাকে দেখে ভুবনবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এই তো আপনি!'

বসন্ত বললেন, 'ভিতরে আসুন। কী খবর ভুবনবাবু?'

সকলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে ভুবনবাবু বললেন, 'রেভারেন্ড বিনয়বাবুর মুখে শুনলুম, কারা নাকি রত্নাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে!'

শোহনলাল বললে, 'বিনয়বাবুর মুখে শোনা যায় যত সব আজব কথা!'

ভুবনবাবু একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন, 'তাহলে খবরটা সত্য নয়? অত্যন্ত সুখের কথা! আমি—'

আচম্বিতে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি হয়ে গেল যেন সম্মোহিত। বসন্ত ফিরে ভুবনবাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন নিঃশব্দে।

ঘরের একটা দরজা একটু একটু করে খানিকটা খুলে গিয়েছে এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একখানা বাহু!

বসন্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরজার উপরে। কিন্তু তার আগেই সেই বাহু ঘরের বৈদ্যুতিক বাতির চাবিটা দিলে টিপে।

খোলা দরজার ভিতর দিয়ে এল একটা দমকা হাওয়া—কে যেন সাঁৎ করে সরে গেল সেখান থেকে। বসন্ত দুই হাতে খুঁজে পেলেন কেবল শূন্যতাকে। পরমুহূর্তে তিনি ফিরে আবার জ্বালিয়ে দিলেন আলো।

রত্না দাঁড়িয়ে আছে স্থির মূর্তির মতো। শোহনলাল দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালের উপরে হেলান দিয়ে, এক হাত তার কপালের সঙ্গে সংলগ্ন এবং তার হাতের তলা দিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে রক্তের ফোঁটা!

এবং ঘরের মেঝের উপরে দুই হাত ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ভুবনবাবুর দেহ—তার বুকের উপরে আমূল বিদ্ধ একখানা ছোরা!

বসন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শোহনবাবু, শোহনবাবু, আপনি কারুকে দেখতে পেয়েছেন কি?'

—'হ্যাঁ। ক্ষণিকের জন্যে আমি দেখেছি রেভারেন্ড বিনয়বাবুর মূর্তি!'

একাদশ

আগেকার ঘটনা

ভুবনবাবু চিন্তিতমুখে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিলে টেলিফোনের ঘণ্টী।

—'হ্যালো, ভুবনবাবু নাকি?'

—'কথা কইছি।'

—'আপনাকে যা যা করতে বলা হয়েছিল, তা আর করতে হবে না। যতদিন না নতুন কোনও নির্দেশ পান, ততদিনে রত্নাদেবীর কথা ভুলেও মনে আনবেন না। ফোন ছেড়ে দিন।'

'রিসিভার'টা তুলে রেখে ভুবনবাবু আবার হলেন চিন্তামগ্ন। তাঁর মনে হতে লাগল যতসব পরস্পরবিরোধী কথা। প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে, হুকুম তামিল করব কি করব না?

ভাবতে ভাবতেই স্টোভে জল চড়িয়ে নিজে চা তৈরি করে তিনি পান করতে লাগলেন। তারপর চায়ের জিনিস সরিয়ে পাঠ করতে লাগলেন রসায়নতত্ত্ব সম্পর্কীয় একখানা পুস্তক।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে কেটে গেল। তারপরেই সদর দরজার কড়া সশব্দে নড়ে উঠল। ডাকহরকরা এসেছে।

একখানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, একখানা বইয়ের দোকানের বিল আর একখানা খাম। খামের ভিতরের চিঠিতে অচেনা-হাতে লেখা ছিল এই কথাগুলি

'বৈকালে ফোনে তুমি যে নির্দেশ পেয়েছ, বুদ্ধিমানের মতো ঠিক সেই অনুসারে কাজ করবে। রত্নাদেবীকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামিয়ো না।'

সচমকে তিনি আবার খামের উপরে ডাকঘরের ছাপের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। চিঠিখানা ডাকঘরে গিয়েছে গতকল্যকার তারিখে। ব্যাপারটা অপার্থিব বলেই মনে হয়। আজ বৈকালে কে তাঁকে কী নির্দেশ দেবে, চব্বিশ ঘণ্টা আগে এই অজ্ঞাত পত্রলেখক কেমন করে তা জানতে পারলে?

চিন্তিত মুখে আবার তিনি টেলিফোনের হাতলটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন।

রত্না উচ্চভূমির উপর থেকে আবার নীচে নেমে এসে দাঁড়াল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলে, কে তার নাম ধরে ডাকছে, 'রত্নাদেবী, রত্নাদেবী!'

সে চেয়ে দেখলে পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে একখানা মোটরগাড়ি। একপাশে হেলে পড়ে মোটরের চালকই তাকে ডাকছে। তার চোখে কালো চশমা এবং তার মুখের তলার দিকে এমনভাবে চাদরে ঢাকা যে, সে চেনা কি অচেনা লোক কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সে তাড়াতাড়ি বললে, 'শিগগির গাড়িতে উঠে পড়ুন! বসন্তবাবুর কাছে আপনাকে এখনই যেতে হবে—সেখানে এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটেছে!'

কিছুই না ভেবেচিন্তে রত্না টপ করে গাড়ির ভিতরে উঠে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দিল ছেড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মন হয়ে উঠল সন্দিগ্ধ। গাড়ির ভিতরটা প্রায় অন্ধকার, তার সমস্ত জানলা কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। সে আবার গাড়ির দরজাটা খোলবার চেষ্টা করলে, পারলে না। হাতল ঘুরল বটে, দরজা তবু খুলল না।

তারপর অত্যন্ত আচমকা সে শুনতে পেলে একটা কণ্ঠস্বর

'রত্নাদেবী, চিন্তিত হবেন না।'

এতক্ষণ পরে সচকিত চক্ষে সে দেখতে পেলে, তার পাশেই বসে আছে একটা মূর্তি।

—'কে আপনি?'

—'আমার পরিচয়ের দরকার নেই।'

—'গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার কেন?'

—'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আপনি জানতে পারবেন না বলে।'

রত্না আর কিছু বললে না, তার মাথার ভিতর দিয়ে বইতে লাগল দুশ্চিন্তার ঝড়!

কেটে গেল প্রায় আধ ঘণ্টা।

তারপর লোকটা আবার কথা কইলে। বললে, 'আমরা প্রায় যথাস্থলে এসে পড়েছি। এইবার আমাকে আপনার চোখ বাঁধতে হবে।'

রত্না ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'না, কিছুতেই আমার চোখ বাঁধতে দেব না।'

লোকটা মৃদুকণ্ঠে হাস্য করে বললে, 'বাধা পেলে আমি বলপ্রকাশ করতে বাধ্য হব। সুতরাং চুপ করে বসে থাকুন।'

গাড়ি তখন ছুটছে না, দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভালো করে তার চোখ দুটো বেঁধে ফেলে লোকটা বললে, 'এইবারে গাড়ি থেকে নীচে নামুন।'

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হল। লোকটা তার দুই হাত ধরে তাকে গাড়ির ভিতর থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর খানিক দূর অগ্রসর হয়ে বললে, 'এইবারে আপনার সামনে সিঁড়ির তিনটে ধাপ। উপরে উঠুন।' তারপর সে তার হাত ধরে নিয়ে গেল কোনও বাড়ির ভিতর দিকে। বললে, 'আপনার পিছনেই চেয়ার, বসুন।'

অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে রত্না একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর সে অনুভব করলে, চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে কে তার হাত-পা-দেহ সব বেঁধে ফেলছে। তারপর খুলে গেল তার চোখের বন্ধনী।

দেখলে, সে বসে আছে একখানা বেশ বড়ো ঘরের ভিতরে। ঘরের দেওয়ালগুলো ঢেকে রয়েছে তাকের পর তাক এবং তাদের উপরে রয়েছে ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানা আকারের শিশি ও বোতল। একটা টেবিলের উপরে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত আকারের কাচ ও ধাতু দিয়ে তৈরি পাত্রাদি।

রত্না অনুমান করলে, সে বসে আছে কোনও রসায়নশালার ভিতরে।

তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লোক। কালো কাপড় দিয়ে তার মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা, কেবল দেখা যাচ্ছে তার দুটো জ্বলন্ত চক্ষু।

অজানা লোক বললে, 'এইবারে আমি যা বলব, লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপ করে তা শোনো। সাবধান, দুষ্টুমি কোরো না। 'নাইট্রোক্লোরিক অ্যাসিডের' নাম শুনেছ কি? গায়ের চামড়ার উপরে তার এক ফোঁটা পড়লেই যাতনায় তুমি ছটফট করবে। সেই এক ফোঁটা 'অ্যাসিড' একেবারে তোমার গায়ের মাংসের ভিতরে ঢুকে যাবে।'

রত্না কোনওরকম ভয়ের ভাব না দেখিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'আপনি কী বলতে চান?'

—''নাইট্রোক্লোরিক' কিংবা 'ভিট্রিয়ল'—কোন 'অ্যাসিড'টা তুমি বেশি পছন্দ করো?'

—'তোমার মতো শয়তানের হাতের স্পর্শের চেয়ে যে-কোনও অ্যাসিডকেই আমি বেশি পছন্দ করি।'

লোকটা নীরবে একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাক থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে আবার তার সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'এর ভেতরে আছে 'নাইট্রোক্লোরিক অ্যাসিড'। এর একটুখানি তোমার মুখে ঢেলে দিলে, তোমার মুখের দিকে এ জীবনে আর কেউ ফিরে তাকাবে না। এখন সোজাসুজি বলো দেখি, তোমার বাবার গুপ্তধন আছে কোথায়?'

—'সেটা তুমি নিজেই খুঁজে দেখতে পারো।'

লোকটা বললে, 'তুমি খালি বোকার মতো নয়, পাগলের মতো কথা কইছ। অনেক বৎসর আগে দৈবক্রমে এই অ্যাসিডের এক ফোঁটা আমার হাতের উপর পড়ে গিয়েছিল। এই দ্যাখো, আমার হাতে এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। অ্যাসিডের সেই একটিমাত্র ফোঁটা আমার হাতের মাংস পুড়িয়ে চলে গিয়েছিল হাড় পর্যন্ত। তেমন অসম্ভব যন্ত্রণা এ জীবনে আমি আর কখনও সহ্য করিনি। এই অ্যাসিডেরই চল্লিশ-পঞ্চাশ ফোঁটা আজ যদি তোমার মুখের উপরে ফেলে দিই, তাহলে ওই সুন্দর মুখের অবস্থা কী হবে, আন্দাজ করতে পারছ কি? আশা করি, তুমি নির্বোধ নও।'

রত্না তীক্ষ্ণস্বরে বললে, 'নির্বোধ হচ্ছ তুমি! ভেবেছ আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি কাজ হাসিল করতে পারবে? কখনও না!'

—'তাহলে গুপ্তধনের সন্ধান আমায় দেবে না?'

—'না, না, না!'

—'এই তোমার শেষ কথা?'

—'হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।'

সে বোতলের কাচের ছিপি খুলে ফেললে। তারপর বোতলটা তার মুখের খানিকটা উপরে তুলে ধরে দৃঢ়স্বরে বললে, 'এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি বলবে কি বলবে না?'

প্রাণপণে চিৎকার করে রত্না আবার বলে উঠল, 'না, না, না! কিছুতেই না!'

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সজোরে ঘন ঘন নড়ে উঠল সদর দরজার কড়া!

সে বললে, 'কেউ ডাকতে এসেছে। তোমার ভাগ্য ভালো অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যে রেহাই পেয়ে গেলে। আশা করি, এর মধ্যেই তোমার মত পরিবর্তন করবে।' লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সদর দরজা খুলেই একটু চমকে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠে সে বললে, 'রেভারেন্ড বিনয়বাবু যে! ভিতরে আসুন! কী খবর?'

—'নমস্কার মশাই!' বলতে বলতে বিনয়বাবু বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন।

লোকটার মুখে তখন আর কালো ন্যাকড়া জড়ানো ছিল না। বিনয়বাবুর সামনে স্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন ভুবনবাবু।

বিনয়বাবু বললেন, 'ভুবনবাবু, হঠাৎ আমার এই আবির্ভাবে হয়তো আপনি খুশি হবেন না। কিন্তু উপায় কী বলুন? বসন্তবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন রত্নাদেবীর জন্যে। আমার এখানে আসবার কারণ হচ্ছে তাই।'

—'কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন? রত্নাদেবীকে আমি আজ চোখেও দেখিনি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাই নাকি? আজকে বৈকালবেলা কোনও ব্যক্তি কি আপনাকে ফোনে ডেকে ঠিক এই কথাগুলি বলেনি—'নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত রত্নাদেবীর কথা ভুলেও মনে আনবেন না?' তারপরেও কি আপনি ডাকে একখানা চিঠি পাননি, যাতে লেখা ছিল—'

ভুবনবাবু অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনার প্রত্যেক কথাটাই আমি ধাপ্পা বলে মনে করি।'

—'সত্যি নাকি? তাহলে অনুমতি দিন, আমি আপনার বাড়ির ভিতরটা একবার তল্লাশ করে দেখি।'

ভুবনবাবু রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, 'চোপরাও, নকল পাদরি! আর পাঁচ সেকেন্ড যদি তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি লাথি মেরে তোমাকে বাড়ির বাইরে ফেলে দেব!' বলতে বলতে তিনি এগিয়ে এলেন একটা হিংস্র জন্তুর মতো।

বিনয়বাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আপনার ভাবটা ঠিক ভদ্রজনোচিত বলে মনে হচ্ছে না। দয়া করে আপনার বাড়ির ভিতরটা আমাকে একবার দেখতে দিন।' বলতে বলতে হঠাৎ তিনি পকেটের ভিতর থেকে বার করলেন একটি ভারী ও মস্ত রিভলভার। তার নলচেটো নড়াচড়া করতে লাগল ভুবনবাবুর বুক ও পেটের দিকে।

ভুবনবাবু বিদীর্ণ কণ্ঠে সভয়ে বলে উঠলেন, 'থামুন, থামুন, করছেন কী? এখনই যে রিভলভারটার গুলি ছুটে যাবে!'

অতিশয় মিষ্ট হাসি হেসে প্রশান্ত কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, 'তা গুলি ছুটে যেতে পারে। আমি হচ্ছি পাদরি, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে মোটেই অভ্যস্ত নই। রিভলভারের গুলি নিশ্চয়ই আমার অজান্তেই ছুটে যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই এখানে রত্নাদেবীর আবির্ভাব হলে ভালো হয় না কি?' তাঁর আনাড়ি-হাতে রিভলভারটা ভুবনবাবুর বুকের উপরে আবার অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে নড়াচড়া করতে লাগল।

ভুবনবাবু আঁতকে উঠে সরে গেলেন—রিভলভারটাও তাঁর বুকের উপরে এগিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে!

বিনয়বাবু তেমনি সহজ ভাবেই আবার বললেন, 'আসল ব্যাপারটা কী মশাই? এটা কি চোরের উপরে বাটপাড়ি করবার চেষ্টা? আপনি নির্দেশ পেয়েছিলেন রত্নাদেবীকে নিয়ে মাথা না ঘামানোর জন্যে। সে নির্দেশ আপনি পালন করেননি কেন? কী কারণে আপনি অমান্য করেছেন দলপতির হুকুম?' প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা ভুবনবাবুর বুকের কাছে ধরে তিনি ঝাঁকানি দিতে লাগলেন!

মহা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে ভুবনবাবু বললেন, 'উত্তম, উত্তম! রিভলভারটা আপনি সরিয়ে ফেলুন। রত্নাদেবীকে আমি দেখাচ্ছি।'

—'ধন্যবাদ! রিভলভারের লক্ষ্য আপনার বুকের দিকেই স্থির হয়ে থাকবে, যতক্ষণ না আমি রত্নাদেবীকে এখানে সুস্থ শরীরে দেখতে পাচ্ছি। কোথায় আছেন তিনি?'

—'আমার রসায়নশালায়।'

—'আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে।'

—'আসুন।' ভুবনবাবুর পিছনে পিছনে বিনয়বাবু অগ্রসর হলেন।

ঘরের ভিতরে প্রথমেই প্রবেশ করলেন ভুবনবাবু। তাঁকে দেখেই রত্নার বুকটা শিউরে উঠল। তারপরেই রিভলভার উঁচিয়ে বিনয়বাবুর প্রবেশ। সেই দৃশ্য দেখে রত্নার মন চাইলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে।

—'রত্নাদেবীর বাঁধন খুলে দিন।'

তৎক্ষণাৎ তাঁর কথামতো কাজ করলেন ভুবনবাবু।

বিনয়বাবু শুধোলেন, 'রত্নাদেবী, গুপ্তধন কোথায় আছে এর কাছে আপনি কি তা প্রকাশ করেছেন?'

—'না।'

—'উত্তম। তাহলে চলে আসুন আমার সঙ্গে।'

রত্না জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এ লোকটি কে?'

—'সেটা আপনার না জানলেই ভালো হয়। আর এক কথা। বসন্তবাবুর কাছে আপনি আমারও নাম করতে পারবেন না।'

—'কেন পারব না?'

—'তাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তবে তাঁকে কেবল এইটুকু বলতে পারেন যে, আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।'

দ্বাদশ
কোটি টাকা

শোহনলাল একখানা বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে নিজের মুখের ক্ষতচিহ্নটা পরীক্ষা করছিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বসন্তবাবু, মুখে আপনি দিনরাত শ্যামলবাবুর নাম করেন। কিন্তু তার হাতে হাতকড়া পরাবার কোনও চেষ্টাই করেন না কেন?'

বসন্ত তখন ভুবনবাবুর মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'এইবার আমি সেই চেষ্টাই করব।'

রত্না বলে উঠল, 'অসম্ভব! শ্যামলবাবু কখনওই ভুবনবাবুকে খুন করেননি। হতে পারে তিনি জেল খেটেছেন, কিন্তু তিনি খুনি নন!'

শোহনলাল সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'শ্যামলবাবু জেল খেটেছেন!'

বসন্ত দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি বোম্বাইয়ের জেলখানায় এক বৎসর বন্দি ছিলেন। সেকথা এখন যাক। রত্নাদেবী, আপনি অন্য ঘরে গিয়ে থানায় একটা ফোন করে দিয়ে বলুন, এখানে যেন একজন ডাক্তার ও অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

রত্না চলে গেল।

বসন্ত বললেন, 'শোহনবাবু, এখন বলুন দেখি আপনার কপালে কেমন করে ওই ক্ষতচিহ্নটা হল?'

—'আলো যেই নিবে গেল, আপনার মতো আমিও চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম। আঘাতটা পাই আমি দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতেই। ভাগ্যে আমি সামনের দিকে ঝুঁকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তাই আঘাতটা বুকে না লেগে আমার কপাল ঘেঁষে চলে যায়।'

আবার হাঁটু গেড়ে মৃতদেহের পাশে বসে পড়ে বসন্ত বললেন, 'এঁর যে মৃত্যু হয়েছে, সেবিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ছোরাখানা বিঁধে গেছে ঠিক হৃৎপিণ্ডের ভিতরে। অন্ধকার ঘরের ভিতরে এমন

নিশ্চিত ভাবে লক্ষ্য স্থির করা বাহাদুরির কথা বটে! আপনি কি এমন ভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন?'

নীরস স্বরে শোহনলাল বললে, 'জানি না। আমি যে-বিদ্যালয়ে পাঠ করেছি, সেখানে লক্ষ্যভেদের কৌশল শেখানো হত না। আপনি পারতেন?'

বসন্ত বললেন, 'না, নিশ্চয়ই পারতুম না! ঘরটা কতক্ষণ অন্ধকার ছিল? চার সেকেন্ডের বেশি হবে না বোধহয়। তার মধ্যেই খুনি দরজা দিয়ে ঢুকে কাজ হাসিল করে ওই গবাক্ষের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। সে গবাক্ষের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হল কেন? এ ঘরের দরজা আছে একটিমাত্র। নিশ্চয়ই সে বুঝে নিয়েছিল, আলো নিবলেই আমরা দরজার দিকে ছুটে যাব। আরও বোঝা যায়, বাড়ির ভিতরটা আছে তার নখদর্পণে।'

—'ওই দুরাত্মা পাদরিটা এ বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত।'

—'শোহনবাবু, বিনয়বাবু নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে ঢুকে অস্ত্রচালনা করেননি। মাত্র চার সেকেন্ডের ভিতরে কেউ আলো নিবিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে নরহত্যা করে আবার গবাক্ষ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে না।'

—'কিন্তু আমি যে সেই পাদরিটাকে স্বচক্ষে দেখেছি!'

—'ঠিক। বিনয়বাবু হয়তো কেবল আলোটাই নিবিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেননি। আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেগে দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলুম, বিনয়বাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে নিশ্চয়ই আমার হাতে ধরা পড়তেন।'

—'তাহলে কে আমাকে আঘাত করলে আর ভুবনবাবুর বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে?'

—'এ হচ্ছে কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ।'

—'দ্বিতীয় ব্যক্তি?'

—'হ্যাঁ। একজন আলো নিবিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন বিদ্যুৎবেগে গবাক্ষ দিয়ে ঘরে ঢুকে খুন করে আবার সেই পথ দিয়েই সরে পড়েছে।'

বসন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শোহনলাল।

বসন্ত নিজের পকেটের ভিতর থেকে রুমাল বার করে অতি সাবধানে ভুবনবাবুর বক্ষে বিদ্ধ ছোরাখানার হাতলের শেষপ্রান্ত রুমাল দিয়ে চেপে ধরে অস্ত্রটাকে টেনে বার করে ফেললেন। তারপর বললেন, 'ছোরার উপরে আঙুলের ছাপ নিয়ে সাধারণত আমি মাথা ঘামাই না। কারণ, অপরাধী যদি উচ্চ শ্রেণির হয়, তাহলে সে কাজ করে হাতে দস্তানা পরে, অস্ত্রের উপরে পাওয়া যায় না তার আঙুলের চিহ্ন। তবু এই ছোরাখানা আমি পুলিশের পরীক্ষাগারে পাঠাতে চাই। দেখি যদি কোনও হদিস পাওয়া যায়।'

গাত্রোত্থান করে বসন্ত ছোরাখানা সযত্নে একটা টেবিলের উপরে স্থাপন করলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, আমরা বৈঠকখানায় যাই। এইবার রত্নাদেবীকে আমার বিশেষ দরকার। কিন্তু এই রক্তাক্ত মৃতদেহের সামনে কোনও মহিলার সঙ্গে আমি ভালো করে কথা কইতে পারব না।'

দুজনে বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকে দেখলেন, রত্না চুপ করে একটা টেবিলের ধারে বসে আছে গম্ভীর ভাবে ও ম্রিয়মাণ মুখে।

তাঁদের দেখেই সে কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, 'বসন্তবাবু! শোহনবাবু! এ হচ্ছে অসহনীয়!'

বসন্ত শুধোলেন, 'কী অসহনীয় রত্নাদেবী?'

—'এই হত্যার পর হত্যা! প্রথমে চন্দ্রকান্তবাবু, তারপর আপনার গোয়েন্দা মন্মথবাবু, তারপর এখন ওই ভুবনবাবু, এর পরেও হয়তো হবে আরও হত্যাকাণ্ড! একথা মনে করেও আমার বুক শিউরে শিউরে উঠছে।'

—'কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী কে জানেন?'

—'কে?'

—'আপনি!'

রত্না বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠল, 'আমি? আপনি কী বলছেন!'

—'আমি ঠিক কথাই বলছি? যে-গুপ্তধনের লোভে এইসব হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, তা যে কোথায় লুকানো আছে আপনি সেকথা জানেন। অথচ আপনি সেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করতে চান না। এর ফল কী হবে জানেন? হয়তো আপনাকে দেখতে হবে আরও অনেক হত্যাকাণ্ড।'

বিস্ফারিত চক্ষে বসন্তের দিকে রত্না খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নির্বাক মুখে। তার মুখের উপরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা আর্তভাব। তারপর সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যথিতকণ্ঠে বললে, 'আমি যদি গুপ্তধনের সন্ধান না দিই, তাহলে আরও অনেক নরহত্যা হতে পারে!'

—'নিশ্চয়ই!'

রত্না স্তব্ধ হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট পর অত্যন্ত শ্রান্ত স্বরে সে বললে, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন বসন্তবাবু?'

—'গুপ্তধন কোথায় আছে আমাকে তা খুলে বলুন।'

—'তারপর?'

—'তারপর হত্যাকারী যতদিন না ধরা পড়ে, গুপ্তধন থাকবে পুলিশের তত্ত্বাবধানে।'

—'কিন্তু গুপ্তধন এখান থেকে স্থানান্তরিত করবার সময়ে অপরাধীরা আপনাকেও তো হত্যা করতে পারে।'

বসন্ত উচ্চ হাস্য করে বললেন, 'আমি হচ্ছি গোয়েন্দা, বিপদের বেড়াজালের মধ্যে বাস করাই হচ্ছে আমার পেশা। আজ পর্যন্ত বহু লোক আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি।'

রত্না আবার অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দৃঢ়স্বরে বললে, 'বেশ, আপনার প্রস্তাবেই আমি রাজি হলুম।'

—'রত্নাদেবী, এর চেয়ে সুসংবাদ আর হতে পারে না! গুপ্তধন কোথায় আছে?'

—'এইখানেই আপনার হাতের কাছেই।'

বসন্ত ও শোহনলাল ঘরের চারদিকে বিস্মিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন। ঘরের চারদিকেই দেওয়ালের সামনে রয়েছে সারিসারি পুস্তকে পরিপূর্ণ আলমারি। তারই মাঝে মাঝে মার্বেলের স্তম্ভের উপরে দাঁড় করানো আছে এক-একটা শিলামূর্তি। ঘরের ঠিক মাঝখানে লেখবার বড়ো টেবিলটার সামনে শ্বেতপাথরের একটি প্রমাণ মানুষের মূর্তি। একখানা সোফার উপরে উপবিষ্ট এক প্রৌঢ় পুরুষ। সেটি হচ্ছে রত্নার পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দদাসের মূর্তি।

রত্না মৃদু হেসে বললে, 'বসন্তবাবু, আমার বাবা গুপ্তধন এখনও তাঁর কাছছাড়া করেননি!'

—'তার মানে?'

—'তার মানে, বাবার ওই মূর্তির ভিতরেই আছে তাঁর গুপ্তধন। দশ হাজারখানা হাজার টাকার নোট!'*

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বসন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন গোবিন্দদাসের প্রতিমূর্তির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গেল শোহনলাল। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও বসন্ত বুঝতে পারলেন না, তার মধ্যে গুপ্তধন কী উপায়ে লুকিয়ে রাখা চলতে পারে। নিজের রিভলভারের হাতল দিয়ে মূর্তির উপরে আঘাত করতে করতে বসন্ত বললেন, 'রত্নাদেবী, আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন? এ তো দেখছি নিরেট পাথরের মূর্তি! এর ভিতরটা তো ফাঁপা বলে মনে হচ্ছে না।'

রত্না বললে, 'মূর্তিটাকে আপনারা টেনে সরিয়ে আনতে পারেন?'

তাঁরা দুজনে মিলে অনেক টানাটানি করেও সেই বিষম ভারী মূর্তিটাকে একচুলও সরাতে পারলেন না।

রত্না আবার হাসতে হাসতে বললে, 'আপনাদের আর চেষ্টা করবার দরকার নেই। একশোজন লোক একসঙ্গে চেষ্টা করলেও ও-মূর্তিটিকে ওখান থেকে একটুও সরাতে পারবেন না। মূর্তিটিকে স্থানচ্যুত করতে পারি কেবল আমিই। একলাই!'

রত্না আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর মূর্তির ঠিক বিপরীত দিকের দেওয়ালের গায়ে যে আলমারিটা ছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে আলমারির তলার দিকে হাত দিয়ে বোধহয় একটা চাবি বা কোনওরকম কল টিপে দিলে।

তারপরই বসন্ত এবং শোহনের সচকিত দৃষ্টির সামনেই সেই সোফাসুদ্ধ সমগ্র মূর্তিটা দেওয়ালের গা থেকে ধীরে ধীরে সরে এল প্রায় দেড় হাত।

রত্না বললে, 'এইবারে মূর্তির পিছনে গিয়ে সোফার তলার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

কথামতো কাজ করে বসন্ত চমৎকৃত হয়ে দেখলেন, সোফার গায়ে রয়েছে ছোটো একটা লোহার দরজা। একটি ছোটো চাবি বার করে বসন্তের হাতে দিয়ে রত্না বললে, 'দরজা খুলে ভিতরে হাত বাড়ালেই গুপ্তধন পাবেন।'

সোফার ভিতরে হাত চালিয়ে বসন্ত টেনে বার করলেন একটা বড়ো ক্যাশবাক্স। তার ভিতরেই পাশে পাশে থাকে থাকে সাজানো ছিল দশ হাজারখানা হাজার টাকার নোট—অর্থাৎ পূর্ণ এক কোটি টাকা!

শোহনলাল বিস্ফারিত নেত্রে অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'চোখের সামনে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি এক কোটি—অর্থাৎ একশো লক্ষ টাকা! এমন দৃশ্য দেখলুম জীবনে এই প্রথম। এক লক্ষ টাকার জন্যে অনেকেই অনেক মানুষকে খুন করতে পারে। আর একশো লক্ষ টাকার জন্যে মানুষ করতে পারে না বোধহয় এমন কোনও কাজই নেই।'

মুখে একটা গভীর পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে ক্যাশবাক্সটা বুকের উপর জড়িয়ে ধরে বসন্ত অগ্রসর হলেন দরজার দিকে।

শোহনলাল বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

—'থানায়। বাক্সটাকে মালখানায় জমা দিয়ে আসব।'

* তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট চলতি ছিল।

—'এই রাত্রে সেটা নিরাপদ হবে কি?'

—'এর উপরে যদি কেউ লোভ করে, তাহলে তাকে কালকের সূর্যোদয় দেখতে হবে না।'

—'আমিও আপনার সঙ্গে যাব?'

—'নিশ্চয়ই নয়। আপনাকে এখন থাকতে হবে রত্নাদেবীর কাছে।'

বসন্ত বাইরে বেরিয়ে আসতেই সুবোধ এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

বসন্ত বললেন, 'তুমি রত্নাদেবী আর শোহনবাবু, দুজনেরই উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখো। আজ যেন আর কোনও দুর্ঘটনা না হয়। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।'

একহাতে ক্যাশবাক্স এবং আর একহাতে রিভলভার নিয়ে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করতে করতে এগিয়ে চললেন বসন্ত। পথেই পড়ল বিনয়বাবুর বাড়ি। তার একতলার একটা ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। পাশ দিয়ে যেতে যেতে শোনা গেল দুইজন লোকের কণ্ঠস্বর।

শ্যামল ও বিনয়বাবুর পরিচিত কণ্ঠস্বর। বসন্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলেন, বিনয়বাবু টেবিলের সামনে চেয়ারের উপরে বসে আছেন এবং শ্যামল একটা সিগারেট টানতে টানতে ধীরে ধীরে পদচালনা করছে।

শ্যামল বলছিল, 'এইমাত্র কী দেখে এলুম জানেন? পুলিশের ধূর্ত শেয়ালটা গুপ্তধন হস্তগত করেছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কে, বসন্তবাবু?'

—'হ্যাঁ। গুপ্তধন আর নিশ্চয়ই তপোবনের ভিতরে থাকবে না। এই রাত্রেই বসন্ত তা থানায় জমা দিয়ে আসবে। সেই সময় তাকে আক্রমণ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার হাতে আছে রিভলভার আর অব্যর্থ তার লক্ষ্য।'

—'শোহনলাল এখন কোথায়?'

—'তপোবনে, রত্নাদেবীর কাছে। যাক সে কথা। ভুবনবাবু যে মারা পড়েছেন এ বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই তো?'

—'না। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই সে মারা পড়েছে। বোধ হয় তার প্রেতাত্মা বিস্মিত হয়ে এখন সেই কথাই ভাবছে।'

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ প্রান্তটা বাইরের দিকে নিক্ষেপ করে শ্যামল বললে, 'পাদরিসাহেব, ভুবনের মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী এটা আমি ভালো করেই জানতুম। সে বিঘ্ন ঘটাতে চেয়েছিল, কাজেই তাকে নিতে হল শেষ বিদায়।'

বিনয়বাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'এই ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে আরও অনেকেই।'

—'আপনি পুলিশের কথা বলছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'পুলিশের লোকগুলো হচ্ছে একেবারে অকেজো জীব। বসন্ত পথের কুকুরের মতো কেবল চিৎকারই করে, কিন্তু কামড়াতে পারে না। তবে শোহনলালকে নিয়ে আমি কিঞ্চিৎ দুর্ভাবনায় পড়েছি বটে। সে মোটেই চ্যাঁচায় না, বোধহয় কামড়াতে জানে। এইবার তাকে নিয়ে আমাদের কিছু মাথা ঘামাতে হবে।'

—'শ্যামলবাবু, অপেক্ষা করুন। সবুরে মেওয়া ফলে।'

শ্যামল বললে, 'হ্যাঁ। শোহনলালের ব্যবস্থা আজই আমি করতে পারি, কিন্তু আপাতত তা করব না। আরও দু-চার দিন অপেক্ষা করে দেখি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'সেই কথাই ভালো। রাত বাড়ছে। আজকের মতো আসর ভঙ্গ করা যাক।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বসন্ত আবার থানার দিকে এগিয়ে চললেন দ্রুতপদে এবং চলতে চলতে বারংবার তিনি শ্যামলের কথা ভাবতে লাগলেন—'বসন্ত পারে খালি চ্যাঁচাতে, আর শোহন পারে একেবারেই কামড়াতে।' নিজের মনেই মুখ টিপে তিনি একটুখানি হাসলেন। তারপর বললেন, 'দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কেই বা চ্যাঁচায় আর কেই বা কামড়ায়!'

ত্রয়োদশ

আর্তনাদ

পরদিনের সকালের চায়ের আসর। টেবিলের একদিকে রত্না, আর একদিকে বসন্ত ও শোহন।

বসন্ত শুধোলেন, 'রত্নাদেবী, যে রাত্রে চন্দ্রকান্ত মারা পড়ে, আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?'

রত্না একটু চমকে উঠে বললে, 'আপনি কি আমাকে দেখেছিলেন?'

—'আপনাকে দেখিনি, কিন্তু আপনার জুতোর দাগ দেখেছি। এতদিন আমি একথা আপনার কাছে তুলিনি বটে, কিন্তু এইবারে ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। আমি যা অনুমান করেছি, সেটাও আপনি শুনে রাখুন। সেই রাত্রে, কী কারণে জানি না, তপোবন ছেড়ে আপনি আমবাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। তারপর প্রবেশ করেছিলেন ভাঙা কুঁড়েঘরের ভিতরে। সেখানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আপনার দেখা হয়। সেখানে আরও কেউ একজন গিয়েছিল, তাকে আমি জানি না, কিন্তু সে জুতোর তলায় বেঁধে রেখেছিল দুখানা কাঠের পাত। সে-ও হয়তো কুটিরের ভিতরে ঢুকেছিল, নয়তো গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজা বা জানলার সামনে। কিন্তু সেইরাত্রেই চন্দ্রকান্ত নিহত হয়। আপনি কুটির ছেড়ে দৌড়ে আমবাগানের বাইরে চলে আসেন। সেইখান থেকেই আপনার পায়ের দাগ অদৃশ্য হয় আর দেখা যায় সাদা সওয়ারের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন। আপনি, চন্দ্রকান্ত মারা পড়বার আগে কিংবা পরে কুটির ছেড়ে চলে আসেন, কিন্তু দুইবার শোনা যায় আপনার চিৎকার। আপনার দ্বিতীয় চিৎকারের পরেই দুই-দুইবার রিভলভার ছোড়ার আওয়াজ হয়। খুব সম্ভব চন্দ্রকান্তকে দেখেই আপনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। এই পর্যন্ত আমি অনুমান করতে পেরেছি। এর মধ্যে যদি কোথাও গলদ থাকে, সেইটে আপনি দয়া করে দেখিয়ে দিন।'

রত্না মাথা নত করে নীরবে বসে রইল। তারপর কিছু ইতস্তত করে ধীরে ধীরে বললে, 'বেশ, তাহলে সব কথাই খুলে বলছি। সেই রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর জানলার উপরে ঢিলের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি প্রথমে ভাবলুম, আপনার নিযুক্ত গোয়েন্দা বোধহয় কোনও কথা আমাকে বলতে চায়। জানলার কাছে গিয়ে দেখি, নীচে অন্ধকারে আবছা আবছা একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। সে চাপা গলায় বললে, 'আমি শ্যামল। এখনই আপনি বিষম বিপদে পড়তে পারেন।

তাড়াতাড়ি নীচেয় নেমে আমবাগানের ভিতরে চলুন। আমবাগানের সেই কুঁড়েঘরে। কোনও ভয় নেই, সব কথাই শুনতে পাবেন।' এই বলেই মূর্তিটা দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে গেল।

আমি সেই কথামতোই কাজ করলুম। কিন্তু কুঁড়েঘরের ভিতরে গিয়ে লণ্ঠনের আলোতে দেখলুম, সেখানে শ্যামলবাবুর বদলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চন্দ্রকান্তবাবু। আমাকে দেখেই তিনি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। সেই সময়েই আমি প্রথমবার চিৎকার করে উঠি। কিন্তু পরমুহূর্তেই চন্দ্রকান্তবাবু আমার মুখের উপরে হাত চেপে ধরে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কোথায় আছে গুপ্তধন? এখনই আমার কাছে বলো! নইলে টুকরো টুকরো করে তোমাকে কেটে ফেলব।' আমি কোনও ক্রমে তাঁর হাত ছাড়িয়ে সরে আসি এবং তারপরেই দ্বিতীয়বার চিৎকার করি। তারপরেই উপরি উপরি দুইবার রিভলভারের শব্দ হয়। চন্দ্রবাবু ঘুরে মাটির উপরে পড়ে যান। আমিও ভয়ে আত্মহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে আমবাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পথের উপর দাঁড়াই। ঠিক সেইখানেই ঘোড়ার উপর বসেছিল সাদা সওয়ার। আমি চোখের পলক ফেলবার আগেই সাদা সওয়ার একটানে আমাকে মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার উপরে নিজের পিছন দিকে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'কোনও ভয় নেই। আবার যেন চিৎকার করবেন না। পিছন দিক থেকে আমার দেহ জড়িয়ে থাকুন। আমি এখনই আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।' আমাকে বাধ্য হয়েই তার কথায় বিশ্বাস করতে হল। কিন্তু সাদা সওয়ার তার বাক্য রক্ষা করেছিল। সে তপোবনের সামনে এসে আমাকে ঘোড়ার উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আমি বাড়ির উপরে উঠে জামাকাপড় বদলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম, আর ঠিক সেই সময়েই জানলার বাইরে হল আপনার আবির্ভাব। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

বসন্ত বললেন, 'আমারও আর কিছু জানবার নেই। আপনি যে সত্যকথাই বলছেন, তাও আমি বুঝতে পারছি।'

রত্না নিজের চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বসন্তবাবু, আপনার তো চারটে এগপোচ, আটখানা টোস্ট আর চার পেয়ালা চা না হলে চলে না।'

বসন্ত লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, 'রত্নাদেবী, আমার বপুর বিপুলতা তো দেখতেই পাচ্ছেন? আহারের আয়োজনও প্রচুর না হলে কী করে আমার পোষায় বলুন দেখি?'

রত্না বললে, 'বেশ, আমি আরও কিছু 'অধিকন্তু' আনতে বলে আপাতত উপরে যাচ্ছি। আমাকে এখনই জামাকাপড় বদলে একবার বাড়ির বাইরে যেতে হবে!'

—'বাড়ির বাইরে! কোথায়?'

—'বিনয়বাবুর ওখানে। গির্জা সংক্রান্ত কী জরুরি ব্যাপারে আমাকে তিনি একবার ডেকেছেন।'

—'কিন্তু বাড়ির বাইরে না গেলেই কি ভালো হয় না রত্নাদেবী?'

রত্না কৌতুকভরে হেসে উঠে বললে, 'এই সকালবেলা, এখন আবার ভয় কীসের?'

বসন্ত সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'কিন্তু, বিনয়বাবু—'

রত্না বললে, 'সবাইকেই আপনার সন্দেহ? কিন্তু বিনয়বাবুকে আমি সন্দেহ করি না। আমি জানি, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।' এই বলে সে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোহনলাল ধরালে একটা সিগার এবং বসন্ত করতে লাগলেন টোস্ট ও পোচ-এর সদ্ব্যবহার।

হঠাৎ দরজার উপরে দেখা দিলে পিয়নের মূর্তি। সে বললে, 'বাবুজি, টেলিগ্রাম।'

বসন্ত একটা গোটা এগপোচ বদনগহ্বরে নিক্ষেপ করে টেলিগ্রামের লেফাফা ছিঁড়ে জড়িত স্বরে বললেন, 'পুলিশ কমিশনারের টেলিগ্রাম।'

শোহনলাল বললে, 'ব্যাপারটা কী?'

বসন্ত বললেন, 'যে ছোরার আঘাতে ভুবনবাবু মারা পড়েছেন, তার হাতলের উপরে কোনও আঙুলের দাগ আছে কি না, তা পরীক্ষা করবার জন্যে ছোরাখানা আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, একথা মনে আছে তো?'

শোহনলাল বললে, 'হ্যাঁ। পরীক্ষায় কিছু সাব্যস্ত হয়েছে কি?'

বসন্ত টেলিগ্রামখানার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওঃ, এ যে অভাবিত কাণ্ড!'

শোহনলাল অত্যন্ত কৌতূহলী কণ্ঠে বলে উঠল, 'তার মানে?'

বসন্ত ইংরেজিতে লেখা সেই টেলিগ্রামখানা উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে যা শোনালেন, বাংলায় তার অর্থ দাঁড়ায় এই

'ছোরার হাতলের উপরে আঙুলের ছাপ শনাক্ত হয়েছে। ভুবনচন্দ্র বিশ্বাস দাগী অপরাধী। জালিয়াতির জন্যে সে তিন বৎসর জেল খেটেছিল। সে আর কখনও জেল খাটেনি। ছোরার হাতলে আছে তারই আঙুলের দাগ।

—সুধাকান্ত'

ঠিক সেই সময়েই রত্নার কণ্ঠে দূর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল—'বসন্তবাবু, বসন্তবাবু, বসন্তবাবু!'

বসন্ত একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এ যে রত্নাদেবীর চিৎকার! আসুন, আসুন! শিগগির বাইরে আসুন।'

তাঁরা দ্রুতপদে বাইরে গিয়েই শুনতে পেলেন, বেগে ধাবমান একখানা মোটরগাড়ির শব্দ।

চতুর্দশ
ডেমলারের পরিণাম

রাস্তার উপরে এসে পড়ে বসন্ত বললেন, 'গাড়ির শব্দটা এল বিনয়বাবুর বাড়ির দিক থেকেই। শ্যামলবাবুর মোটরের 'গেরাজ' ওইখানেই। দৌড়ে আসুন, দেখা যাক শ্যামলের 'ডেমলার' খানা ওখানে আছে কি না!'

বেগে ছুটতে ছুটতে তাঁরা বিনয়বাবুর বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। কিন্তু ডাকাডাকি করেও পাওয়া গেল না বিনয়বাবুর কোনও সাড়াশব্দ। 'গেরাজে'র সামনে গিয়ে বসন্ত দেখলেন, তার দরজা খোলা এবং ভিতরে শ্যামলের গাড়ির কোনও চিহ্নই নেই।

শোহনলালের হাত ধরে টেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বসন্ত বললেন, 'আর একটুও দেরি করা নয়। শ্যামল নিশ্চয়ই রত্নাদেবীকে নিয়ে সরে পড়েছে। চট করে আপনার গাড়িখানা বার করে ফেলুন। মোটর চলতে পারে এখানে কেবল এই একটিমাত্র রাস্তাই আছে। আমরাও শ্যামলের পিছনে পিছনে যাব।'

শোহন তার গাড়ি বার করতে দেরি করলে না। টপ করে চালকের আসনে বসে পড়ে সে বললে, 'কিন্তু শ্যামলের 'ডেমলার' কোনদিকে গিয়েছে আমরা তা জানি না তো!'

বসন্ত গাড়ির ভিতরে ঢুকে বসে পড়ে বললেন, 'খুব সম্ভব কলকাতার দিকে। চালান গাড়ি।'

গাড়ি বেগে ছুটল।

বসন্ত বললেন, 'শ্যামলের গাড়ি প্রায় দশ-বারো মিনিট আগে বেরিয়ে গিয়েছে। তার নাগাল ধরতে হলে আমাদের আরও তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে হবে।'

শোহন গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলে।

বসন্ত অধীর স্বরে বললেন, 'আরও তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি!'

গাড়ি ছুটল আরও তাড়াতাড়ি। ঘণ্টায় বিশ, পঁচিশ, তিরিশ,—ক্রমে চল্লিশ মাইল বেগে মোটর হল ধাবমান।

বসন্ত বললেন, 'আরও তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি!'

—'দুর্ঘটনা হবে যে!'

—'হোক! যেমন করে পারি শ্যামলকে আজ ধরবই!'

গাড়ির বেগ ক্রমে উঠল ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইলে।

তখনও শ্যামলের গাড়ির কোনওই পাত্তা না পেয়ে বসন্ত বললেন, 'বেগ আরও কিছু বাড়িয়ে দিন।'

ঘণ্টায় ষাট মাইল! পথের দু-পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি ও লোকজন বিদ্যুৎবেগে কাছে এসে পড়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পিছন দিকে। পথ দিয়ে আরও যেসব গাড়ি যাতায়াত করছিল সেগুলো কোনওক্রমে এপাশে ওপাশে সরে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবল থেকে আত্মরক্ষা করলে।

সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে শোহন বললে, 'ভুবনবাবুর ছোরার উপরে আছে কেবল তাঁরই আঙুলের দাগ!'

—'হ্যাঁ। তাই থাকবে বলেই আমারও সন্দেহ হয়েছিল।'

—'মানে? আপনি কি বলতে চান, ভুবনবাবু আত্মহত্যা করেছেন?'

—'হ্যাঁ, দায়ে পড়ে।'

শোহন আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সময় পেলে না, কারণ প্রকাণ্ড একখানা লরি মোড় ফিরে প্রায় তাদের উপরে এসে পড়ল, সে কোনও রকমে সামলে নিয়ে পাশ কাটিয়ে আবার হল অগ্রগামী।

তাদের গাড়ি ছুটছে, ছুটছে, ছুটছেই! তবু শ্যামলের গাড়ি হল না দৃশ্যমান। বসন্ত ভাবতে লাগলেন, তাঁদের ফাঁকি দেবার জন্যে শ্যামলও কি তার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে অতিরিক্ত বেগে?

হঠাৎ শোহন চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী ব্যাপার!' এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের গাড়ির গতি রুদ্ধ করে ফেললে।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে একখানা লালরঙের 'ডেমলার' গাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সেখানে জড়ো হয়েছে কৌতূহলী জনতা। একজন কনস্টেবলকেও দেখা গেল।

বসন্ত গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ে বললেন, 'কতক্ষণ আগে এই ঘটনাটা ঘটেছে?'

কনস্টেবল বললে, 'মিনিট দশ-বারো হবে।'

—'গাড়ির লোকজনরা কোথায় গেল?'

—'গাড়ির ভিতরে লোকজন কেউ ছিল না।'

—'কী পাগলের মতো কথা বলছ! তবে গাড়ি চালাচ্ছিল কে?'

—'কেউ গাড়ি চালাচ্ছিল না। গাড়িখানা আপনি তিরের মতন ছুটে এসে ওই গাছটার গায়ে ধাক্কা মেরে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। স্বচক্ষে সব দেখেছি।'

বসন্ত হতভম্বের মতো শোহনের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করলেন।

শোহন একটু ভেবেই বলে উঠল, 'ওহো, বুঝতে পেরেছি!'

—'বুঝতে পেরেছেন? কী বুঝতে পেরেছেন?'

—'শ্যামল নিজেই নেমে পড়ে তার গাড়িখানাকে চালিয়ে দিয়েছে ধ্বংসের মুখে।'

—'এমন একখানা দামি গাড়িকে কেউ কখনও ওভাবে নষ্ট করতে পারে?'

—'তার পক্ষে তা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। পাছে আমাদের হাতে ধরা পড়ে, সেই ভয়ে সে রত্নাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে অন্য কোথাও সরে পড়েছে।'

বসন্ত চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ অনুমান সত্য বলে মনে হচ্ছে। শ্যামল যদি কোনও অলিগলির ভিতরে ঢুকে পড়ে থাকে, তাহলে আজ তার খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। আমরা কলকাতার কাছেই এসে পড়েছি। শ্যামলও নিশ্চয় কলকাতায় গিয়ে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে। অতএব আমাদেরও এখন হাজির থাকতে হবে কলকাতাতেই। চলুন।'

রাধাপুর থেকে বেরিয়ে গাড়ির গদিতে আরাম করে ঠেসান দিয়ে বসে শ্যামল ডেমলারখানা চালাচ্ছিল ধীরে সুস্থে। জরুরি কাজে আজকে একবার কলকাতায় যেতে হবে।

খুব ভালো লাগছিল তার আজকের প্রভাতকালকে। রোদ এখনও তপ্ত হয়ে ওঠেনি। বাতাসেও পাওয়া যাচ্ছে স্নিগ্ধতার স্পর্শ। নির্মেঘ আকাশে অনাহত নীলিমা। গাছে গাছে পাখিদের গানের সুর শুনে, তারও গান গাইতে সাধ হল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সে ভাবতে লাগল রাধাপুরে রত্নাকে একলা ফেলে কলকাতায় তার বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। রাধাপুর হচ্ছে বিপজ্জনক স্থান। রত্না বিপদে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তেই। যদিও তার চারিদিকেই আছে পুলিশের পাহারা, কিন্তু পুলিশের সতর্কতার উপরে তার একটুও বিশ্বাস নেই। এই তো বসন্তবাবুর প্রায় চোখের উপর থেকেই রত্নাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ভুবন। বিনয়বাবু এখানে না থাকলে রত্নার ভাগ্যে যে কী হত, তা কিছুই বলা যায় না। হ্যাঁ, তাকে আজ রাত্রেই কলকাতা থেকে আবার ফিরে আসতে হবে।

আচম্বিতে তাকে পিছনে ফেলে তীব্রবেগে এগিয়ে গেল একখানা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি। তার জানলাগুলো পর্দা দিয়ে ঢাকা বটে, কিন্তু হঠাৎ পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল যে মুখ, তা দেখেই, শ্যামল অত্যন্ত চমকে উঠে সিধে হয়ে বসল। সে হচ্ছে রত্নার ভয়ার্ত এবং পাণ্ডুর মুখ!

তৎক্ষণাৎ সে নিজের গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলে, কিন্তু আগেকার গাড়িখানা এমন অসম্ভব বেগে ছুটে যাচ্ছিল যে, সে তার নাগাল ধরতে পারলে না। তারও গাড়ির বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠল এবং বাড়তে বাড়তে অবশেষে দাঁড়াল গিয়ে ঘণ্টায় যাট মাইলে! মিনিটে মিনিটে মাইলের পর মাইল পার হয়ে দুখানা গাড়ি হু হু করে ছুটে চলল উল্কা বেগে।

দাঁতে দাঁতে চেপে শ্যামল আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'হে ভগবান! হয় রত্না, নয় মৃত্যু।'

পৃথিবীর আর সমস্ত দৃশ্যই লুপ্ত হয়ে গেল তার সুমুখ থেকে—তার বন্য দৃষ্টির সামনে এখন জেগে আছে খালি ওই অগ্রগামী গাড়িখানা। ধরতেই হবে, ওর নাগাল ধরতেই হবে। প্রাণপণে সে তার গাড়ির গতি করে তুললে দ্রুততর। নিজের গাড়ির ডান দিকের দরজাটা খুলে ফেললে একটানে। ধীরে ধীরে সে অন্য গাড়িখানার বাম পাশ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। তারপর দেখতে দেখতে দুখানা গাড়িই ছুটতে লাগল ঠিক পাশাপাশি হয়ে সমান বেগে।

তারপর শ্যামল যে কাণ্ড করলে, উন্মত্ত ছাড়া তা আর কেউ করতে পারে না। কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই হঠাৎ সে নিজের 'হুইল' ছেড়ে দিয়ে একলাফে পাশের গাড়ির পাদানির উপরে লাফিয়ে পড়ে সজোরে চেপে ধরলে তার জানলাটাকে। তারপর চোখের নিমেষে দরজার হাতল ঘুরিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে হুড়মুড় করে পাশের গাড়ির ভিতরে গিয়ে পড়ল।

আড়ষ্ট হয়ে রত্না বসে আছে গাড়ির এক কোণে এবং অন্য কোণে দেখা গেল আর একটা মূর্তিকে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'এসেছি—আমি এসেছি রত্না।' তারপরেই সে তার চেতনা হারিয়ে ফেললে।

পঞ্চদশ

জীবন দেখতে গিয়ে মৃত্যু

পুলিশ কমিশনারের ঘরের ভিতরে বসে আছেন তিনজন লোক—স্বয়ং সুধাকান্ত চৌধুরি, বসন্ত এবং শোহনলাল। তাঁদের মুখের ভাব প্রশান্ত বটে, কিন্তু তাঁদের মনের ভিতর দিয়ে কোন ভাবের ঝড় বইছিল, বাইরে থেকে দেখে কেউ তা বলতে পারবে না।

খানিকক্ষণ পরে বসন্ত ধৈর্য হারিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ কেটে গেল, তবু এখনও কোনও খবর নেই।'

সুধাকান্ত বললেন, 'কলকাতার দিকে দিকে লোক পাঠানো হয়েছে, কিছু না কিছু খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

—'আমি বিশ্বাস করি না। শ্যামলকে আপনি চেনেন না, তাই এই কথা বলছেন।'

কৌতুক হাসি হেসে সুধাকান্ত বললেন, 'শ্যামলকে আমি চিনি না, নয়? তুমি তাকে যখন এত বেশি চিনে ফেলেছ, তখন সময় থাকতেই তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?'

—'তাকে গ্রেপ্তার করতে নিষেধ করেছেন তো আপনিই।'

সুধাকান্তের দুই চক্ষু যেন কোনও গোপন কারণেই আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওয়ারেন্টখানা কোথায় আছে?'

—'আমার পকেটেই।'

—'তাহলে এইবারে তাকে গ্রেপ্তার কোরো।'

—'কী আশ্চর্য! শ্যামলের কোনও পাত্তাই নেই, তাকে গ্রেপ্তার করব কেমন করে?'

এমন সময় একজন লোক 'ট্রে'-র উপরে চায়ের কেটলি, পেয়ালা ও কতকগুলো স্যান্ডউইচ নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

সুধাকান্ত বললেন, 'বসন্ত, তোমরা আজ অত্যন্ত বিচলিত হয়েছ বলে তোমাদের জন্যে এই ব্যবস্থা করে রেখেছি। নাও এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে দেরি কোরো না।' বলে তিনি নিজের হাতেই কেটলি থেকে তিনটে পেয়ালায় চা ঢেলে দিলেন।

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!

হয়তো যে-সংবাদের প্রত্যাশা করা যাচ্ছে, টেলিফোনে এসেছে তারই বার্তা!

চা ও স্যান্ডউইচের কথা ভুলে বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে 'রিসিভার'টা তুলে নিলেন সাগ্রহে। বললেন, 'হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই কথা কইছি।'

টেলিফোনের বার্তা শুনতে শুনতে তাঁর মুখের ভাব ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠল অধিকতর। সুধাকান্ত ও শোহনলাল চুপ করে বসে বসে বসন্তের মৌখিক ভাবের পরিবর্তন লক্ষ করতে লাগলেন। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতরে কেবল ঘড়িটা করতে লাগল টিক টিক টিক। সেই একান্ত স্তব্ধতার ভিতরে টেলিফোনের তার অপর প্রান্ত থেকে যে-বার্তা বহন করে আনছিল, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তার ক্ষীণ গুঞ্জন।

তারপর বসন্ত 'রিসিভার'টা নিয়ে টেলিফোন যন্ত্রের উপর রেখে কয়েকবার ওঠালেন ও নামালেন। এবং আবার শুধোলেন, 'এইমাত্র ফোনে কে আমাকে ডেকেছে। ডাকটা কোথা থেকে এসেছে বলতে পারেন?...আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

'রিসিভার'টা যথাস্থানে স্থাপন করে বসন্ত ফিরে এসে বললেন, 'কোনও অজানা বন্ধু আমাদের স্মরণ করেছেন। 'বড়োবাজার এক্সচেঞ্জে'র 'পাবলিক টেলিফোন' ব্যবহার করে তিনি আমাকে অতি ভদ্র ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, আজ থেকে ঠিক তিন দিনের ভিতরে গড়ের মাঠের মনুমেন্টের ধাপের উপরে গোবিন্দদাসের কোটি টাকার নোট যদি রেখে না আসা হয়, তাহলে রত্নাদেবীর দুই চক্ষু অন্ধ করে দেওয়া হবে।'

সুধাকান্ত বলে ে 'সর্বনাশ! এখন উপায়?'

বসন্ত বললেন, 'শোহনবাবু, আমি বিনয়বাবুকে চাই!'

শোহন শুধোলেন, 'কেন?'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইসব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছেন বিনয়বাবু। শ্যামলের সঙ্গে তিনি যেসব কথা বলছিলেন, আমি স্বকর্ণে তা শুনেছি। সমস্ত রহস্যই তিনি জানেন। তাঁকে আমি গ্রেপ্তার করব বলে ভেবেছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি রাধাপুর থেকে চলে আসতে হয়েছে বলে তা পারিনি। শোহনবাবু, আপনি এখনই রাধাপুরে চলে যান। আপনার সঙ্গে একজন ইনস্পেকটারও রাধাপুরে যাবে, বিনয়বাবুকে গ্রেপ্তার করে আপনি কলকাতায় নিয়ে আসুন! রাধাপুর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আপনি অনায়াসেই আজ সন্ধ্যার মধ্যেই বিনয়বাবুকে এখানে এনে হাজির করতে পারবেন।' তারপর তিনি সুধাকান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কী বলেন, স্যার?'

সুধাকান্ত সহাস্যে বললেন, 'মামলার ভার দিয়েছি তোমার হাতে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। এখন বসে পড়ো। স্যান্ডউইচ অপেক্ষা করছে, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সময় থাকতে এগুলোর একটা ব্যবস্থা করে ফ্যালো।'

খাবার খেয়ে ও চা পান করে শোহনলাল তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুধাকান্ত বললেন, 'শোহনলালের সামনে আমি কিছু বললুম না বটে, কিন্তু রাধাপুরে শোহনলালকে না পাঠিয়ে অন্য কোনও লোককে পাঠালে হত না?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'শোহনলাল তো কলকাতা পুলিশের লোক নয়। তুমি ওর পরামর্শ নিতে পারো, কিন্তু কোনও বড়ো কাজের ভার ওর হাতে না দিলেই ভালো হয়।'

—'কিন্তু শোহনলাল আমার সঙ্গে রাধাপুরে গিয়েছিল। বিনয়বাবুকে সে চেনে আর ওখানকার সব কিছুই তার নখদর্পণে। আমাকে এখন কলকাতাতেই থাকতে হবে। তাই ওকে রাধাপুরে পাঠালুম।'

কলকাতার উপরে নেমেছে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার।

একজন ইনস্পেকটারের সঙ্গে বিনয়বাবু প্রবেশ করলেন বসন্তের ঘরে।

ইনস্পেকটার বললে, 'শোহনলালবাবু আজ রাত্রে রাধাপুরেই থাকবেন। নিজের মালপত্র আজ তাড়াতাড়িতে তিনি নিয়ে আসতে পারেননি। সেগুলো নিয়ে তিনি কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

বসন্ত বললেন, 'আচ্ছা।'

ইনস্পেকটার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বসন্ত ফিরে বললেন, 'এই যে বিনয়বাবু। আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি। বসুন।'

বিনয়বাবু অভিযোগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে এভাবে কলকাতায় নিয়ে আসা হল কেন?'

—'শ্যামলের সঙ্গে আপনার গলায় গলায় বন্ধুত্ব। তার কোনও কথাই আপনার কাছে গোপন নেই। আপনার মুখেই আমি তার সব কথা শুনতে চাই।'

—'কারুর ব্যক্তিগত গুপ্তকথা ব্যক্ত করবার অধিকার আমার নেই। আপনি অন্যায় অনুরোধ করছেন বসন্তবাবু।'

বসন্ত গলার স্বর কর্কশ করে তুললেন, 'আপনি জীবন দেখতে চান, না বিনয়বাবু? জীবনের আর-একটা দিক আমি আজকেই আপনাকে দেখাতে পারি। রত্নাদেবীকে আবার কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তারা কে, একথা আপনি জানেন। আমার কাছে সব প্রকাশ না করলে আমি নিশ্চয়ই আজ আপনাকে গ্রেপ্তার করব।'

বিনয়বাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'রত্নাদেবীকে আবার ধরে নিয়ে গিয়েছে! এ খবর তো আমি এখনও পাইনি!'

—'কেবল তাই নয়। চোরেরা শাসিয়েছে যে, গোবিন্দদাসের কোটি টাকা যদি তাদের হাতে তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে রত্নাদেবীকে তারা অন্ধ করে দেবে।'

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, 'আপনি সত্য বলছেন?'

—'হ্যাঁ। এখন বলুন দেখি, শ্যামল কোথায় আছে?'

—'আমি জানি না। আজ ভোরবেলায় গাড়ি নিয়ে শ্যামলবাবু কলকাতায় চলে এসেছেন। কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমাকে বলে যাননি।'

—'কলকাতায় তার বাড়ি আছে?'

—'বলতে পারি না।'

—'রত্নাদেবী কোথায়?'

—'তাও আমি জানি না।'

—'শ্যামল সম্বন্ধে আর সব কথাই আপনি তো জানেন?'

—'নিশ্চয়ই নয়। কোনও কোনও কথা তিনি আমার কাছে বলেছেন বটে, কিন্তু অনেক কথাই প্রকাশ করেননি। তবে আমাকে শ্যামলবাবুর অনুগত বলতে পারেন বটে। আর রত্নাদেবীকে আবার যে চুরি করবার চেষ্টা হবে, এটাও আমি আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম।'

বসন্ত সবিস্ময়ে বললেন, 'আন্দাজ করতে পেরেছিলেন? কেমন করে?'

—'সেটা বলতে আমার আপত্তি নেই। কাল রাত্রে—'

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে বসন্ত বললেন, 'হ্যালো, হ্যাঁ। কাকে চাই? হ্যাঁ, তিনি এখানেই আছেন।' মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, ফোন এসেছে আপনার নামে।'

বিনয়বাবু বিস্মিত ভাবে 'রিসিভার'টা গ্রহণ করে বললেন, 'শ্যামলবাবু ফোন করছেন! জরুরি দরকার, আমাকে এখনই যেতে হবে। কিন্তু আমি একটু পরেই আবার এখানে ফিরে আসব।'

বসন্ত চেঁচিয়ে বললেন, 'শুনুন! থামুন!' কিন্তু ততক্ষণে বিনয়বাবু ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছেন।

বসন্ত একলাফে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ে চিৎকার করে বললেন, 'এই সিপাই! পাকড়ো, পাকড়ো!'

প্রৌঢ় বিনয়বাবুর তৎপরতা বিস্ময়জনক। একটা পাহারাওয়ালা দুই বাহুর বিস্তার করে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বিনয়বাবু সুকৌশলে সমস্ত বাধা এড়িয়ে একেবারে ফটক পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন অতি দ্রুতপদে। ফটকের পাশেই পুলিশের একখানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তার পাশ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বসন্ত রিভলভার বার করে চিৎকার করে উঠলেন, 'থামুন বিনয়বাবু, নইলে এই আমি গুলি করলুম।' তিনি পলায়মান মূর্তির পায়ের দিকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুড়তে গেলেন। কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই কোথা থেকে আর একটা রিভলভারের শব্দ হল এবং পরমুহূর্তেই বিনয়বাবু দুই হাতে তাঁর মাথা চেপে ধরে সটান পথের উপরে পড়ে গেলেন।

বিনয়বাবুর শখ হয়েছিল জীবন দেখবার জন্যে। কিন্তু তার বদলে দেখলেন তিনি মৃত্যুকেই।

বিনয়বাবুর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বসন্ত চতুর্দিকে করতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তিনি তো রিভলভার ছোড়েননি, তবে কে করলে এই কাজ?

একখানা সাদা রঙের মোটর এইমাত্র এইখান দিয়ে বেগে চলে গিয়েছে বটে। এখনও দূরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে সেই গাড়িখানা।

বসন্ত ছুটে এসে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়লেন এবং চালককে বললেন, 'ওই সাদা গাড়িখানার পিছনে পিছনে চলো।'

সোজা পথ। পুলিশের গাড়িখানা তিরবেগে এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে সাদা গাড়িখানার আর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

রাস্তার চৌমাথা। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ট্রাফিক কনস্টেবল। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বার করে বসন্ত শুধোলেন, 'এখান দিয়ে কোনও সাদা মোটর যেতে দেখেছ কি?'

কনস্টেবল বললে, 'হ্যাঁ হুজুর, গাড়িখানা খানিক এগিয়ে ডান দিকে ওই রাস্তার ভিতরে ঢুকে গেল।'

আবার ছুটল পুলিশের গাড়ি কনস্টেবলের নির্দেশমতো ডান দিকের সেই রাস্তায় ঢুকে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একখানা মাঝারি আকারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সাদা গাড়িখানা। কিন্তু গাড়ির ভিতরে কেউ নেই।

বসন্ত রাস্তায় নেমে পড়লেন। সেই বাড়িখানার সদর দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। বাড়িখানার সব জানলা অন্ধকার। দেখলে মনে হয় তার মধ্যে নেই জনপ্রাণী। দরজার উপরে সজোরে ধাক্কা মারতে মারতে বসন্ত কয়েকবার চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু কারুর টুঁ-শব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

পুলিশের গাড়ির ভিতরে ছিল দুইজন পাহারাওয়ালা। বসন্তের ডাক শুনে তারা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বসন্ত বললেন, 'দরজার উপরে লাথি মারো, দরজাটা ভেঙে ফ্যালো।'

দুইজন পাহারাওয়ালার ঘন ঘন পদাঘাতের ফলে দরজার ভিতরের অর্গলটা গেল ভেঙে। এক হাতে রিভলভার এবং আর এক হাতে টর্চ নিয়ে বসন্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, 'তোমরাও আমার সঙ্গে এসো।'

একটু এগিয়েই পাওয়া গেল দোতলায় উঠবার সোপানশ্রেণি। একজন পাহারাওয়ালাকে সিঁড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে, আর-একজনকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত আগে একতলার ঘরগুলোর ভিতরের উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখা গেল না।

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বসন্ত আবিষ্কার করলেন, খিড়কির দরজাটা খোলা রয়েছে। তিনি হতাশ ভাবে বললেন, 'সাদা গাড়িতে চড়ে যারা এখানে এসেছিল, নিশ্চয়ই তারা খিড়কি দিয়ে সরে পড়েছে। চলো, এখন উপরটা একবার দেখে আসি।'

পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত অত্যন্ত সন্তর্পণে দোতলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। বারান্দা দিয়ে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই বাঁ দিকে পাওয়া গেল একটা ঘর। তার দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার।

রিভলভারটা উদ্যত করে, টর্চের চাবি টিপে বসন্ত খুব সাবধানে ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখলেন এবং তারপর সচমকে বলে উঠলেন, 'এ কী দৃশ্য!'

প্রায় মিনিটখানেক বিস্ফারিত নেত্রে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বসন্ত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর সুইচটা আবিষ্কার করে আলো জ্বেলে দিলেন।

ঘরের মেঝের উপরে নানা ভঙ্গিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে চার-চারটে মনুষ্যমূর্তি!

তাদের দিকে তাকিয়ে বসন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ একটা মূর্তি অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে নড়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে বসন্ত প্রত্যেক মূর্তিটা পরীক্ষা করে দেখলেন। আরও দুটো মূর্তির জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু তাদের দেহে আছে প্রাণ। একটা লোক মরে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দেহের ভিতরে তল্লাশ করে পাওয়া গেল রিভলভার। সেগুলো হস্তগত করে একটা রিভলভার সঙ্গী

পাহারাওয়ালার হাতে দিয়ে বসন্ত বললেন, 'তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। ঘরের ভিতর দিয়েই আর একটা দরজা রয়েছে দেখছি! আগে ওঘরটা আমি দেখে আসি!'

দরজাটা বন্ধ ছিল না। পাশের ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়ে বসন্ত দেখলেন, সেখানে কোনও লোক নেই। কিন্তু মেঝের উপরে পড়ে আছে একটা সাদা জিনিস। একখানা রুমাল।

বসন্ত রুমালখানা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তার এককোণে বোনা রয়েছে দুটো অক্ষর—'রত্না'।

তাহলে রত্নাকে চুরি করে এইখানেই নিয়ে আসা হয়েছিল? কিন্তু রত্নার রুমাল রয়েছে এখানে, সে গেল কোথায়? আর এই গুণ্ডার মতো চার-চারটে লোকই-বা কে? কার কবলে পড়ে এদের এমন অবস্থা হয়েছে? দুজনের চোয়ালে তো দেখছি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্ন! এসব যে রত্নাদেবীর কীর্তি নয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কি রত্নাদেবীকে কেউ উদ্ধার করেছে?

মনের ভিতরে জাগল বটে প্রশ্নগুলো, কিন্তু মনের ভিতর থেকে কোনও উত্তরই পেলেন না বসন্ত। তারপর তিনি বাড়ির অন্য ঘরগুলোও খুঁজে এলেন। কেউ কোথাও নেই।

বসন্ত পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললেন, 'তোমরা দুজনে এইখানেই পাহারা দাও। একজন উপরে আর একজন একতলায়। আমি এখনই থানায় গিয়ে আরও লোকজন পাঠিয়ে দিচ্ছি!'

সুধাকান্ত শুধোলেন, 'তাহলে রত্নাকে কেউ উদ্ধার করেছে?'

বসন্ত বললেন, 'রুমালের সূত্র দেখে তো তাই মনে হয়। কিন্তু কেই-বা তাকে হরণ আর কেই-বা উদ্ধার করলে, সেইটেই আন্দাজ করতে পারছি না।'

এমন সময় একজন লোক ঘরের ভিতরে এসে বললে, 'বসন্তবাবু, রাধাপুর থেকে আপনার নামে এই টেলিগ্রামখানা এসেছে।'

টেলিগ্রামে লেখা ছিল

'শ্যামলবাবুর সঙ্গে রত্নাদেবী নিরাপদে ফিরে এসেছেন। শোহনবাবু গ্রেপ্তার করেছেন শ্যামলবাবুকে! তিনি আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে চান—সুবোধ।'

সুধাকান্ত বললেন, 'যা ভেবেছিলুম, তাই। যে গৌরব তোমার প্রাপ্য, তা লাভ করলে শোহনলাল। সে নিশ্চয়ই খুব সুচতুর।'

বসন্ত বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! জাভার পুলিশের কাছে টেলিগ্রাম করে জেনেছি, সেখানেও সকলের মুখে মুখে ফেরে তার চাতুর্যের খ্যাতি। এ মামলায় আমি কেবল নির্বোধ বলে প্রমাণিত হয়েছি। শোহনলালও সুচতুর, শ্যামলও কম চতুর নয়। তার চাতুর্যের আরও-কিছু ইতিহাস আমি তলে তলে সংগ্রহ করেছি।'

সুধাকান্ত মুখ টিপে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'শ্যামলের কথা তো আগেই তোমাকে আমি বলেছি।'

বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু তার সমস্ত গুপ্তকথা আপনিও আমাকে জানাননি। আচ্ছা, রাধাপুর থেকে ফিরে এসে সব কথাই আপনাকে খুলে বলব। এখন আমি চললুম।'

ষোড়শ

শোহনলালের বক্তব্য

খুব ভোরে বসন্ত মোটরে চেপে যাত্রা করলেন রাধাপুরের দিকে।

তাঁর মুখ আজ খুব খুশি। যেসব সূত্র জট পাকিয়ে মামলাটাকে জটিল করে তুলেছিল, সেগুলো এখন আলাদা আলাদা করে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নৌকো প্রায় ঘাটের কাছে এসে পড়েছে, বিপদের সম্ভাবনা এখন নেই বললেই চলে। লন্ডনের বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে তাঁর মনে অনেকদিনের উচ্চকাঙ্ক্ষা। পুলিশ কমিশনার অঙ্গীকার করেছেন, এই মামলাটার কিনারা করতে পারলে তিনি তাঁর জন্যে একটা লম্বা ছুটির ব্যবস্থা করে দেবেন। আজকেই যে এই মামলার একটা কিনারা হয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

বসন্ত মনের আনন্দে উপরি উপরি তিনটে সিগারেটকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন। শোহনলাল জাভার একজন নামজাদা ব্যক্তি। কলকাতার এই মামলাটার সমস্ত বিজয়গৌরবও আজ সে অর্জন করতে চায়। শ্যামল নামজাদা হবার জন্যে ব্যস্ত নয়, ইচ্ছা করলে সে-ও খুব নাম কিনতে পারত। কিন্তু সে তা চায় না, সে চায় ডুবে ডুবে জল খেতে অগাধ জলের মকরের মতো।

মোটর যথাসময়ে রাধাপুরের ভিতরে প্রবেশ করলে। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি দেখলেন, গাড়িবারান্দার তলায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে শোহনলাল। সে বললে, 'প্রিয় বসন্তবাবু, কাল রাত্রেও আপনি এলেন না দেখে, আমি ভেবেছিলুম আপনি আর এখানে আসবেন না।'

বসন্ত বললেন, 'বেশি রাতে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাই কাল আসতে পারিনি। কিন্তু শ্যামলকে তো আপনি গ্রেপ্তার করেছেন, এখন আর বেশি তাড়াহুড়োর দরকার কী? ধন্য শোহনবাবু, আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

—'ধন্যবাদ।'

—'রত্নাদেবী ভালো আছেন তো?'

—'নিশ্চয়! তাঁর জন্যে আর দুশ্চিন্তার কোনওই কারণ নেই। এখন চলুন আমরা লাইব্রেরিঘরের ভিতরে যাই।'

লাইব্রেরির ভিতরে প্রবেশ করে টেবিলের দুইধারে দুইজনে মুখোমুখি বসে পড়লেন।

বসন্ত বললেন, 'এইবারে সব কথা শোনবার জন্যে আমার মন অধীর হয়ে উঠেছে। কোন কোন সূত্র ধরে আপনি কী কী করেছেন, আমার কাছে তা খুলে বললে বাধিত হব। কেমন করে আপনি শ্যামলকে গ্রেপ্তার করলেন?'

—'রত্নাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামল নিজেই এখানে এসে হাজির হয়েছে।'

—'আজব, উদ্ভট, আশ্চর্য কথা!'

—'কিন্তু সত্য কথা। সে পরম শান্ত ভাবে এখানে এসে রত্নাদেবীকে আমার হাতে সমর্পণ করলে। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে।'

—'হ্যাঁ! শ্যামলের ওই হাসি আমি খুব চিনি। দেখলেই বিষম রাগ হয়। তারপরই আপনি বুঝি তাকে গ্রেপ্তার করলেন?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু তখনও সে বিচলিত হল না। অত্যন্ত সহজ ভাবেই বললে, 'আমার হাতে হাতকড়াটা একটু আলতো ভাবে পরাবেন। আমার কব্জি জখম হয়েছে।' দেখলুম, সত্যিই তাই। শ্যামলের নিজের দলের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে গুপ্তধন আর রত্নাদেবীকে নিয়ে চম্পট দেবার চেষ্টা করেছিল, আর শ্যামলকে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল বাধা দেবার জন্যে।'

—'শোহনবাবু, এরকম ছাড়া ছাড়া ভাবে না বলে সব কথা আপনি গুছিয়ে বলুন।'

—'গুছিয়ে বলবার বেশি মাল-মশলা কিছুই নেই।'

—'সাদা সওয়ার কে?'

—'শ্যামল নিজে।'

—'কিন্তু রাত্রে তার আবির্ভাবের কারণ কী?'

—'কারণ লোককে ভয় দেখানো। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে গুপ্তধন আছে, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে রাত্রে সেখানকার নানা জায়গার মাটি খুঁড়ে দেখা হত। কৌতূহলী লোকদের তফাতে রাখবার জন্যে শ্যামল অলৌকিক সাদা সওয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করত।'

—'কিন্তু লোকে বলে—আর ভুবনবাবুর মুখেও একথা শুনেছি যে, সাদা সওয়ার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে আবার যখন খুশি দৃশ্যমান হত। এর কারণ কিছু অনুমান করতে পেরেছেন?'

শোহনলাল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'ওইখানেই কেমন একটা ধাঁধা থেকে গিয়েছে।'

—'কিন্তু আদালত তো ধাঁধার কথা শুনবে না, যা কিছু সব আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। এ মামলায় আপনি আমার উপরে টেক্কা মেরেছেন, তবু আপনার সুবিধার জন্যে রহস্যটা আমি পরিষ্কার করে দিতে পারি। সাদা সওয়ারের গায়ে ছিল একটা সাদা জামা। কিন্তু তার সঙ্গে থাকত একখানা কালো র‍্যাপার। রাত্রের অন্ধকারে সে যখন সাদা জামা গায়ে দিয়ে বাইরে চলাফেরা করত, তখন সকলেই তাকে দেখতে পেত। তারপর অদৃশ্য হবার দরকার হলে সে গায়ে মুড়ি দিত সেই কালো র‍্যাপারখানা। রাত্রের অন্ধকারের সঙ্গে তার র‍্যাপারের কালো রং একেবারে মিলিয়ে যেত।'

—'ধন্যবাদ বসন্তবাবু, একটা জটিল সমস্যার সমাধান করে আপনি আমার বড়ো উপকার করলেন।'

—'না শোহনবাবু, এখনও আর একটা মস্ত সমস্যা আছে—যে ছোরাতে ভুবন মারা পড়ে, তার উপরে তার নিজের আঙুলের ছাপ ছিল কেন?'

—'কারণ সে আত্মহত্যা করেছিল।'

বসন্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব! সে আত্মহত্যা করবে কেন? বিশেষ, রত্নাদেবীর বাড়িতে এসে তাঁর আত্মহত্যা করার মানেই হয় না। আর তার আত্মহত্যার পূর্ব মুহূর্তেই বিনয়বাবুই বা ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন কেন? আদালতে এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন আপনি?'

শোহনলাল সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক বলেছেন। এসব কথা তো আমি এতক্ষণ ভেবে দেখিনি! আপনি এসব সমস্যারও সমাধান করে দিতে পারবেন?'

—'পারব বলেই মনে করি।' এই বলে বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'আমি এখন থানায় ফোন করে শ্যামলকে এখানে আনাতে চাই।'

—'সেজন্যে আপনাকে কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না। সুবোধ বাইরেই আছে, আমি তাকে

এখনই থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' এই বলে শোহনলাল গাত্রোত্থান করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

বসন্তের মুখে ফুটল রহস্যময় হাসি। নিজের মনে মনেই তিনি বললেন, 'নৌকোকে এখন ঘাটে ভিড়োবার সময় হয়েছে।'

ঘরের ভিতরে পুনঃপ্রবেশ করে শোহনলাল বললে, 'শ্যামলকে নিয়ে আসবার জন্যে সুবোধ এখনই থানায় চলে গিয়েছে।'

—'উত্তম। শোহনবাবু, আপনি মামলাটাকে মন্দ খাড়া করেননি। এজন্যে আপনার বাহাদুরি স্বীকার করছি।' তারপর শোহনলালের কাঁধের উপরে দক্ষিণ বাহু স্থাপন করে বসন্ত আবার বললেন, 'প্রিয় শোহনলাল, আমি এখন তোমাকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

সেই মুহূর্তেই বসন্ত মাথার উপরে অনুভব করলেন ভীষণ এক আঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেল তাঁর সমস্ত অনুভূতি!

সপ্তদশ
দাবার শেষ চাল

সর্বপ্রথমে বসন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দেওয়ালের উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা দুখানা সেকেলে তরবারি।

এই দুখানা তরবারি আগেও দেখেছেন তিনি। কিন্তু কোথায়? ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল, রত্নাদেবীর লাইব্রেরিঘরে দেওয়ালের উপর এই তরবারি দুখানাকে তিনি আগেও দেখেছেন কয়েকবার।

আর কিছু মনে পড়ছে না। বসন্ত আবার দুই চক্ষু মুদে ফেললেন, তারপর আবার তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর দৃষ্টির সামনে জ্বলজ্বল করছে শোহনলালের দুটো ক্রূর ও হিংস্র চক্ষু!

তারপরই তিনি শুনতে পেলেন শোহনলালের কণ্ঠস্বর 'মামলাটাকে আমি মন্দ খাড়া করিনি, কী বলো বসন্ত?'

বসন্ত তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, তিনি রত্নাদেবীর লাইব্রেরিঘরেই আছেন বটে। আড়ষ্ট ভাবে বসে আছেন একখানা কাঠের চেয়ারের উপরে এবং শক্ত দড়ি দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। বাম পাশে তাকিয়ে দেখলেন সেইরকম বন্দি অবস্থায় সুবোধও বসে আছে আর-একখানা চেয়ারের উপরে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডান পাশে তাকিয়ে দেখলেন। সেখানেও একখানা চেয়ার। তার উপরে বসে রত্নাদেবী, তাঁরও সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘরের আর-এক কোণে নির্বিকার ভাবে বসে আছে গুন্ডার মতন দেখতে আর-একটা লোক। বাঁ হাতের চেটোর উপরে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে সে 'সুকা' প্রস্তুত করছিল আপন মনে।

তারপর তিনি তাকালেন ঘরের উপর দিকে। সেখানে জ্বলছে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি। তিনি রাধাপুরে এসেছেন সকালবেলায়, আর এখন কি সন্ধ্যা উতরে গেছে? এতক্ষণ তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন? কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

শোহনলাল জিজ্ঞাসা করলে, 'বন্ধুবর বসন্তবাবু, আশা করি আপনি এতক্ষণে মাথার আঘাতটা সামলে নিতে পেরেছেন?'

বসন্ত স্ফূর্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু প্রিয় শোহনলালবাবু, আপনার এই কৌতুকাভিনয়ের আসল উদ্দেশ্যটা কী?'

—'কৌতুকাভিনয়? ভুল বন্ধু, ভুল! আপনাকে আর সুবোধকে এখনই পরলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। টেলিগ্রাম করে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আপনাকে যে এখানে ডেকে আনা হয়েছে, তাও কি আপনি বুঝতে পারেননি?'

বসন্ত মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'পেরেছি প্রিয়বর, পেরেছি। নাটকের চরম দৃশ্যে কী হতে পারে সেটা আগেই আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলুম। তুমি যে জাভা পুলিশের কর্মচারী নও, তুমি যে সেখানকার ফেরারি আসামি, এসব তথ্য সংগ্রহ করেই আমি এখানে পদার্পণ করেছি। তুমি যখন নির্বোধের মতো বক বক করে আমাকে রূপকথা শোনাচ্ছিলে, তখন পকেটের ভিতরে আমার হাত ছিল রিভলভারের ঘোড়ার উপরে। তোমাকে যখন গ্রেপ্তার করতে যাই, তখনও আমি প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু ওই দুশমন চেহারার লোকটা যে পিছন থেকে অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করবে, এতটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি।'

—'মাঝে মাঝে আমরা সকলেই ভুল করে ফেলি, না বসন্ত?'

—'ঠিক! এর পরেও যথাসময়ে তুমিও যে কোনও মারাত্মক ভুল করে বসবে এ বিষয়েও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তারপর কী হবে জানো? দুলতে হবে তোমাকে ফাঁসিকাঠের দোলনায়।' কথা কইতে কইতে বসন্ত মনে মনে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছিলেন, মুক্তিলাভের উপায় কী? পুলিশ কমিশনারের আগ্রহ দেখে শোহনলাল সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য তিনি তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করে এসেছেন। বসন্তের কাছ থেকে খবর পেতে দেরি হলে সেখান থেকে সাহায্য আসবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শোহনলাল কি বেশি বিলম্ব করবে? তার দুই চক্ষু দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে নির্মম হত্যাকারীর দৃষ্টি।

শোহনলাল বললে, 'কিন্তু বসন্ত, এটা তুমি বলতে বাধ্য যে, শ্যামলের বিরুদ্ধে আমি একটা ভালো মামলা সাজাতে পেরেছি!'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়! এমন দুর্বল মামলা আমি আর দেখিনি।'

—'বেশ, ফলেন পরিচিয়তে। এখন শোনো! চন্দ্রকান্ত চন্দ্রকে যমালয়ে প্রেরণ করেছি আমি নিজেই। কারণ? আমার লোক হয়েই আমাকে সে ঠকাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে একসঙ্গে রত্না আর গুপ্তধন হস্তগত করবে। তারপর রত্নার ঘরের জানলা লক্ষ্য করে সেই রিভলভার ছোড়ার ব্যাপারটা। ভুবন সে কাজ করেছিল আমারই নির্দেশে। আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলুম যে, সরাসরি রত্নার উপরে আক্রমণের চেষ্টা হলে তুমি ভয় পেয়ে তপোবনের ভিতরেই আড্ডা গাড়বার চেষ্টা করবে। তার মানে, তোমার সঙ্গে থাকব আমিও। বাড়ির ভিতরে থাকবার সুযোগ পেলে আমার অনেক সুবিধা হবে। সেখানে ভুবনের সাহায্যে তোমাকেও আমি পথ থেকে সরাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু তখনও তোমার কাল পূর্ণ হয়নি বলে তোমার বদলে মরতে হল মন্মথকে! তারপর গুপ্তধনের লোভে ভুবনও বিশ্বাসহন্তা হয়ে দাঁড়ায়। সে আমার হুকুম না মেনে রত্নাকে হরণ করে। তারপর সে রত্নাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে আছে নিশ্চয়ই শ্যামল আর বিনয়ের কারচুপি। তখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে দেখে ভুবন অত্যন্ত ভীত হয়। কারণ, সে

বেশ বুঝে নিয়েছিল যে, তাকেও আমি হত্যা করব চন্দ্রকান্তের মতো। তারপর ঠিক কী হয়, ভিতরের ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। আন্দাজে কেবল এইটুকুই বলতে পারি, বিনয়ের সাহায্যে শ্যামল তাকে প্ররোচিত করে আমাকে হত্যা করবার জন্যে। তোমাদের উপস্থিতিতেই আকস্মিক অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভুবন আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু কেমন করে আমি বেঁচে গিয়েছিলুম, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। তবে একটা কথা এখনও তুমি জানো না। নিজেকে সামলে নিয়ে সেই মুহূর্তেই আমি দুই হাতে ভুবনের ছোরাসুদ্ধ মুষ্টিবদ্ধ হাত চেপে ধরে অস্ত্রখানা তারই বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছিলুম। এইজন্যেই ছোরার উপরে পাওয়া যায় কেবল ভুবনেরই আঙুলের ছাপ।'

বসন্ত বললেন, 'চমৎকার শোহন, চমৎকার! তিন-তিনজন সাক্ষীর সামনে রোগীর মুখেই রোগের কাহিনি ব্যক্ত হচ্ছে।'

শোহন হা হা করে হেসে বললে, 'আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষী দেবে? তোমাদের দুজনকে তো এখনই মহাপ্রস্থান করতে হবে! বাকি রইল কেবল রত্না। সে যদি আমাকে বিবাহ করতে রাজি হয়, তাহলে তো সব মুশকিলই আসান হয়ে যাবে। নইলে সে-ও হবে তোমাদের মহাপ্রস্থানের সঙ্গিনী। কামিনীর জন্যে আমার কোনওই আকিঞ্চন নেই—আমি চাই কাঞ্চন, আমি চাই গোবিন্দদাসের কোটি টাকা।'

—'বটে, বটে? কিন্তু সে টাকা পাবে কেমন করে?'

—'তাও বলছি। কিন্তু আমার কাহিনির আরও কিছু বাকি আছে, সেটুকু শুনে রাখো আমার দলের দুইজন লোক বিশ্বাসঘাতী হল দেখে, আমি আবার এক নতুন দল গড়ে তুলি। এক সন্ধ্যায় বনের ভিতরে গিয়ে আমি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলুম, কেমন করে রত্নাকে আবার চুরি করতে হবে, সেই সময়ে কাছের একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখি। খুব সম্ভব সে পাদরি বিনয়। আমাদের কিছু কিছু কথা সে বোধহয় শুনতে পেয়েছিল। তখনই আমি মনে মনে তার উপরে দিয়েছিলুম প্রাণদণ্ড। তারপর তোমার নির্দেশে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে আমার বড়ো দুশ্চিন্তা হল। সে পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই আমার কথা ফাঁস করে দেবে। খুব দ্রুত মোটর চালিয়ে পুলিশের আগেই আমি কলকাতায় এসে হাজির হই। তারপর বিনয়-বধের ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলি। কথা রইল, আমার কয়েকজন লোক পুলিশের আস্তানার কাছে পাহারা দেবে। তারপর বিনয় এলেই শ্যামলের নামে তাকে ফোন করে রাস্তায় ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর যা হয়েছিল তোমাকে তা আর বলবার দরকার নেই। সমস্ত শুনে এখন তোমার হাসি পাচ্ছে বোধ হয়?'

বসন্ত বললেন, 'হাসি পাচ্ছে কী শোহন, মনে মনে আমি হাসছি—খুব হাসছি। বন্ধু, তোমার আসল স্বরূপ তখনই আমি জেনে ফেলেছিলুম।'

—'তাই নাকি? তাহলে তুমি হচ্ছ একটা নিরেট বোকা! সব জেনেও তুমি হাত গুটিয়ে বসেছিলে?'

—'তোমাকে গ্রেপ্তার করবার আগে তোমার বিরুদ্ধে আমি আরও প্রমাণ সংগ্রহ করছিলুম।'

—'কিন্তু যেসব প্রমাণ কাজে লাগাতে পারবে না, তা সংগ্রহ করে কোনওই লাভ নেই। যাক, বাকি কথাও শুনে রাখো গুপ্তধনের জন্যে ঘটনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে কলকাতায় আমার বাসায় একটি ছোটোখাটো পরামর্শ-সভার আয়োজন করেছিলুম। আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকবার কথা ছিল

ভুবনের আর চন্দ্রকান্তের। কিন্তু ভুবন উপস্থিত থাকতে পারেনি। কে একজন অপরিচিত আগন্তুক এসে ভুবনকে অজ্ঞান করে ফেলে তার স্থান গ্রহণ করে আমাদের অজ্ঞাতসারেই। আগন্তুক আমাকে চিনতে পারেনি, কারণ আমার মুখ ছিল রুমালে ঢাকা। কিন্তু তার আগমনে আমার একটা উপকার হয়! সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে তার পকেট থেকে পড়ে যায় পকেটবুক। তার ভিতরে ছিল জাভার গোয়েন্দাবিভাগের একখানা 'আইডেন্টিফিকেশান কার্ড'—তার নামের জায়গাটা ছিল খালি। সেইখানে নিজের নাম বসিয়ে আমি সাজি জাভা পুলিশের লোক। বসন্ত, তুমি আর কিছু জানতে চাও?'

—'না।'

—'তাহলে গোবিন্দদাসের সেই ক্যাশবাক্সটা বিনাবাক্যব্যয়ে আমার হাতে সমর্পণ করো।'

—'তুমি তো জানোই, ক্যাশবাক্স আছে থানার মালখানায়।'

—'তুমি ইচ্ছা করলেই ক্যাশবাক্সটা এখনই এখানে আনাতে পারো।'

—'কেমন করে?'

—'টেলিফোনের 'রিসিভার'টা আমি তোমার মুখের সামনে ধরছি। থানার অফিসারকে জানাও, ক্যাশবাক্সটা যেন তপোবনের বাগানে আমার হাতে অর্পণ করা হয়।'

—'তোমাকে অতখানি আপ্যায়িত করবার ইচ্ছা আমার নেই।'

—'সাবধান বসন্ত, আগুন নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না।'

—'আগুন নিয়ে খেলা করতেই আমি ভালোবাসি।'

শোহন গম্ভীর ভাবে এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের উপরে টাঙানো একখানা তরবারি হাত বাড়িয়ে নামিয়ে নিলে, তারপর ফিরে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললে, 'বসন্ত! বলো, এখনও তুমি আমার কথামতো কাজ করতে রাজি আছ কি না! যদি নারাজ হও, তাহলে আমি প্রথমেই কচ করে তোমার একটা কান কেটে নেব। তারপরেও রাজি না হলে তোমার আর একটা কানও কাটা যাবে। তারপর তুমি একে একে হারাবে নাক, ঠোঁট, চোখ, তারপর—'

রত্না চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'চুপ কর শয়তান।'

শোহনলাল চকিতে তরবারির অগ্রভাগটা রত্নার গালের উপরে টেনে দিলে এবং দেখতে দেখতে তার গণ্ডদেশ ও কণ্ঠ বয়ে রক্তধারা নেমে এসে জামাকাপড়ও করে তুললে রক্তাক্ত।

নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে ও বাঁধন ছেঁড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বসন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কাপুরুষ! নরকের কীট! পুরুষদের ছেড়ে অসহায় নারীর উপরে অস্ত্রাঘাত!'

একগাল হেসে শোহনলাল বললে, 'মাভৈঃ! পুরুষদের ছাড়ব না। আমি এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি—সেই ক্যাশবাক্স আমার চাই-ই চাই। বলো—এখনও বলো, তুমি আমার কথামতো কাজ করতে রাজি আছ কি না!'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বসন্ত বললেন, 'না, না, না,—কিছুতেই না।'

—'তাহলে এই তোমার ডান কানটা উড়ে গেল!' সে তরবারি উঁচিয়ে বসন্তের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বললে, 'ভগবানের দিব্য! আমি যা বলছি, তাই করব!'

বসন্ত অট্টহাস্য করে বললেন, 'তোর আবার ভগবান! নরকেও যে তোর ঠাঁই নেই!'

শোহনলাল বাম হাতে বসন্তের ডান কানটা টেনে ধরে তরবারি তুললে!

ঠিক সেই সময়ে পিছনে একটা ভারী দেহ পতনের শব্দ হল। চমকে পিছনে ফিরে শোহনলাল

দেখলে, তার গুন্ডার মতো অনুচরটা মাথায় রিভলভারের হাতলের ঘা খেয়ে ঘরের মেঝেয় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে এবং দরজার কাছে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল, তার দুই হাতে দুটো রিভলভার!

অষ্টাদশ

শ্যামলের বক্তব্য

শোহনলাল হতভম্বের মতো বললে, 'তুমি!'

—'তা ছাড়া আর কে হবে?'

শোহনলালের হাত থেকে তরোয়ালখানা মাটির উপরে পড়ে গেল ঝনঝন শব্দে।

দুটো রিভলভারই শোহনলালের দেহের উপর উদ্যত করে আদেশের স্বরে শ্যামল বললে, 'শিগগির ওই দেওয়ালের কাছে গিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও।...হ্যাঁ, এইবারে হাতদুটো ওপরে তোলো। হয়েছে, একটুও না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।'

শ্যামল একটা রিভলভার নিজের পকেটের ভিতরে ফেলে শোহনের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার দুই পকেট হাতড়ে বার করলে দুটো 'অটোমেটিক' পিস্তল। সে দুটো নিজের এক-একটা পকেটে রেখে সে বললে, 'তুমি যদি কোনও রকম চালাকি করো, তাহলে এখনই তোমাকে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলব।'

এতক্ষণ পরে সে ভালো করে ঘরের অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর পেলে। রত্নার মুখ দেখেই সে শিউরে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে তার মুখের পানে তাকিয়ে সে নির্মমকণ্ঠে বললে, 'তোমাকে আঘাত করেছে? দুরাত্মা তোমাকে আঘাত করেছে! আচ্ছা!'

তারপর সে ঘরের মেঝে থেকে শোহনলালের পরিত্যক্ত তরবারিখানা তুলে নিয়ে বন্দিদের দিকে এগিয়ে গেল। এবং একে একে সকলের বাঁধন ছিন্নভিন্ন করে দিলে ক্ষিপ্রহস্তে!

হঠাৎ বসন্ত চিৎকার করে বললেন, 'হুঁশিয়ার শ্যামলবাবু।'

ইতিমধ্যে শোহনলাল ক্ষিপ্র হস্তে দেওয়ালের উপর থেকে অন্য তরবারিখানা টেনে নিয়ে বাঘের মতো শ্যামলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু বসন্তের সতর্কবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামল সাঁৎ করে একদিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। শোহনলালের ঊর্ধ্বোত্থিত তরবারির প্রথম আঘাতটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সশব্দে একটা টেবিলের উপরে গিয়ে পড়ল। তার পরমুহূর্তে শ্যামল দূর থেকেই নিজের হাতের তরবারিখানা এত জোরে শোহনকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলে যে, তরবারির একটা প্রান্ত তার কণ্ঠদেশের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিকে বেরিয়ে পড়ল। বিকট চিৎকার করে শোহনলাল সঙ্গে সঙ্গে ভূতলশায়ী হল এবং তারপর তিন-চারবার ছটফট করেই তার দেহ হয়ে গেল একেবারে আড়ষ্ট।

ঘরের ভিতর থেকে তখন শোহনলালের মৃতদেহ এবং তার সঙ্গীর অচেতন দেহটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

শ্যামল একটু হেসে বললে, 'এইবারে আমাদের পালা।'

বসন্ত বললেন, 'কিন্তু শ্যামলবাবু, আপনি তো থানায় আটক ছিলেন! এখানে এলেন কেমন করে?'

শ্যামল বললে, 'আমার আসল পরিচয় দিয়ে 'আইডেন্টিফিকেশান কার্ড' দেখবার পর থানার অফিসার আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, এবাড়ির চারিদিকেই এখন পুলিশের লোক পাহারা দিচ্ছে।'

রত্না বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'আপনার আসল পরিচয়? আপনার আবার নতুন কিছু পরিচয় দেবার আছে নাকি?'

বসন্ত বললেন, 'রত্নাদেবী, আপনি শ্যামলবাবুর আসল পরিচয় জানেন না। উনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে একজন পদস্থ ডিটেকটিভ। নিজেকে লুকিয়ে সকলের অগোচরে ওঁকে কাজ করতে হয়। কর্তব্যপালন করবার জন্য ওঁকে পৃথিবীর নানা দেশেই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ভারতের কোনও শত্রুরাজ্য থেকে প্রেরিত এক গুপ্তচর বোম্বাই শহরে ধরা পড়েছিল, কিন্তু তার গোপন অভিসন্ধি নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। সেইজন্যে ছদ্মবেশে ওঁকে বোম্বাইয়ের জেলখানায় কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল। বাইরের সকলে জানত উনিও একজন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী। তাই অন্যান্য কয়েদিরাও অকপটে ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করত। উনি সেখানে ছিলেন সেই গুপ্তচরের পেটের কথা আদায় করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত উনি সফলও হয়েছিলেন।'

শ্যামল হাসতে হাসতে বললে, 'আমার আসল পরিচয় জানবার জন্যে আপনাকে দেখছি অনেক গবেষণা করতে হয়েছে।'

—'সেইটেই আমাদের কর্তব্য নয় কি?'

শ্যামল বললে, 'সদ্য স্বর্গগত—না সদ্য নরকস্থ শোহনলাল সম্বন্ধে কানাঘুষোয় আমি কোনও কোনও কথা শুনেছিলুম। তাই কৌতূহলী হয়ে তার বাসায় এক পরামর্শসভায় ছদ্মবেশে যোগ দেবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলুম। তার অভিপ্রায় জেনে, আসবার সময় আমি জাভা পুলিশের একখানা নামহীন 'আইডেন্টিফিকেশান কার্ড' সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলুম। তার মুখ কালো রুমালে ঢাকা ছিল। তখনও পর্যন্ত আমি স্বচক্ষে তাকে দেখিনি। পরে তাকে শনাক্ত করতে পারব বলেই ওই কার্ডখানা তাকে দিয়েছিলুম উপহার। কারণ, আমি নিশ্চয়ই জানতুম, কার্ডখানা পরে সে নিজের কাজে ব্যবহার না করে ছাড়বে না। আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি। পরে যখনই শুনলুম, সে নাকি জাভা পুলিশের লোক, তখন থেকেই তার সম্বন্ধে আমার আর কোনও সন্দেহ থাকেনি।'

বসন্ত বললেন, 'বিনয়বাবুর পরিণাম আপনি শুনেছেন কি?'

—'পরিণাম? কেন, কী হয়েছে?'

বসন্ত সংক্ষেপে বিনয়বাবুর মৃত্যুকাহিনি বর্ণনা করলেন।

শ্যামল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর করুণ স্বরে বললে, 'হতভাগ্য বিনয়বাবু! যদিও তাঁর চেহারা আর কোনও কোনও ব্যবহার হাস্যকর ছিল, কিন্তু খাঁটি মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন চমৎকার। আর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এখানে একমাত্র তাঁর কাছেই আমার আসল পরিচয় প্রকাশ করেছিলুম। পাদরি হয়েও তাঁর মতন শখের গোয়েন্দাগিরি শেখবার জন্যে আর কারুকেই আমি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি হয়ে পড়েছিলেন আমার অনুগত শিষ্যের মতো। তাঁর কাছ থেকে

আমি অনেক মূল্যবান সাহায্য লাভ করেছি। লোকে যাতে আমাকে সন্দেহ করতে না পারে, সেইজন্যে আমার সামনে তাঁকে রেখেছিলুম শিখণ্ডীর মতন। আমি নিজে আড়ালে থেকে তাঁকে দিয়ে অনেক কাজই করে নিয়েছি! আমার পরামর্শেই তিনি ভুবনকে উত্তেজিত করে রত্নার বাড়িতে পাঠিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন যথাসময়ে। কিন্তু আমরা ভেবেছিলুম এক, আর হল আর-এক ব্যাপার। সেইখানেই শয়তান শোহনলাল মারা না পড়ে, প্রাণ দিতে হল ভুবনকেই।'

বসন্ত বললেন, 'আপনার কাছে আর একটা বিষয় জানবার আছে। রত্নাদেবীকে আপনি কোথা থেকে কেমন করে উদ্ধার করলেন?'

—'ভালো করে সব কথা পরে শুনবেন বসন্তবাবু। এখন কেবল দু-চারটে ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে রাখি। রত্নাকে যখন মোটরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি নিজের গাড়ি থেকে তাকে দেখতে পেয়েছিলুম। তারপর আমার গাড়িখানাকে ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে আমি তাদের গাড়ির ভিতরে লাফিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর তারা আমাকে সেই অবস্থাতেই কী একটা ওষুধ খাইয়ে দীর্ঘকালের জন্যে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। জ্ঞান হয়ে দেখি আমি কোনও অজানা বাড়ির একটা ঘরের মেঝেতে শুয়ে রয়েছি। তারপর পাশের ঘরে রত্নার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ পাই। তারা নিশ্চিন্ত ছিল, আমার যে জ্ঞান হয়েছে সেটা কেউই সন্দেহ করতে পারেনি। তারপর আমি নির্ভর করলুম নিজের গায়ের জোর, বক্সিং আর যুযুৎসুর জ্ঞানের উপরে। অতর্কিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনকে বক্সিংয়ের 'নক আউট ব্লো' মেরে, আর একজনকে লাথি চালিয়ে চোখের নিমেষে মাটিতে পেড়ে ফেলি, চতুর্থ ব্যক্তি ধরাশায়ী হয় যুযুৎসুর প্যাঁচে। তারপর তারা গাত্রোত্থান করবার আগেই একখানা লোহার চেয়ার দিয়ে উপরি উপরি আঘাত করে চারজনকেই একেবারে কাবু করে ফেলি। তারপর রত্নাকে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে একেবারে রাধাপুরে চলে আসি। সেখানে হাজির ছিল শোহনলাল। আমি মজা আরও কতখানি গড়ায়, তাই দেখবার জন্যে যেচে তার হাতে আত্মসমর্পণ করি।'

তপোবনের বাগান। বাগানের ভিতর অপেক্ষা করছে একখানা মোটরগাড়ি।

শ্যামল বললে, 'রত্না, এইবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে।'

রত্না মাথা নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'আমাকে এখানে একলা ফেলে তুমি কোথায় যাবে শ্যামল?'

—'নিজের কর্তব্য পালন করতে। এখানে আমার কাছে গুপ্তধনের চেয়ে তুমিই হয়ে উঠেছিলে বেশি মূল্যবান। কিন্তু কর্তব্য আমাকে ডাকছে, এখন আমাকে বাঁধন ছিঁড়তে হবেই।'

রত্না কাতর কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি তোমার কোনও কর্তব্যই নেই?'

শ্যামল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'তোমার জন্যে যা করবার তা তো আমি করেছি রত্না! আমার কি আরও কিছু করবার আছে?'

রত্না অতি মৃদুকণ্ঠে বললে, 'সে কথা তুমি জানো আর জানেন আমার ভগবান!'

—'তুমি কী বলতে চাও রত্না?'

—'আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কায়া যদি চলে যায়, ছায়াও কি তার সঙ্গে সঙ্গে যায় না?'

শ্যামল খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো। তারপর আকাশে চোখ তুলে দেখলে, চাঁদ উঠেছে। তারপর আঘ্রাণ নিয়ে অনুভব করলে, বাগানে গন্ধফুল ফুটেছে। তারপর কান পেতে শুনলে, কোথা থেকে পাখি ডাকছে—'বউ কথা কও, বউ কথা কও!' মনে মনে সে ভাবলে, কবিরা কল্পনায় মেতে যা বর্ণনা করেন, তার সঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবনও মিলে যায় নাকি?

রত্না গাঢ় স্বরে বললে, 'শ্যামল!'

শ্যামল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'রত্না!'

—'প্রভু! স্বামী! আমি এখন কী করব?'

শ্যামল কোনও উত্তর না দিয়ে দুই দিকে নিজের দুই বাহু বিস্তৃত করলে।

রত্না ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকের ভিতর লুকিয়ে ফেললে নিজের মুখ।

শ্যামলের দুই বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে যেন হারিয়ে ফেললে রত্না!*

---

* পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে।